কৃষি-তত্ত্ব।

প্রথম ভাগ।

আড়পাড়া নিবাসী শ্রীহারাধন মুখোপাধ্যায়

প্রণীত।
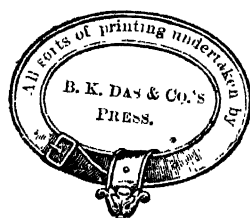
কলিকাতা,

১৭ নং, শ্রীনাথ দাসের লেন, বহুবাজার,

বি, কে, দাস এবং কোম্পানির যন্ত্রে,

শ্রীঅমৃতলাল ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯৪৩।

বিজ্ঞাপন।

কৃষিতত্ত্বের প্রথম ভাগ প্রচারিত হইল। ইহা কোন পুস্তক বিশেষের অনুবাদ নহে। এই পুস্তকে কৃষিকার্য্য সম্বন্ধীয় যে যে বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ বৃত্তান্তই আমি স্বয়ং অনুসন্ধান করিয়া লিখিয়াছি। ঐ অনুসন্ধান কালে প্রকৃতির নিয়মাবলীর অত্যাশ্চর্য্য কাণ্ড সকল দর্শন করিয়া আমি যে অতুল আনন্দ অনুভব করিয়াছি, এই পুস্তক পাঠে তাহার অনুমাত্রও পাঠকের উপলব্ধি হইবার প্রত্যাশা নাই।

বিগত সন ১২৮২ সালে এই কৃষিতত্ত্ব পুস্তক খানি রচনা করিয়া ক্রমে ক্রমে সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিতেছিলাম। সেই সময় হিউজেচ সাহেব এবং বাবু রাজকৃষ্ণ কুমার উভয়ে জলঙ্গী নদীর ভেড়িবন্দীর জন্য সরভে করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা মুদ্রাঙ্কণ করিয়া দিবেন বলিয়া পুস্তকখানি আমার নিকট হইতে চাহিয়া লয়েন, কিন্তু মুদ্রাঙ্কণাদি কিছুই না করিয়া ছয় মাস পরে পুস্তকখানি ফেরত পাঠাইয়া দেন। ঐ ছয় মাস কাল পুস্তকখানি লইয়া তাঁহারা কি করিয়াছিলেন, তাহা জানি না।

তাঁহাদের নিকট হইতে ফেরত আসার পর কৃষিতত্ত্বের প্রতি আমার কেমন একটা অশ্রদ্ধা হইয়া যায়; সেই জন্য ইহা পুনরায় সোমপ্রকাশে প্রকাশ বা মুদ্রাঙ্কণের চেষ্টা করি নাই। কিন্তু এই দীর্ঘ কালের মধ্যে কৃষি সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় যে কয়েক খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার এক খানিতেও ভারতীয় কৃষিবৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিকরূপে বর্ণিত হয় নাই। তদ্দৃষ্টে এই কৃষিতত্ত্ব পুস্তকখানি জন-সমাজে প্রচারিত করিতে সাহসী হইলাম। ইহার দ্বারা যদি উৎসাহশীল কৃষকদিগের কিছুমাত্রও উপকার হয়, তাহা হইলেই আমার সমস্ত পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

আমি কৃষি-ব্যবসায়ী, বাল্যকাল হইতে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া বহু পরীক্ষার পর এই কৃষিতত্ত্ব পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছি। এক্ষণে পাঠক মহোদয়গণ যদি ইহার কোন অংশে কোনরূপ ভ্রম দেখিতে পান, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা আমাকে লিখিলে বিশেষ উপকৃত হইব।

এই কবিতত্ব প্রকাশের জন্য বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত জাগেশ্বর ডিহি নিবাসী আমার পরমাত্মীয় বাবু যোগেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। এবং "সময়" সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্র নাথ দাস এম এ, বি এল মহাশয় আমার কবিতত্ত্বের আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন ও মুদ্রাঙ্কণের ভার লইয়া যথেষ্ট উপকৃত করিয়াছেন। উভয়ের নিকটে আমি চির-কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম।

শ্রীহারাধন শর্ম্মা।

ভূমিকা।

অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে কৃষিকার্য্য প্রচলিত আছে, এমন কি, ঋগ্বেদের মধ্যেও এই কৃষিকার্য্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি সকল যে সময় বন্য পশুর ন্যায় বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত ও আম মাংস ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিত, আর্য্যেরা (১) তাহার বহু পূর্ব্বে কৃষিকার্য্যে লিপ্ত হইয়া উহার অনেকাংশে উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। আমাদের প্রাচীন পিতৃপুরুষগণই যে কৃষিকার্য্যের প্রথম প্রবর্ত্তক, তাহার সন্দেহ নাই। কৃষি-পরাশর গ্রন্থে কৃষিকার্য্য সম্বন্ধীয় অনেক আশ্চর্য্য উপদেশের কথা লেখা আছে।

কৃষিকার্য্য দ্বারা পৃথিবীর যে মহদুপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করা আমার লেখনীর সাধ্য নহে। মনুষ্যের আদিম অবস্থার সহিত বর্ত্তমান সময়ের তুলনা করিলে এই ভূলোককে এক্ষণে সুরলোক বলিয়া বোধ হয়, এবং তাহা অবশ্যই কৃষিকার্য্যেরই ফল বলিতে হইবে।

এ পর্য্যন্ত মনুষ্য সকল যতদূর সভ্যতা-সোপানে অধিরোহণ করিয়াছেন, এবং ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, শাস্ত্র, শিল্প, বাণিজ্য, ইত্যাদি যে কোন বিষয়

১। জর্ম্মাণ পণ্ডিত ম্যাকস্‌মূলার বিবেচনা করেন যে, আমাদের প্রাচীন পিতৃ পুরুষগণ কৃষিকার্য্য করিতেন বলিয়াই আর্য্য নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। একটি সংস্কৃত ধাতু হইতে নানা অর্থে নানা শব্দ উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু ম্যাক্স্‌মূলার যে ধাত্বর্থ অনুসারে আর্য্যশব্দে কৃষক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। সংস্কৃত পুস্তক পাঠে জানা যায়, প্রাচীন কালে এ দেশের স্ত্রীলোকেরা আপনাপন স্বামীকে "আর্য্যপুত্র" বলিয়া ডাকিতেন এবং গুরুতর ব্যক্তি সকলকে কনিষ্ঠেরা "আর্য্য" এবং "আর্য্যে" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এস্থলে কৃষি-কার্য্যের সহিত আর্য্য শব্দের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ উপলব্ধি হয় না। তবে যদি ম্যাক্স্‌মূলার এমন কথা বলেন যে, এ দেশের শ্বশুরগণ এবং কি পুরুষ কি স্ত্রী (কনিষ্ঠ ভিন্ন) গুরুতর ব্যক্তি মাত্রেই লাঙ্গল কৃষাণ ছিলেন, তাহা হইলে অবশ্যই আমাকে নিরুত্তর হইতে হইবে।

যতদূর বিস্তার প্রাপ্ত হইয়াছে, কৃষিকার্য্যকেই তৎসমুদয়ের ভিত্তি স্বরূপ বলিতে হইবে। আমরা, আহার, বিহার, পরিচ্ছদ ইত্যাদি যে সমস্ত সুখ সম্ভোগ করতঃ জীবন যাত্রা অতিবাহিত করিতেছি, তৎ সমস্তই প্রায় কৃষিজাত পদার্থ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতেছে। ফলতঃ কৃষিকার্য্যই যে আমাদিগের জীবন ধারণের ঔষধি বিশেষ এবং ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ধন, মান, সুখ, সভ্যতার সোপান-বিশেষ, তাহার সন্দেহ নাই।

যদি কিছু দিনের জন্য এই কৃষিকার্য্য বন্ধ করা হয়, তবে কি রাজা কি প্রজা, কি ধনী কি নির্ধন, কি পণ্ডিত কি মূর্খ, কি গৃহী কি উদাসীন, কাহারও আর কোন ক্ষমতা থাকে না। সকলকেই মানবলীলা সম্বরণ করতঃ একে একে মৃত্যুপথের পথিক হইতে হয়। বিবিধ শস্যের অভাবে ভূমণ্ডল নির্ম্মনুষ্য শ্মশান-ভূমি হইয়া উঠে। তখন চন্দ্র সূর্য্যের উদয় সত্ত্বেও দশ দিক ঘোর তিমিরে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। নানা রত্ন-পরিপূর্ণ সুশোভিত ধনকোষ এবং বিবিধ ঔষধি-পরিপূর্ণ সুসজ্জিত চিকিৎসালয় বর্ত্তমান থাকিলেও, বিশেষ কোন উপকারে আইসে না। তখন ঘর দরজা বালাখানা এবং ঘোড়া জুড়ি চেরেট গাড়ি চেনঘড়ী সকলই অন্ধকারের অতল তলে ডুবিয়া যায়।

আমরা রূপা সোণা এবং হীরকাদি পদার্থ সকলকে রত্ন বলিয়া থাকি, এবং কৃষিজাত পদার্থ সকলকে ভূষিমাল বলিয়া উল্লেখ করি। কিন্তু একটু স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, রূপা সোণা এবং হীরকাদি পদার্থ সকলের কিছুমাত্র মূল্য নাই। অনেক সময় শত্রু কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ নগরের প্রজা ও সৈন্য সামন্তগণকে মণি মুক্তা রজত কাঞ্চন প্রভৃতি রত্ন-রাশি কোলে লইয়া ভুষিমালের অভাবে জীবন ত্যাগ করিতে হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আমরা যাহাদিগকে রত্ন বলিয়া অতিশয় যত্ন করিয়া থাকি, বস্তুতঃ তাহারা রত্ন নহে। যাহারা ভূষিমাল বলিয়া বিখ্যাত, প্রকৃত পক্ষে তাহারাই অমূল্য রত্ন, তাহারাই আমাদের জীবনের জীবন। সেই জীবনের জীবন অমূল্য রত্ন সকলের আকর স্থান ভারতবর্ষের অধিবাসী হইয়া আমরা অদ্যাপি কৃষি কার্য্যের মাহাত্ম্য কিছুই বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু ভারতীয় কৃষি কার্য্য যে কি আশ্চর্য্য ব্যাপার, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে বিস্ময়াম্বিত হইতে হয়।

এক্ষণে ভারতের অধিবাসীর সংখ্যা ছাব্বিশ কোটী বলিয়া স্থির হইয়াছে। ঐ ছাব্বিশ কোটী লোকের আহার এবং বিলাসের ব্যয় কত, তাহা নিরূপণ করা সহজ নহে। যাহা হউক, ঐ ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ভারতবাসী জনগণকে অন্য দেশের দ্বারস্থ হইতে হয় না। স্বদেশের কৃষি-জাত পদার্থ সকল হইতে সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া বরং অনেক দ্রব্য উদ্বৃত্ত হয়; প্রতি বৎসর তাহা বহুল পরিমাণে বিদেশে প্রেরিত হইয়া, অবশিষ্ট অস্মদ্দেশীয় মহাজনগণের গোলা গঞ্জে বিস্তর মজুত থাকিয়া যায়।

ভারতীয় কৃষিজাত ধান্য, গোধূম, মাস, মশুরী, তিল, মসীনা, তরিতরকারি, গুড়, চা, ও নানা জাতীয় ঔষধি, ইত্যাদি বিবিধ আহারীয় দ্রব্য, এবং নীল, রেশম, তুলা, কোষ্টা প্রভৃতি বিবিধ বিলাসের বস্তু, সমুদয়ের মূল্য একত্র করিয়া হৃদয়ে ধারণ করা যায় না। কি আশ্চর্য্য, ভারতীয় কৃষিজাত পদার্থ সকলের মূল্যের সংখ্যা নাই। কালীফর্ণিয়ার বিস্তৃত স্বর্ণ-ক্ষেত্র, গোলকুণ্ডার হীরক-খনি, এবং ইংলণ্ডের মহানর্থকরী শিল্প বাণিজ্য, ইহার সমকক্ষে গণ্য নহে। কৃষকেরা এই জন্যই "লঙ্কার বাণিজ্য ক্ষেতের কোণা" এই অসংস্কৃত বাক্য দ্বারা "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি" ইত্যাদি মহা বচনের খণ্ডন করিয়া থাকে।

এই কৃষি-কার্য্য হইতেই প্রসিদ্ধ মমতাজমহল ও দিল্লীশ্বরের ময়ূরাসনের সৃষ্টি, এই কৃষিকার্য্য হইতেই গভর্ণমেন্ট প্রাসাদ ও জমিদারগণের অট্টালিকার উৎপত্তি, এই কৃষিকার্য্য হইতেই স্বদেশীয় ও বিদেশীয় বণিক সম্প্রদায়ের অতুল ঐশ্বর্য্য। কিন্তু এই কৃষি কার্য্য হইতেই কৃষক সম্প্রদায় চির দুর্গতি ভোগ করিয়া আসিতেছে বহু চেষ্টা করিয়াও সে দুর্গতি নিবারণ করিতে কখন কোন সম্রাট সম্পূর্ণ ভাবে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তবে ইংরাজশাসনে ভারতীয় কৃষক সম্প্রদায় অন্যান্য অত্যাচারের হস্ত হইতে কিয়ৎ পরিমাণে মুক্তিলাভ করিয়াছে সত্য, তথাপি তাহারা সময়ে সময়ে নানা কারণে অত্যাচারিত হইয়া থাকে, এবং বর্ত্তমান সময়ে অজন্মার দায়ে কৃষকেরা বিশেষ কষ্ট সম্ভোগ করিতেছে।

এক্ষণে কৃষিকার্য্যের বিস্তার ও শস্যের দুর্ম্মূল্যতা দেখিয়া রাজপুরুষেরা হয়ত বিবেচনা করেন যে, কৃষকদিগের ও কৃষিকার্য্যের বিশেষ উন্নতি হই-

য়াছে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা হয় নাই। যদি তাহা হইবে, তবে ভারত-বর্ষে এত দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব কেন? অন্নাভাবে আজ উড়িষ্যায়, কাল মান্দ্রাজে, পরশ্বঃ বোম্বাইয়ে, তার পর দিন বাঙ্গালায় লক্ষ লক্ষ লোকে জীর্ণ শীর্ণ কলেবর হইয়া জঠর-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে কেন? পূর্ব্বে যে ভারত-বর্ষে এত দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব ছিল না, অতীত কালের ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ইদানীন্তন কালের মধ্যে সন ১১৭৬ এগার শত ছেয়াত্তর বঙ্গাব্দের দুর্ভিক্ষের পর (১) সাতানব্বই বৎসরের মধ্যে কোন মারাত্মক দুর্ভিক্ষ ঘটে নাই। কিন্তু ১২৭৩ বার শত তেয়াত্তর সাল হইতে এই অল্প কালের মধ্যে অনেক বারই মহা দুর্ভিক্ষ হইয়া গেল। ইহা দেখিয়া কৃষি-কার্য্যের উন্নতি হইয়াছে, কিরূপে বলা যাইতে পারে? আজ কাল কৃষি-কার্য্যের অনেকটা বিস্তার হইয়াছে বটে, কিন্তু উৎপন্নের ভাগ অত্যন্ত কম হইয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বে এদেশে বিঘায় পোনের ষোল মণ ধান্য, চারি পাঁচ মণ তিল মসীনা সরিষা, দশ বার মণ ছোলা গোম অরহড়, ত্রিশ চল্লিশ পঞ্চাশ মণ

১। পলাশীর যুদ্ধের ত্রয়োদশ বৎসর পরে ঐ দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হয়। পলাশীর যুদ্ধের পর রাজ্যের শাসন কার্য বিশৃঙ্খল হওয়ায়, সে সময় কৃষি বাণিজ্য সকলই সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল। সেই সঙ্কট কালে কোথা হইতে অসংখ্য পঙ্গপাল আসিয়া সমুদয় শস্য ভক্ষণ করায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। আমি এক জন বৃদ্ধ লোকের মুখে ঐ পঙ্গপাল সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত কবিতাটি শ্রুত হইয়াছিলাম। কিন্তু কবিতার একটি চরণ আমার ভুল হইয়া গিয়াছে। আর ঐ কবিতায় লিখিত মাণিকচন্দ্র কে, এবং দৈব দুর্ঘটনার সহিত মাণিকের সম্বন্ধই বা কি, ইহা ভাবিতে গেলেই নবাবের দেওয়ান মাণিকচন্দ্রকে মনে পড়ে। বোধ হয়, মাণিক-চন্দ্র-কৃত অন্ধকূপ-হত্যা মহাপাপই রাজ্য-বিপ্লব ও দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতি দৈব উৎপাতের কারণ বলিয়া সাধারণের মনে একটা ধারণা হইয়াছিল, এবং সেই জন্য কবিতার মধ্যে "মাণিকচন্দ্র নির্ব্বংশে কল্লে এত খানি" বলা হইয়াছে।

"আজগুবি সব ফড়িঙ্গ এলো বেলা পর দুই কালে। গাছে ছিল শকুন চিল পালায় পালেঁ পালে॥
কেউ দেয় আগুণ জ্বেলে কেউ কুলায় মারে বাড়ি। তার সঙ্গে বেড়ায় যেন ঘুঘু দুটো ধাড়ি॥
পাক দিয়ে দিয়ে বেড়ায় ঘুঘু দেখতে লাগে খাসা। কি হবে কি হবে বলে কাঁদে সকল চাসা॥
* * * * * * । মাণিকচন্দ্র নির্ব্বংশে কল্লে এত খানি॥
আর কিছু দিন বাঁচলে ঘুঘু পড়ত জোড় ডঙ্কা। সব বিনাশ করে গেল কণক পুরী লঙ্কা॥"

পর্য্যন্ত ইক্ষুগুড়, বিশ বাইশ মণ হরিদ্রা শুঁট, দশ বার মণ লঙ্কামরিচ, কোষ্টা কার্পাষ, ইত্যাদি জন্মাইত। এক বিঘা তরকারির জমিতে পঁচিশ ত্রিশ টাকা ও এক বিঘা পাটের জমিতে এক শত টাকা উৎপন্ন হইত। এক্ষণে স্থবৃষ্টির বৎসরেও আর ঐরূপ ফসল জন্মে না। খুব জন্মে ত উহার অর্দ্ধেক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। আবার এক্ষণে অধিকাংশ বৎসরেই আর সকালে স্থবৃষ্টি হইতে প্রায় দেখা যায় না। হয় অনাবৃষ্টি, নয় অতিবৃষ্টি, অথবা বিশৃঙ্খল বৃষ্টিই প্রায় হইয়া থাকে। অতিবৃষ্টির বৎসরে শস্য সকল যে হাজিয়া যায়, তাহার ত কথাই নাই। এবং অনাবৃষ্টি ও বিশৃঙ্খল বৃষ্টির বৎসরে বিঘায় দুই মণ আড়াই মণ ধান্য, আধ মণ ত্রিশ সের তিল মসীনা সরিষা, দুই মণ আড়াই মণ ছোলা গোম অরহড়, পাঁচ ছয় মণ ইক্ষুগুড়, চারি পাঁচ মণ হরিদ্রাশুঁট, তিন চারি মণ লঙ্কামরিচ কোষ্টা ও কার্পাষ, ইত্যাদি জন্মিয়া থাকে। তরকারির চাষে সামান্য লাভ হয় বটে, কিন্তু পাতের চাষে আর কিছু মাত্র লাভ নাই। নদীয়া প্রভৃতি কয়েকটি জেলা হইতে পাতের চাষ প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। তবে মুরশিদাবাদ বীরভূম ও মালদহ প্রভৃতি জেলা সকলে সামান্য পরিমাণে পাতের চাষ অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। তত্রত্য কোন কোন কৃষককে আমি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি, ইদানীং এক বিঘা পাতের জমিতে খরচ পত্র বাদে দশ বার টাকা লাভ হওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে।

উপরে প্রাচীন কালের বিবিধ শস্যের ফলনের কথা যাহা লিখিয়াছি, পাঠক হয়ত তাহাতে বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে ক্ষেত্র বিশেষে ঐরূপ ফলন আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং প্রাচীন কৃষকদিগের মুখে শুনিয়াছি যে, আরও পূর্ব্বে এদেশের প্রত্যেক ক্ষেত্রের স্বাভাবিক ফলন ঐরূপ ছিল। উহার জন্য বিলাতের সাইরেন্সেষ্টার কৃষি-কলেজে কাহাকেও অধ্যয়ন করিতে হইত না, ক্ষেত্রে লবণ সোরা ও অস্থি-চূর্ণ দিবার আবশ্যক হইত না, এঞ্জিন প্লাউ বা লক্ষ টাকা মূল্যের বলীবর্দ্দেরও প্রয়োজন হইত না। বর্ণজ্ঞান-শূন্য ভারতীয় কৃষক প্রাচীন বলরামী লাঙ্গল ও ক্ষুদ্রকায় বলদের দ্বারা কৃষিকার্য্য করিয়া অনুকূল প্রকৃতি ও ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি প্রভাবে ঐ রূপ ফলন ফলাইতে সক্ষম হইত।

অনেক দিন হইল, আমি একবার বিঘায় বিশ মণ হরিদ্রা শুঁট ও চল্লিশ মণ ইক্ষুগুড় এবং একটী বিলান ক্ষেত্রে বিশ মণ হারে ধান্য জন্মাইতে দেখিয়াছিলাম। দশ বার মণ পর্য্যন্ত ছোলা গোম এবং চারি পাঁচ মণ পর্য্যন্ত মসীনা সরিষা জন্মাইতে দেখিয়াছি। সন ১২৬৮ সালে আমার পাঁচ বিঘা জমিতে ৮০ মণ আশু ধান্য হইয়াছিল। এক্ষণে, বিশ বৎসর গত হইল, ঐ রূপ ফলন চক্ষে দেখা দূরে থাকুক, কর্ণেও শুনি নাই। এক্ষণে ভারতের সে দিন গত হইয়াছে। সন ১২৯০ সালে আমার ৫২ বিঘা ধান্যের জমিতে ১৬০ মণ মাত্র ধান্য এবং চারি বিঘা হরিদ্রার জমিতে ১৭ মণ মাত্র হরিদ্রা হইয়াছিল। কিন্তু ঐ বৎসর ১৯এ অগ্রহায়ণ এক পশালা বৃষ্টি হওয়ায় ক্ষেত্র বিশেষে কোন কোন রবিশস্য পূর্ব্ববৎ উৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছিল। বহু বৎসর ধরিয়া অজন্মার পর এক বৎসর একটা ফশল উৎকৃষ্ট জন্মাইলে তাহাতে বিশেষ উপকার দর্শে না, এ কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

আমরা পুরুষানুক্রমে কৃষিকার্য্য করিয়া আসিতেছি; এই কৃষিকার্য্য দ্বারা আমার পিতৃ-পিতামহগণ দোল দুর্গোৎসব নিত্য ক্রিয়া করিয়া জন সমাজে মহা সম্ভ্রান্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু আমি সেই কৃষি-কার্য্য করিয়া সামান্য জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেও সক্ষম হইলাম না। ইহার কারণ অজন্মা ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমি বাল্যকাল হইতে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, পূর্ব্বের তুলনায় এক্ষণে আমাদের কৃষি-ক্ষেত্রে গড়ে অর্দ্ধেকের অধিক শস্য জন্মে না। সে অর্দ্ধেকও সুবৃষ্টি ভিন্ন অনাবৃষ্টি প্রভৃতির বৎসরে নহে।

সংপ্রতি কৃষিকার্য্যের এরূপ দুরবস্থা কেন হইল? তদুত্তরে অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, "এদেশের কৃষি-প্রণালী উৎকৃষ্ট, নহে, এবং কৃষকেরা গণ্ডমূর্খ, তাহারা কৃষি-বিজ্ঞান কাহাকে বলে তাহা জানে না। সুতরাং কৃষি-কার্য্যের সমুচিত উন্নতি হয় না। আর যথার্থই যদি কৃষি-বিভ্রাট কিছু ঘটিয়া থাকে ত সেই জন্যই ঘটিয়াছে।" কিন্তু এ কথা কদাচই ঠিক নহে।

এদেশের কৃষকেরা যে ভাবে কৃষি-কার্য্য করিয়া আসিতেছে, তাহার প্রত্যেক কার্য্যে বিজ্ঞানের বিমল জ্যোতি বিভাসিত দেখিতে পাওয়া যায়।

(ইউরোপের) ন্যায় উচ্চ বিজ্ঞান না জানিলেও তাহারা সেই বিজ্ঞান বলে এক সময় বিঘায় বিশ মণ ধান্য ফলাইতে সক্ষম হইয়াছিল। ইহা কম উন্নতির কথা নহে। এক্ষণে আবার সেই কৃষকেরাই প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া সেই সকল জমিতে দুই মণ আড়াই মণ ধান্য প্রাপ্ত হইতেছে না। অনুসন্ধান করিলে এরূপ দুর্ঘটনার নিম্নলিখিত বিশেষ কয়েকটি কারণ দেখিতে পাওয়া যায়।

১। ভূমির উৎপাদিকা শক্তির অভাব। ২। ভারতের প্রকৃতি-পরিবর্ত্তন হেতু অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টির প্রাদুর্ভাব। ৩। কৃষক-সম্প্রদায় নিরক্ষর, নিরীহ, ও উপায়-বিহীন। ৪। ভূমির সত্বাসত্বের গোলযোগ। ৫। ভারতীয় কৃষি-কার্য্যের প্রতি রাজেশ্বরের সম্পূর্ণ মনোযোগের অভাব ও কৃপাদৃষ্টির কতক পরিমাণে ঔদাসীন্য।

১। উৎপাদিকা শক্তির অভাব। ভূগর্ভে একটি আন্তরিক শক্তি আছে, মৃত্তিকা, জল, তেজ, বায়ু, এই চতুর্ব্বিধ পদার্থ সংযোগে তাহা প্রকাশ পায়। পদার্থ-বিদ্যায় জড় ও জড়ের গুণ সম্বন্ধে আকর্ষণ, বিয়োজন, উৎক্ষেপণ, অধোনিমগ্নন, প্রভৃতি যে সকল বিষয়ের বর্ণনা করা হইয়াছে, তৎসমুদয়ই ঐ ভূগর্ভস্থ আন্তরিক শক্তির কার্য্য। ঐ শক্তি চক্ষের দৃষ্টি-গোচর হয় না ও কোন রূপ যন্ত্রাদির দ্বারা মৃত্তিকাদি পদার্থ-চতুষ্টয় হইতে পৃথগ্-ভূত করিতে পারা যায় না। উহা যে কি আশ্চর্য্য পদার্থ, তাহা হৃদয়ে ধারণা করা সহজ নহে। বাস্তবিক ঐ শক্তি মনোবুদ্ধির অগোচর। উহার গতি প্রকৃতি কি রূপ, বিচারে কিছুই স্থির হইয়া উঠে না।

পৃথিবীর আন্তরিক শক্তি যে কোন পদার্থে প্রকাশ পায়, এবং পদার্থ-বিশেষে তাহার পৃথক্ পৃথক্ নামকরণ হইয়া থাকে। উদ্ভিদ্ পদার্থে প্রকাশ পাইলে, তাহাকে উৎপাদিকা শক্তি অথবা তেজ বলা যায়। কিন্তু ঐ উৎপাদিকা শক্তি পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমান ভাবে বল প্রকাশ করিতে পারে না। তাহার কারণ এই যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র ঠিক এক রূপ বৃক্ষ লতাদি জন্মে না। দেশীয় প্রাকৃত ধর্ম্মভেদে ও মৃত্তিকার অবান্তর ভেদে উদ্ভিদ্ পদার্থের অবয়বের বিভিন্নতা ঘটিয়াছে। কোন উদ্ভিদ্ বৃহদাকৃতি, কেহ বা মধ্যমাকৃতি, কেহ বা নিতান্ত ক্ষুদ্রাকৃতি। কোন জাতীয় উদ্ভিদ্

বহুদিনস্থায়ী, কেহ বা অচিরস্থায়ী, কেহ সারবান্, কেহ বা নিতান্ত অসার।

একটি শাল বৃক্ষ বহুদিনস্থায়ী ও সারবান্; তাহাতে উৎপাদিকা শক্তি যে পরিমাণে বল প্রকাশ করিতে পারে, একটি অসার অচিরস্থায়ী কদলী বৃক্ষে বা ধানের গাছে তাহার বহুলাংশের একাংশ মাত্রও বল প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা নাই। এ সম্বন্ধে আর অধিক বলিবার আবশ্যক হইতেছে না। এই পর্য্যন্ত বলিলেই হইতে পারে যে, পৃথিবীর আন্তরিক শক্তি উদ্ভিদ্ পদার্থে সুপ্রকাশিত হইলে, তাহাকে উৎপাদিকা শক্তি বা তেজ শব্দে কহা যায়। আর উদ্ভিদ্ পদার্থের অবস্থানুসারে ঐ তেজ, অল্প বা অধিক পরিমাণে উদ্ভিদ্ পদার্থের মূল কর্ত্তৃক ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইয়া, সমস্ত মূলদেশ এবং কাণ্ড শাখা প্রশাখা পত্র পুষ্প ফল সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ আকর্ষণের উচ্চতম সীমা বীজপুর। এই জন্য বৃক্ষাদির অন্যান্য অংশ অপেক্ষা বীজপুরস্থিত ফল সকল অধিক শক্তিবিশিষ্ট, তাহার সন্দেহ নাই।

প্রাণী সকল (জাতি বিশেষে) উদ্ভিদ্ পদার্থের কোন না কোন অংশ ভক্ষণ করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও জীবিত থাকে। সুতরাং ঐ শক্তিকে জগতের জীবন স্বরূপ বলিলে বলা যায়। শত শত পরিবর্ত্তনেও ঐ জৈবনিক শক্তির ধ্বংশ নাই। প্রথমে ঐ শক্তি ভূগর্ভে, ভূগর্ভ হইতে উদ্ভিদ্ পদার্থে, উদ্ভিদ্ হইতে নিরামিষ-ভোজী জীব-দেহে, তদনন্তর শ্বাপদ জীবগণ কর্ত্তৃক জীবদেহান্তরে প্রবিষ্ট হয়।

প্রথমে ভূগর্ভের বহুস্থান ব্যাপিয়া যে শক্তি অবস্থিতি করে, ক্রম-পরিবর্ত্তনে ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া তাহা যথাক্রমে উদ্ভিদ্ ও জীব দেহ মধ্যে অত্যল্প স্থানে সঞ্চিত হইয়া থাকে। এই জন্য এক সের স্বাভাবিক মৃত্তিকা অপেক্ষা এক সের গোবর-পচা সার, এবং এক সের গোবর-পচা সার অপেক্ষা অস্থিচূর্ণ এক সেরের উৎপাদিকা শক্তি অধিক।

ঐ বিশ্বব্যাপিনী জৈবনিক শক্তি কদাচ এক স্থানে সুস্থির হইয়া থাকিবার নহে, কখন অচেতন কখন উদ্ভিদ্ ও কখন চেতন পদার্থে বিচরণ করিয়া থাকে। এক দিকে যেমন উদ্ভিদ্ পদার্থ কর্ত্তৃক ভূশক্তি আকৃষ্ট হওয়ায়, মৃত্তিকা কতক পরিমাণে শক্তিহীন হইয়া পড়ে, অন্য দিকে আবার

উদ্ভিজ্জ ও প্রাণী সকল সঞ্চিত শক্তি সমুদয় জীবনান্তে বসুমতীকে প্রতিদান করিয়া ভূশক্তির সমতা রক্ষা করে। এক দেশের উৎপাদিত শস্য সকল অন্য দেশে রপ্তানি না হইয়া যদি দেশেই থাকিয়া যায়, তবেই যথাক্রমে আদান প্রদান হইয়া ভূশক্তির সমতা রক্ষার কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। কিন্তু এক দেশের শস্য ক্রমান্বয়ে বিদেশে রপ্তানি হইতে থাকিলে প্রতিদান অভাবে ঐ দেশের ভূমি সকল ক্রমশঃ শক্তিহীন হইয়া পড়ে।

আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষ অতিশয় শস্যশালী দেশ। পূর্ব্বে এদেশে যখন বহির্ব্বাণিজ্যের আধিক্য ছিল না, তখন দেশের শস্য সকল দেশেই থাকিয়া যাইত। সেই সকল শস্যরাশি, জীবগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াই হউক, অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, পুনর্ব্বার ভূমিসাৎ হইয়া ভারতভূমির উৎপাদিকা শক্তির সমতা রক্ষা করিত। তাহার পর ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এবং অন্য নানা বিদেশীয় বণিক সম্প্রদায়ের প্রথম আগমন হইতে অদ্য পর্য্যন্ত ক্রমে বহির্ব্বাণিজ্যের আধিক্য বশতঃ বৎসর বৎসর ভূরি পরিমাণে শস্য বিদেশে প্রেরিত হইয়া যাইতেছে, এবং তাহার প্রতিদান অভাবে ভারত ভূমির উৎপাদিকা শক্তির ক্রমশঃ ক্ষয় হইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

শস্য-বিনিময়ে অন্য দেশ হইতে ভারতে যে সকল বস্তু আসিয়া থাকে, তন্মধ্যে কাচ, কাগজ, মদিরা, ঔষধ, ছড়ি, ঘড়ি, গিল্টীর জিনিষ, লেপ তোষক, সুগন্ধ দ্রব্য, দেশলাই, এবং বিবিধ কলের জিনিষ ইত্যাদি প্রধান। ঐ সকল পদার্থে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিবার গুণ থাকা সম্ভব নহে। সুতরাং বিবিধ শস্যের রপ্তানিতে ভারত ভূমির উৎপাদিকা শক্তির যে অভাব হইতেছে, বিদেশীয় আমদানিতে সে অভাবের আর পূরণ হইয়া উঠিতেছে না। ইহাতে ভারত যে দিন দিন ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে, তাহা নিশ্চয়।

এক দেশের শস্য ক্রমান্বয়ে বিদেশে রপ্তানি হইলে ঐ দেশস্থ ভূমির যে উৎপাদিকা শক্তির অভাব হয়, একথা যদি কেহ অস্বীকার করেন, তবে তাঁহাকে এ বিষয়ের একটি পরীক্ষা করিবার জন্য আমি অনুরোধ করিতেছি। যে স্থানে বন্যার জল প্রবেশ করে না এবং অন্যত্র হইতে বর্ষার জল

স্রোত বহিয়া আসিতে পারে না, এরূপ এক খণ্ড উচ্চ ভূমিতে সার না দিয়া একাদিক্রমে দশ বৎসর শস্য উৎপন্ন করিয়া দেখুন, বৎসর বৎসর কি পরিমাণে উৎপন্নের ভাগ কমিয়া যায়। আর ঐ দশ বৎসরের উৎপাদিত শস্য ও পোয়াল খড় ভূষি যাহা কিছু হয়, তৎসমুদয় দ্বারা সার প্রস্তুত করিয়া স্বতন্ত্র স্থানে রাখুন। দশ বৎসরের পর ঐ সারগুলি লইয়া ঐ ক্ষেত্রে প্রদান করুন। তদনন্তর ঐ ক্ষেত্রে কি পরিমাণে শস্য জন্মে, তাহা দেখিলেই তিনি আমার কথায় আর অবিশ্বাস করিবেন না। উৎপাদিকা শক্তির অভাবে কৃষি কার্য্যের কি সর্ব্বনাশ ও তাহার পূরণে কি উপকার, তখন তাহা তিনি আপনাপনিই বুঝিতে পারিবেন।

নীল, রেশম, চা, কোষ্টা, কার্পাষ ইত্যাদি জিনিষ সকল রপ্তানি করিলে আয় অধিক হয়, কিন্তু শক্তি-ক্ষয় অতি সামান্য মাত্র হইয়া থাকে। আর চাউল (ধান), গোম, মসীনা ইত্যাদি রপ্তানিতে প্রচুর শক্তি-ক্ষয় অথচ আয় অতি সামান্য। বিশেষতঃ গোম মসীনায় ভূমির যত শক্তি আকর্ষণ করিয়া লয়, অন্য কোন শস্যে সেরূপ লইতে পারে না। এই জন্য কৃষকেরা বলে, "এক গোম দুই মসীনে, ভূঁই বলে আমার কথা কস্‌নে।" কিন্তু এ সকল বিষয় বিশেষ রূপে চিন্তা না করিয়া, পুরুষানুক্রমে আমরা সকল শস্যই বিদেশে রপ্তানি করিয়া আসিতেছি। ইহাতে উৎপাদিকা শক্তির অভাব হইয়া ভূমি সকল ক্রমশঃ অনুর্ব্বরা হইয়া উঠিয়াছে। (১)

১। এক্ষণে কোন আর্য্য-সন্তান জাহাজ আরোহণে সমুদ্রে গমন করিলে তাঁহাকে ধর্ম্মচ্যুত ও জাতিচ্যুত হইতে হয়; কিন্তু অতি প্রাচীন কালে আর্য্যসমাজে এ নিয়ম প্রচলিত ছিল না। লক্ষপতি ধনপতি ও শ্রীমন্ত প্রভৃতি সওদাগরগণ বিবিধ দ্রব্যাদি লইয়া বাণিজ্যার্থ নানা দ্বীপ দেশে গমনাগমন করিতেন অথচ তজ্জন্য তাঁহারা ধর্ম্মচ্যুত ও জাতিচ্যুত হইতেন না। অতি পূর্ব্বে যে ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তাহা মধ্য যুগে নিষিদ্ধ হইবার কারণ কি? বোধ হয়, মধ্য যুগে বহির্ব্বাণিজ্যের আধিক্য বশতঃ যখন ভূরি পরিমাণে শস্য বিদেশে প্রেরিত হইয়া ভারত ভূমির উৎপাদিকা শক্তির ক্ষয় হইতেছিল, সেই সময় ঐ শক্তি-বিচ্ছেদ নিবারণার্থ রপ্তানি বন্ধ করিবার নিমিত্তই জাহাজ আরোহণে সমুদ্র যাত্রা নিষেধ করা হইয়াছিল। তবে আমাদের পূর্ব্ব পিতামহগণ ইহাও বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, কালক্রমে এ বিধি স্থির থাকিবে না। যখন অন্যান্য দেশীয় বর্ব্বরেরা মনুষ্যত্বে

তজ্জন্য পূর্ব্বের হিসাবে এক্ষণে সুবৃষ্টির বৎসরেও অর্দ্ধেকের অধিক ফশল উৎপন্ন হয় না।

যাহা হউক, এক্ষণে আমাদের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে শস্য সকলের রপ্তানি একেবারে বন্ধ করিতে আমাদের সাধ্য নাই। বিশেষতঃ উৎপাদিত শস্যের কতক পরিমাণে বিদেশে চালান না দিয়া, সমুদয় শস্য দেশে মোজুত রাখিলে কিছুতেই চলিবে না। তবে ভূশক্তির সমতা রক্ষার নিমিত্ত প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে কতক পরিমাণে সার আমদানি করা কর্ত্তব্য। নতুবা উৎপাদিকা শক্তির ক্ষয় হেতু উৎপন্নের ভাগ ক্রমেই কম হইতে থাকিবে। তাহাতে, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে না হউক, সমষ্টির উপর ভারতীয় কৃষিকার্য্যের উন্নতির প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না।

এক্ষণে কোন কোন কৃষক অনুমান করেন, অনাবৃষ্টির প্রভাবেই উৎপাদিকা শক্তির অভাব হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু অনাবৃষ্টিতে ঐ শক্তির অভাব হয় না, নিরোধ হয় মাত্র। কেবল বহুল পরিমাণে শস্যের রপ্তানিতেই উৎপাদিকা শক্তির অভাব হইয়া থাকে। ভারতে এক্ষণে শস্যের রপ্তানি প্রযুক্ত শক্তি-ক্ষয় ও অনাবৃষ্টি প্রভাবে শক্তি-নিরোধ যুগপৎ উভয় কাণ্ডই উপস্থিত হইয়াছে।

২। অনাবৃষ্টি। "অনাবৃষ্টিঃ অতিবৃষ্টিঃ শলভাঃ মূষকাঃ খগাঃ। প্রত্যাসন্নাশ্চ রাজানঃ ষড়েতা ইতয়ঃ স্মৃতাঃ॥" এই কবিতাটিতে কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে যে কয়েকটি বিঘ্নের কথা বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে অনাবৃষ্টিই সর্ব্বপ্রধান। কৃষিকার্য্যের পক্ষে অনাবৃষ্টি যেরূপ অনিষ্টকর, অতিবৃষ্টি প্রভৃতি অন্যান্য বিঘ্ন সকল তাহার শতাংশের একাংশও গণ্য নহে। অতিবৃষ্টি প্রভৃতি দৈব উৎপাতে ক্ষেত্র বিশেষে ও উদ্ভিজ্জ বিশেষে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, কিন্তু অনাবৃষ্টি হইলে সে বৎসর উচ্চ নীচ কোন ক্ষেত্রেই

লাভ করিবে, তখন তাহারা আপনারাই আসিয়া ভারতের শস্য সকল হরণ করিয়া লইয়া যাইবে, উৎপাদিকা শক্তি ক্ষয় হেতু কলিতে চারি পোয়া ফসল আর জন্মাইবে না। তাঁহারা এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া কলিযুগের বর্ণনাস্থলে "ক্ষৌণী মন্দফলা বা শস্যহীনা বসুন্ধরা" ও "শাকম্ভরী ময়া পৃথ্বী" ইত্যাদি ভবিষ্যৎ বাণী সকল বলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

ধান্যাদি কোন শস্য সুচারু রূপ জন্মে না, প্রখর রৌদ্রোত্তাপে সমুদয় দগ্ধ হইয়া যায়, এমন কি, প্রাচীন বৃক্ষ সকলও জলাভাবে নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া সমুচিত ফলদানে অসমর্থ হয়।

এক্ষণে ভারতের সর্ব্বত্র যে অনাবৃষ্টির অত্যন্ত প্রাতুর্ভাব হইয়াছে, তাহা সম্যক্‌রূপে সকলেই বিদিত আছেন। কিন্তু প্রাচীন লোকের মুখে শুনা যায় যে, পূর্ব্বে এ দেশে এত অনাবৃষ্টির প্রাতুর্ভাব ছিল না, এবং আমরাও বাল্যকালে তাহার কতকটা দেখিয়াছি। মাঘ মাসের শেষ হইতে বৃষ্টি পতন আরম্ভ হইয়া বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে ঝড় জল ও শিলাবৃষ্টির বিরাম থাকিত না। তাহার পর জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে মৃগশিরা নক্ষত্রে সূর্য্যের সঞ্চার হইলে ঘন বাদলা আরম্ভ হইত। লোকে তাহাকে মৃগের বাদল বা মিগ বলিত। মিগ হইতে ভাদ্র মাসের কতক দিন পর্য্যন্ত দিবারাত্র মুষল ধারে বারিধারা বর্ষণ হইয়া ভারতের হ্রদ নদী বিল খাল ও পুষ্করিণী সকল জলে পরিপূর্ণ হইয়া টলমল করিতে থাকিত। তাহার পর আশ্বিন কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসেও এক এক পশলা বৃষ্টি হইত।

ভারতবর্ষ চিরকালই দেব-মাতৃক দেশ। কৃষকেরা পুরুষানুক্রমে আকাশের দিকে তাকাইয়া কৃষিকার্য্য করিয়া আসিতেছে। এক্ষণে পর্জ্জন্য দেবের প্রতিকূলাচারে যেমন প্রতি বৎসরই সম্বৎসর ধরিয়া প্রায় সুবৃষ্টির সহিত সাক্ষাৎ নাই ও দুর্ভিক্ষের বিরাম নাই, ভারতের পূর্ব্বাবস্থা এরূপ হইলে ভারত কখনই স্বর্ণভূমি পুণ্যভূমি বা অখিল জগন্মণ্ডলের শস্য ভাণ্ডার বলিয়া সর্ব্বত্র খ্যাতি লাভ করিতে পারিত না।

যাহা হউক, ভারতে পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে যে অনাবৃষ্টির অত্যন্ত আধিক্য হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রায় ত্রিশ বত্রিশ বৎসর অতীত হইল, এই অনাবৃষ্টির সূত্রপাত হইয়া ক্রমশঃ বর্ত্তমান সময়ে তাহা ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়াছে। এই অনাবৃষ্টি-প্রভাবে ভারতীয় কৃষিকার্য্যের যতদূর অবনতি হইতে পারে, তাহা হইয়াছে। পূর্ব্বে যে ভূমিতে প্রতি বিঘায় ১৯/ মণ ধান্য জন্মাইত, এক্ষণে সেই ভূমিতে বিঘা প্রতি গড়ে দুই মণ আড়াই মণের অধিক ধান্য উৎপন্ন হইতেছে না। অবনতি আর কাহাকে

বলে ? ইহা অপেক্ষা আর একটু বাড়াবাড়ি হইতে গেলে, ভারতভূমি যে মরুভূমিতে পরিণত হইবে, তাহা নিশ্চয়। কিন্তু কি জন্য ভারতের ভাগ্যে এ যুগান্তর উপস্থিত, তাহা একবার ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব এবং কৃষিকার্য্যে অবনতি সম্বন্ধে অনেকেই অনেক মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা সে সকল মতের পক্ষপাতী নহি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ভূমির শক্তিক্ষয় ও ভারতের পূর্ব্ব প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হওয়াতেই এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বে শক্তিক্ষয়ের কথা বলা হইয়াছে, এক্ষণে প্রকৃতি-পরিবর্ত্তনের বিষয় নিম্নে ক্রমশঃ প্রকাশ করা যাইতেছে।

প্রকৃতি যে পরিবর্ত্তনশীল, ইহা কাহারও অবিদিত নাই। যে কোন স্থানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, সেই স্থানেই প্রকৃতি-পরিবর্ত্তনের ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। চেতন অচেতন ও উদ্ভিজ্জ এই ত্রিবিধ পদার্থই ঐ পরিবর্ত্তন নিয়মের অধীন। তবে জন্ম হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত প্রাণী সকলের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা এবং উদ্ভিজ্জ পদার্থের অবয়ব যে ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তাহা যেমন সকলেই প্রত্যক্ষ করেন, অচেতন পদার্থের প্রকৃতি-পরিবর্ত্তনের প্রতি সাধারণ জনগণের সেরূপ লক্ষ্য থাকে না এবং দুই দশ বৎসরে তাহা পরিষ্কার রূপে বুঝাও যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া অচেতন পদার্থ সমুদয় ঐ অপরিহার্য্য নিয়মের বহির্ভূত নহে।

পণ্ডিতেরা নিরূপণ করিয়াছেন, যেখানে এক সময়ে মহাসমুদ্র ছিল, এখন সে স্থানে সাহারা মরুভূমি তিব্বত দেশ ও হিমালয় পর্ব্বত প্রভৃতি বিরাজ করিতেছে। যেখানে সামুদ্রিকা মহাদেশ ছিল, তথায় এখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপব্যূহ মাত্র জলধিজলে ভাসিতেছে। ঋগ্‌বেদের সময়ে যে সরস্বতী নদী গভীর-জল-পূর্ণা থাকিত, মহাভারতের সময় তাহা লুপ্ত-তীর্থ নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। এইরূপে পৃথিবীর কতস্থানে কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা কাহার সাধ্য ?

এক্ষণে পৃথিবীর উত্তরার্দ্ধে যে স্থলভাগ দৃষ্ট হইতেছে, যাহাতে বসতি করিয়া আমরা সুখ স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা অতিবাহিত করিতেছি, ইহার অভ্যন্তর ভাগে যেরূপ অভিনব স্তর সকল স্তরে স্তরে সাজান রহিয়াছে, তাহা

দেখিয়া বোধ হয়, ইহা কোন এক সময়ে জলমগ্ন ছিল, অগ্নির সাহায্যে ও স্রোতের জলে আনীত মৃত্তিকা কর্ত্তৃক স্থলাংশে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু অগ্নি জল উভয়ে এই প্রভূত মৃত্তিকা রাশি কোথা হইতে লইয়া আসিয়াছিল ? তদুত্তরে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, দক্ষিণ ভাগে সমুদ্র-আখ্যাধারী যে জলরাশি ধূ ধূ করিতেছে, সেই জলস্থানই এই নব্যসম্ভূত মৃত্তিকার আকর-স্থল। নতুবা আকাশ-মার্গ বা সূর্য্য-মণ্ডল হইতে সহসা ইহা নিপতিত হয় নাই। অণ্ড-প্রকরণ হইতে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত চির দিনই পৃথিবী-মণ্ডলে থাকিয়া জলের সাহায্যে অগ্নি কখন উত্তরার্দ্ধকে স্থলময় ও দক্ষিণার্দ্ধকে জলময় আবার কখন দক্ষিণার্দ্ধকে স্থলময় ও উত্তরার্দ্ধকে জলময় করিয়া থাকে। প্রকৃতি-পরিবর্ত্তন হেতু সর্ব্বংসহা-মণ্ডলে এরূপ কল্পান্তর কতবার ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে। আর্য্যশাস্ত্রে সাংখ্য পাদ্ম বরাহ প্রভৃতি কল্পান্তর সকলের উল্লেখ আছে। বাইবেলে কল্পান্তরের উল্লেখ নাই বটে, তথাপি তাহার সৃষ্টি-প্রকরণ দেখিয়া বোধ হয়, যেন একটি কল্পান্তরের পর ঐ সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে।

বস্তুতঃ ভূমণ্ডলের কোন বস্তু কোন স্থানে ক্ষণকালের জন্য সুস্থির নহে, কোন অবস্থা ধারাবাহিক রূপে চিরস্থায়ী নহে। সে স্থলে ভারতের বাহ্য প্রকৃতি চির দিন যে ঠিক এক ভাবে থাকিবে, ইহা কদাচই সম্ভব হইতে পারে না। বাস্তবিক ভারতের পূর্ব্ব প্রকৃতির অনেকাংশ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। হিমালয় প্রভৃতি পর্ব্বত সকলের উপত্যকা ও অধিত্যকা ভাগ এবং ভারতের উচ্চ ভূমি সকলের পৃষ্ঠদেশ বৃষ্টি জলে ধৌত হইয়া সর্ব্বদা নিম্নাভিমুখে ধাবিত হইতেছে। স্রোতোজলে চালিত মৃত্তিকা-রাশি পলিরূপে পরিণত হইয়া ভারতের হ্রদ, নদী, খাল, প্রাচীন দীর্ঘিকা, পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয় সকলের গর্ভস্থল ক্রমশঃ পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। অনেক বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় সকল একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাহাদের চিহ্ন সকল অদ্যাপি নানা স্থানে দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

ব্রহ্মপুত্র গঙ্গা সিন্ধু এবং তাহাদের শাখা নদী ও উপনদী সকল প্রাচীন কালে কতই গভীর ছিল। এক্ষণে পলি ও বালু চাপিয়া সেই গভীরতার বিলক্ষণ হ্রাস করিয়া দিয়াছে। এক্ষণে ক্রমশঃ যে ভাবে স্তর জমি-

তেছে, তাহাতে গঙ্গা প্রভৃতি নদী সকলের আর অধিক কাল স্থায়িত্ব সম্ভব নহে।

চলন, কালান্তর, বনাজ প্রভৃতি সুগভীর বহ্বায়ত হ্রদ সকল কালক্রমে মনুষ্যের বাসোপযোগী স্থলভাগে পরিণত হইয়াছে এবং তাহাদের তলদেশ সকল দিন দিন উচ্চ হইয়া উঠিতেছে। আমরা বাল্যকালে যে সকল বিল খাল ও পুষ্করিণীতে বার মাসের জন্য প্রভূত পরিমাণে জল থাকিতে দেখিয়াছি, তাহাদের অধিকাংশই এখন ফাল্গুণ চৈত্র মাসের মধ্যে শুখাইয়া যায়। ফলতঃ পূর্ব্বে ভারতের সর্ব্বত্র যে পরিমাণ জল সংস্থান থাকিত, এক্ষণে তাহার অনেক কম হইয়া গিয়াছে।

রাঢ় দেশ উচ্চ ভূমি; তথায় জল-কষ্টের সম্ভব দেখিয়া বোধ হয়, কৃষি-পরাশরের পূর্ব্বেও তদ্দেশে পান ও সেচনের জন্য অসংখ্য পুষ্করিণী খনন করা হইয়াছিল, এবং সেই অসংখ্য বৃহৎ ও ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর জলে সমস্ত রাঢ় দেশ সর্ব্বদা টল্‌টল্‌ করিত। এখন সে দেশে সেচন দূরে থাকুক, সর্ব্বত্র রীতিমত পানীয় জল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এ স্থলে অনেক বলিতে পারেন যে, পুষ্করিণী প্রভৃতি কৃত্রিম জলাশয় সকল ভারতীয় মূল প্রকৃতির অঙ্গ নহে। না হউক, তথাপি তাহারা অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রকৃতির অঙ্গে মিশিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছিল। এখন তাহাদের অভাবে প্রকৃতির যে অঙ্গ-বৈকল্য ঘটিতেছে, তাহার সন্দেহ নাই।

আর নদীর স্রোতে আনীত মৃত্তিকা-রাশি সমস্তই যে নদী-গর্ভের ও তাহার অববাহিকার নিম্ন তলভূমিতে পলিরূপে পতিত হয়, এমন নহে, কতকাংশ সমুদ্রাভিমুখেও ধাবিত হইয়া থাকে। ঐ মৃত্তিকার দ্বারা বঙ্গোপসাগরের ও ভারত মহাসাগরের গর্ভস্থল অল্পে অল্পে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, এবং ভারতের উপকূল ভাগে স্তর সংলগ্ন হইয়া স্থল-ভাগের আয়তন দিন দিন বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে। তাহাতে সমুদ্রের জল-সীমা হইতে উত্তর ও মধ্য দেশ ক্রমে দূরতর হইয়া উঠিতেছে, এবং সমতল ও নিম্নতলস্থ ভূমি সকল প্রকারান্তরে দিন দিন উচ্চ হইয়া উঠিতেছে। অন্য দিকে আবার বৃষ্টিজলে ধৌত হইয়া উপত্যকা অধিত্যকা প্রভৃতি উচ্চ ভূমি সমূহ নিম্ন হইয়া পড়িতেছে। হ্রদ, নদী, বিল, খাল, পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয় সকল পূর্ণ-

গর্ভ হইয়া শরাবাকার ধারণ করিতেছে। গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে সে অতলস্পর্শ আর বর্ত্তমান নাই।

। একণে বন-বিভাগের অবস্থাও ভাল নহে। নেপাল, সিকিম, ভোট, আসাম, চট্টগ্রাম প্রভৃতি পার্ব্বত্য প্রদেশগুলি মহারণ্যে আবৃত থাকায়, তত্তৎ প্রদেশের মৃত্তিকার উপর চন্দ্র সূর্য্যের সন্দর্শন ছিল না। সুতরাং মৃত্তিকা আর্দ্র থাকিয়া অজস্র বাষ্পোদ্গিরণ করিত এবং প্রস্রবণ সকলে সুনির্ম্মল বারি রাশি ঝর ঝর শব্দে সর্ব্বদা প্রবাহমান হইত। একণে চায়ের আবাদের অনুরোধে ও তদানুষঙ্গিক ঘটনাবলির নিমিত্ত অধিকাংশ জঙ্গল প্রায় নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে ও অদ্যাপিও হইতেছে। জঙ্গলশূন্য অনাবৃত মৃত্তিকার সহিত একণে সূর্য্য দেবের অতি নিকট সম্বন্ধ সংঘটন হইয়াছে। সূর্য্যোত্তাপে মৃত্তিকা পরিশুষ্ক হওয়াতে পূর্ব্বের ন্যায় আর বাষ্পোত্থান হয় না, এবং নির্ঝর সকলের বারি-ধারা নিতান্ত সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে ; কোন কোন ঝরণা একেবারে শুখাইয়া গিয়াছে। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যে সকল স্থান অতি সুশীতল ছিল, একণে তথায় অনেকটা গ্রীষ্মানুভব হইয়া থাকে। চায়ের আবাদের জন্য পার্ব্বত্য প্রদেশ সকলের অতি দ্রুতবেগে প্রকৃতি-পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। প্রাচীন মহারণ্য সকল একণে অনাবৃত চা-ক্ষেত্রে পরিণত ও লোকালয়ে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা দেশীয় প্রাকৃত ধর্ম্ম-ভেদের যে সকল কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে সূর্য্যোত্তাপ, সমুদ্রের জলসীমা হইতে দেশের উচ্চতা ও নৈকট্য, দিক্ ভেদে দেশের ঢালুতা, পর্ব্বত হ্রদ নদী প্রভৃতি জলাশয়, বায়ুর গতি, বৃষ্টি ও মৃত্তিকার অবস্থা, ইত্যাদি প্রধান। উক্ত নৈসর্গিক পদার্থ সকলের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর যোগ সামঞ্জস্য প্রযুক্ত, ভারতের এক অনির্ব্বচনীয় প্রকৃতিমাধুর্য্য সংঘটন হইয়াছিল। একণে সেই সামঞ্জস্য ভঙ্গ হইয়া ভারতের মাধুর্য্য প্রকৃতির যে সকল অঙ্গ পরিবর্ত্তন হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার ভবিষ্যৎ ফল অশুভ ভিন্ন শুভ নহে।

যদিও আফ্রিকার সমসূত্রে নিরক্ষ বৃত্তের অতি সন্নিকটে ভারতের অবস্থিতি এবং তাহার ঢালুতাও পূর্ব্বদিকে অপেক্ষাকৃত অধিক, তথাপি ভারতের বায়ুমণ্ডল ও স্থলভাগ কখন আফ্রিকার ন্যায় উত্তপ্ত হইতে পারে নাই।

তাহার কারণ এই যে, ভারতের পূর্ব্ব-দক্ষিণে সমুদ্র এবং সমুদ্রের জল-সীমা হইতে তাহার উচ্চতা অতি অল্প, নানা স্থানে বৃহৎ বৃহৎ হ্রদ সুদূর-বাহিনী সুগভীর স্রোতস্বতী ক্ষুদ্র সরিৎ বিল খাল দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী প্রভৃতি অসংখ্য জলাশয়, এবং স্থানে স্থানে বিশাল তরু-লতা-সমাকীর্ণ মহারণ্যে আবৃত পর্ব্বত শ্রেণী। সেই সকল পার্ব্বত্য প্রদেশের জলার্দ্র মৃত্তিকা হইতে ও সমভূমিস্থ অসংখ্য জলাশয় হইতে এবং পূর্ব্বে বঙ্গ সাগর ও দক্ষিণে ভারত মহাসাগর হইতে রাশি রাশি বাষ্পোত্থিত হওয়াতে (এক মাত্র মাড়োয়ার দেশ ভিন্ন) ভারতের বায়ুমণ্ডল সর্ব্বদা জল-সম্পৃক্ত থাকিত। জল-কণা-পূর্ণ বায়ু-হিল্লোল ভেদ করিয়া সূর্য্যদেব ভারতের সর্ব্বত্র আপনার ভীষণ মূর্ত্তি সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করিতে সক্ষম হইতেন না। ভারতীয় সজল বায়ু সংস্পর্শে তাপাংশের তীক্ষ্ণতা খর্ব্ব হইয়া, প্রভঞ্জনোদ্দীপ্ত কিরণ-মালা শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিত, এবং পরিণামে তাহা তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া একাংশ অরণ্যোপরি অপরাংশ জলাশয়ে, অবশিষ্ট একাংশ মাত্র ভূপৃষ্ঠে পতিত হইত। তাহাতে ভূতল অতি সামান্য মাত্র উত্তপ্ত হইয়া শীত গ্রীষ্মের সমতা রক্ষা করিত।

ভারতের মধ্যস্থলে বিন্ধ্য গিরির অবস্থিতি প্রযুক্ত এবং মাড়োয়ার দেশের অধিকাংশ স্থল বালুকাময় বলিয়া, পশ্চিম প্রদেশে উপরোক্ত অবস্থার একটু বিপর্য্যয় দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু আফ্রিকার সহিত তুলনা করিলে, ভারতের সর্ব্বত্র প্রায় মধুর শীত ও মধুর গ্রীষ্মই বলা যাইতে পারে। ভারতের ন্যায় এরূপ পর্য্যায় ক্রমে ষড়্ঋতুর আবির্ভাব পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে প্রায় বর্ত্তমান নাই। ভারত কর্কট ক্রান্তির মধ্যগত হইয়াও পূর্ব্বে সমমণ্ডলে পরিগণিত ছিল। কিন্তু এক্ষণে গ্রীষ্ম মণ্ডলে পরিণত হইবার জন্য দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছে; কাহার সাধ্য সে গতির প্রতিরোধ করে।

তাপাতিশয্যের কারণ এই যে, চা ক্ষেত্রের অনুরোধে পার্ব্বত্য প্রদেশের মহারণ্য সকল স্থানে স্থানে নির্ম্মূল হইয়া যাওয়াতে, তথাকার ভূমি এক প্রকার নীরস হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং সেই সকল প্রদেশ হইতে পূর্ব্বের ন্যায় আর বাষ্পোত্থিত হইতেছে না। অন্য দিকে সমভূমিস্থ জলাশয় সকল সংকীর্ণ ও পরিশুষ্ক হইয়া, পূর্ব্ববৎ রাশি রাশি বাষ্পোদ্গিরণে একেবারে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছে। গঙ্গা প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ নদীগর্ভে যে ভাবে বালুচর

জমিতেছে, বোধ হয় কালক্রমে বাষ্পের পরিবর্ত্তে হয়ত মরীচিকা উৎপন্ন হইবে।

অতঃপর একমাত্র সমুদ্র-বাষ্প ভরসা-স্থল। কিন্তু উপকূল ভাগে স্তর জমিয়া সমুদ্রও দিন দিন দূরস্থ হইয়া পড়িতেছে। পূর্ব্বে যে বায়ুরাশি পর্ব্বতারণ্যে ও অসংখ্য জলাশয়স্থ জলমণ্ডলোপরি অবস্থিতি করিয়া প্রভূত পরিমাণে বাষ্প-বারি পান করতঃ পূর্ণসিক্ত হইয়া থাকিত, এখন সেই বায়ু-মণ্ডল পরিশুষ্ক ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া বাষ্পবারির পরিবর্ত্তে সূর্য্য-কিরণ হইতে তাপরাশি সঞ্চয় করিতেছে। ইহাতে যে বায়ুমণ্ডল কিরূপ পরিশুষ্ক হইয়া উঠিয়াছে, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না।

প্রাচীন কালের জঙ্গলময় ভূমি ও সমুদ্রোপকূল প্রভৃতি জলাভূমি সকল এক্ষণে অনাবৃত প্রান্তরে পরিণত হইয়াছে। ভারতের যে ভূম্যংশের সহিত সূর্য্যের কখন সাক্ষাৎ ছিল না, এক্ষণে সেই সকল ভূমি প্রতিনিয়ত সূর্য্যকিরণ সম্ভোগ করতঃ তাপ সংগ্রহ করিতে অধিকার পাইয়াছে। তজ্জন্য ক্রমেই ভারতের মৃত্তিকা ও বায়ু উষ্ণ ও পরিশুষ্ক হইয়া উঠিতেছে।

এদেশে এক্ষণে যে ঝড়ের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, ইহাও বায়ুর পরিশুষ্কতা-দোষের একটী জলন্ত দৃষ্টান্ত বলিতে হইবে। প্রথিত আছে, বিশেষ কোন কারণ বশতঃ কোন এক স্থান উত্তপ্ত হইয়া উঠিলে, ঐ স্থানের বায়ু স্ফীত হইয়া ঊর্দ্ধ মার্গে উঠিতে থাকে এবং চতুর্দ্দিকের বায়ুমণ্ডল আন্দোলিত হইয়া ঐ স্থান পূরণ করিবার চেষ্টা করে। পুনঃ পুনঃ ঐরূপ চেষ্টার দ্বারা ঝড়ের উৎপত্তি হয়। কিন্তু সজল বায়ুতে উত্তপ্ত স্থান যত শীঘ্র শীতল হইয়া ঝড়ের নিবৃত্তি হয়, পরিশুষ্ক উষ্ণ বায়ুতে কদাচই সেরূপ হইতে পারে না। সুতরাং ভারতের কোন এক স্থানে একটু ঝড়ের সূত্রপাত হইলে, বায়ুর পরিশুষ্কতা দোষে ঐ ঝড় অনেকক্ষণ স্থায়ী ও বহু দেশ ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

ভারতের প্রকৃতি-পরিবর্ত্তন হেতু বাষ্পোত্থানের ব্যতিক্রম ঘটিয়া শুদ্ধ যে উত্তাপের বৃদ্ধি ও বায়ুর পরিশুষ্কতা দোষ ঘটিয়াছে, এমন নহে, উহাতে ভারতীয় কৃষিকার্য্যের সর্ব্বনাশ হইতেছে। বাষ্প-পরিমাণ কম হওয়াতে মেঘের প্রকৃতি-বিকার ও অনাবৃষ্টির প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিয়াছে।

পূর্ব্বে পার্ব্বত্য প্রদেশ সমভূমি ও সমুদ্র হইতে প্রায় সম পরিমাণে রাশি রাশি বাষ্পোত্থিত হইয়া মেঘের অবয়ব সুসম্পন্ন করিত, এবং অনুকূল বায়ু তাপ তাড়িত ও শৈত্যের সাহায্যে পূর্ণ মাত্রায় বারিধারা বর্ষণ হইত। এক্ষণে পার্ব্বত্য প্রদেশের ও সমভূমির বাষ্পের অবস্থা যেরূপ ঘটিয়াছে, তাহা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা হইয়াছে। তবে সমুদ্র-বাষ্পের অতি অল্প ভিন্ন, এখনও অধিক ইতর বিশেষ হয় নাই বটে, কিন্তু পূর্ব্বে প্রদেশত্রয় হইতে যে পরিমাণে বাষ্পোত্থিত হইত, স্থূল হিসাবে সমুদ্র-বাষ্প তাহার এক-তৃতীয়াংশ অপেক্ষা অধিক নহে।

ঐ এক-তৃতীয়াংশ সমুদ্র-বাষ্প, এবং পার্ব্বত্য ও সমভূমি হইতে অর্দ্ধেকেরও অধিক বাষ্প যদিচ কম হইয়া গিয়াছে, তথাপি না হয় উভয় স্থল হইতে আর এক-তৃতীয়াংশ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে পূর্ব্ব হিসাবে দশ আনার অধিক বাষ্প সংস্থান হইতেছে না। ষোল আনার স্থলে দুই-তৃতীয়াংশ বাষ্পের দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে মেঘোৎপত্তি ও পূর্ণ মাত্রায় বারি বর্ষণের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। অনুকূল বায়ু তাপ তাড়িত ও শৈত্য, ইহারা বারি-বর্ষণের নিমিত্ত কারণ মাত্র। বাষ্পই বৃষ্টির সমবায়ী কারণ। বাষ্পের অভাবে মেঘোৎপত্তি ও বারিবর্ষণ কদাচই সম্ভব নহে। তাহাতে আবার বায়ু তাপ তাড়িত ও শৈত্যেরও যথেষ্ট ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। বাষ্পের পরিমাণ অল্প হওয়া বায়ুর পরিশুষ্কতা দোষ এবং তাপাতিশয্য প্রভৃতি বিবিধ কারণে সুবৃষ্টি তিরোহিত হইয়া, ক্রমশই অনাবৃষ্টির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিয়াছে। বায়ুকোণোদিত গাঢ় নীলবর্ণের সে বর্ষপ্রদ মেঘমালা (ইতর ভাষায় যাহাকে "হেড়ে চোঙ্গরা মেঘ " বলিত) এক্ষণে আর উদয় হয় না। প্রাচীন কালের সে কাল-বৈশাখী, জ্যৈষ্ঠ ঝালক, মৃগের বাদল, আষাঢ় শ্রাবণের অজস্র বারিধারা, সিংহের বাদল, আশ্বিনে গম্ভীর, ইত্যাদি কিছুই এক্ষণে নিয়মিত রূপে হইতে দেখা যায় না। মেঘ বৃষ্টির ঐ সকল কাণ্ড লোপ পাইয়া, অধিকাংশ বৎসরেই অনাবৃষ্টি না হয় বিশৃঙ্খল বৃষ্টি হইয়া থাকে। ঐ অনাবৃষ্টি-প্রভাবে ভারত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি নিরোধ হইয়া শস্য উৎপন্নের পরিমাণ অত্যন্ত কম হইয়া গিয়াছে। অনাবৃষ্টি বৎসরে যেরূপ শস্য জন্মে, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের গভর্ণমেণ্ট ও অনেক অনেক জমিদার আপন আপন অধিকার মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ বিল সকলের দাঁড়া কাটিয়া জল নিঃসারণ পূর্ব্বক শস্য ক্ষেত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন। কিন্তু জল-সেচনের উপায় বিধান না করিয়া ঐরূপ ক্ষেত্র সংখ্যা বৃদ্ধি করায় কৃষি-কার্য্যের উপকার না হইয়া বরং অপকারই হইয়াছে। আর ইহাতে দেশের জল-সংস্থান কম হইয়া বাষ্পোত্থানের ব্যতিক্রম ও উত্তাপের আধিক্য ঘটিয়াছে; এই কার্য্যের দ্বারা প্রকৃতি-বিভ্রাটের বিলক্ষণ পোষকতা করা হইয়াছে। আবার অনেক শিক্ষিত লোকের মত যে, দেশের জঙ্গল যত পরিষ্কার হয় ও বদ্ধ জল যত নিষ্কাশিত হইয়া যায়, ততই দেশের মঙ্গল; এবং কার্য্যতও তাহাই করিতে দেখা যায়। কিন্তু জল জঙ্গলের যত অভাব হইতেছে, ততই দেশের উত্তাপ বাড়িতেছে ও বাষ্পোত্থানের ব্যতিক্রম ঘটিয়া সুবৃষ্টি সম্বন্ধে মহা বিভ্রাট ঘটাইতেছে, ইহা তাঁহারা এক বারও ভাবিয়া দেখেন না। অনেক সুবিজ্ঞ ডাক্তার পাড়াগাঁয়ে আগমন করিয়াই বলিয়া থাকেন, "উঃ কি জঙ্গলা গাঁ, এই জন্যই ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি হইয়াছে।" প্রত্নতত্ত্ববাদী মাননীয় ডাক্তার রাজেন্দ্র-লাল মিত্র এক সময়ে বলিয়াছিলেন, "রেল রাস্তার নয়ানজোলের জল নিঃসারণ-প্রণালী না-থাকায় দেশ ম্যালেরিয়া বিষে উৎসন্ন যাইতেছে।" এই সকল মত কত দূর অভ্রান্ত বলিতে পারি না। আমাদের বিশ্বাস, জল কোন আকারে কলুষিত না হইলে এবং জল জঙ্গল পৃথক থাকিলে কদাচই ম্যালেরিয়া বিষ উৎপন্ন হইতে পারে না। তবে জল জঙ্গল একত্রে পচিয়া পূতিগন্ধময় বাষ্পোত্থিত হইলে, অবশ্যই তাহা অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। কিন্তু তজ্জন্য একেবারে জল-নিঃসারণ ও জঙ্গল-উচ্ছেদ ব্যবস্থা না করিয়া জল জঙ্গল রক্ষা পূর্ব্বক যাহাতে জলাশয় সকল কোন রূপে কলুষিত এবং জল ও জঙ্গল একত্রিত না হয়, তাহারই উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য।

অতিবৃষ্টি। প্রকৃতি-পরিবর্ত্তন হেতু এক দিকে যেমন অনাবৃষ্টির আধিক্য হইয়াছে, অন্য দিকে তেমনই অতিবৃষ্টির পর্য্যায়ও কতকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, পূর্ব্বের হিসাবে ইদানীং দুই-তৃতীয়াংশের অধিক বাষ্প সংস্থান হয় না, এবং তাপ ও বায়ুর সামঞ্জস্যের অভাব প্রযুক্ত সেই দুই-তৃতীয়াংশ বাষ্প মেঘের আকার-ধারণ করিয়া, তাহার সমুদয় অংশ বৃষ্টিরূপে

পৃথিবীতে পতিত হইতে পারে না। সুতরাং একণে বার্ষিক যে পরিমাণে বাষ্পোত্থিত হয়, তাহার অধিকাংশই মেঘ ও বৃষ্টিরূপ ধারণ না করিয়া বাষ্পাকারে আকাশেই থাকিয়া যায়, এবং তন্নিমিত্তই অনাবৃষ্টির প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। এইরূপ তিন চারি বৎসরের বাষ্প আকাশে ক্রমান্বয়ে সঞ্চিত হইলে শেষে তাহার পরিমাণ এত অধিক হইয়া উঠে যে, তখন বায়ুতে ঐ বাষ্পরাশি ধারণ করিয়া থাকিতে আর সমর্থ হয় না। তিন চারি বৎসর পরে যে বার এই কাণ্ড ঘটনা হয়, সেই বৎসর অতিবৃষ্টি হইয়া থাকে। তবে সকল বৎসর অতিবৃষ্টি ঠিক সমান ভাবে হয় না; বৎসর ভেদে বিবিধ কারণ বশতঃ তাহার পরিমাণের অনেক তারতম্য হইতে দেখা যায়। ঐ অতিবৃষ্টির পর বৎসর প্রায় সুবৃষ্টি হইয়া তাহার পর বৎসর বৎসর বিশৃঙ্খল বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি হইতে আরম্ভ হয়।

পূর্ব্বে যখন এ দেশে প্রভূত পরিমাণে বৃষ্টি পতন হইত, তখনও এই রূপে বৎসরের শেষে কিয়দংশ বাষ্প আকাশে থাকিয়া যাইত। তবে সম্বৎসরে প্রচুর জল বর্ষণ হইয়া অবশিষ্ট বাষ্পের পরিমাণ নিতান্ত অল্প হইয়া পড়িত। প্রতি বৎসরের সেই অল্প পরিমাণ বাষ্প ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত হইয়া পোনের ষোল বৎসরে তাহা অধিক হইয়া উঠিত। সেই সময়ে একবার অতিবৃষ্টির আবির্ভাব হইত।

পূর্ব্বে কত বৎসর অন্তর কোন্ কোন্ বৎসরে অতিবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, তাহা একণে জানিবার উপায় নাই। কিন্তু এ দেশীয় প্রাচীন লোকের মুখে কতক পূর্ব্বের কথা শুনা যায় যে, ১২১২ ও ১২৩০ সালে এবং তদনন্তর ১২৪৫ সালে অতিবৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু একণে অনুসন্ধান করিলে ইদানীন্তন কালের অতিবৃষ্টির পর্য্যায়টা কিরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এক বার পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য। ১২৪৫ সালের পর ১২৬৩, ১২৬৮, ১২৭৪, ১২৭৮, ১২৮৩, ১২৮৬, ১২৯২, ও ১২৯৩ সালে অতিবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে এদেশে কচিৎ অনাবৃষ্টি এবং পোনের ষোল বৎসরান্তে এক এক বার অতিবৃষ্টির আবির্ভাব হইত। কিন্তু একণে প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হেতু চারি পাঁচ বৎসর লইয়া অতিবৃষ্টির পর্য্যায় চলিয়া আসিতেছে। আবার ৯২, ৯৩ সালে উপর্য্যুপরি দুই বৎসরই অতিবৃষ্টি হইয়াছে। দেখা গিয়াছে,

প্রত্যেক পর্য্যায় অনাবৃষ্টির তারতম্যানুসারে অতিবৃষ্টির ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে। ১২৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১ সালে যেমন অনাবৃষ্টির প্রাদুর্ভাব, ১২৯২, ৯৩ সালে তেমনই অতিবৃষ্টির প্রাচুর্য্য। শুনা যায়, ১২৩০ সালের পূর্ব্বে ১২২৬ সালে ভয়ানক অনাবৃষ্টি হইয়াছিল। পূর্ব্বে যে অতিবৃষ্টি পোনের যোল বৎসরান্তে সংঘটিত হইত, এক্ষণে চারি পাঁচ বৎসরান্তে তাহাই ঘটিতেছে। ১২৬৩ সাল হইতে ৯৩ সাল পর্য্যন্ত কথন চারি কথন পাঁচ ও কথন ছয় বৎসরান্তে অতিবৃষ্টি হইয়া আসিতেছে। প্রত্যেক পর্য্যায় অনাবৃষ্টির অভাব হয় নাই। তবে যে বৎসর সম্পূর্ণ ভাবে অনাবৃষ্টি ঘটে নাই, সে বৎসরও সুবৃষ্টি হইতে প্রায় দেখা যায় নাই। বৎসরের মধ্যে যথন তথন বৃষ্টি হইলে তাহাকে সুবৃষ্টি না বলিয়া বিশৃঙ্খল বৃষ্টি বলা যাইতে পারে। শস্য সম্বন্ধে উপযুক্ত সময়ে পরিমাণ মত বৃষ্টি হইলেই তাহাকে সুবৃষ্টি বলে। কিন্তু এক্ষণে সুবৃষ্টি না হইয়া প্রায়ই অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, না হয় বিশৃঙ্খল বৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহাতে ভারত ভূমির উৎপন্নের পরিমাণ বিলক্ষণ কম হইয়া উঠিয়াছে।

ভারতের প্রকৃতি-পরিবর্ত্তনের স্থূল স্থূল বিবরণ যাহা বর্ণিত হইল, ইহার ভবিষ্যৎ ফল বড়ই ভয়ঙ্কর। দুই চারি বৎসরান্তে এক এক বার সুবৃষ্টি হইলেও হইতে পারে। কিন্তু এথন যে প্রতি বৎসর ক্রমেই অনাবৃষ্টির প্রাদুর্ভাব হইবে, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহের কারণ নাই। অনাবৃষ্টির বৎসরে ভারতের কোথাও ছয় আনা কোথাও আট আনা মাত্র ফশল হইয়া থাকে, এবং সেই জন্যই ভারতে এরূপ দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এক্ষণে এ অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় কি?

পৃথিবীর নানা স্থানে নানা প্রকৃতি বর্ত্তমান রহিয়াছে। দেশীয় প্রাকৃত ধর্ম্ম-ভেদেই বৃক্ষলতাদির ভেদ হইয়া থাকে। যে দেশের যে প্রকৃতি, সেই প্রকৃতির নিয়মানুযায়ি যে সমস্ত বৃক্ষলতাদি জন্মে, যাবৎ ঐ প্রকৃতি বর্ত্তমান থাকে, তাবৎ কাল ঐ সমস্ত বৃক্ষলতাদি তথায় সুচারুরূপে জন্মিতে পারে, এবং দেশের প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভাবে পরিবর্ত্তন হইয়া গেলে, তত্রত্য বৃক্ষলতাদির অভাব হইয়া যায়। ভূগর্ভস্থ মৃদঙ্গার ও বোদ মাটি তাহার দৃষ্টান্তস্থল।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে, ভারতের পর্ব্বত অধিত্যকা উপত্যকা সমভূমি ও উপকূল প্রভৃতি স্থলভাগ, সমুদ্র-হ্রদ নদী বিল খাল ও পুষ্করিণ্যাদি জলা-

শয়, এবং ভূশক্তি তাপ বায়ু, বাষ্প মেঘ ও বৃষ্টি প্রভৃতি সকলেরই দিন দিন স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া উঠিতেছে; কিন্তু পূর্ব্ব প্রকৃতির নিয়মোদ্ভূত ধান্যাদি উদ্ভিদ্ পদার্থ সকল আপন আপন স্বভাব পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম নহে। তাহারা পূর্ব্ববৎ যথানিয়মিত রূপে শক্তি জল বায়ু ও তাপের আকাঙ্খা করিতেছে। তাহার কিঞ্চিৎমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিলে তাহারা আপনাদের জীবন রক্ষা ও শস্য প্রসব করিতে সমর্থ হয় না। অথচ ভারতের সর্ব্বত্রই এখন প্রকৃতি-বিপর্য্যয় উপস্থিত। ঐ প্রকৃতি-বিপর্য্যয় নিমিত্ত কৃষিক্ষেত্রে অজন্মা হইয়া অধিবাসীগণের কষ্টের একশেষ হইতেছে। একেত অন্নকষ্ট, তাহার উপর স্থানে স্থানে আবার এরূপ জলকষ্ট হইয়াছে যে, দেখিলে দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। জলাভাবে পল্লীগ্রামের লোক সকল হাহাকার করিতেছে।

সৃষ্টি-তত্ত্বে, মৃত্তিকা, জল, তাপ, বায়ু, এই চতুর্ব্বিধ পদার্থের সমান উপযোগিতা দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ পদার্থ-চতুষ্টয়ের যোগ সামঞ্জস্য ব্যতীত উদ্ভিদাদি কোন পদার্থ উৎপন্ন হইতে ও জীবন ধারণ করিতে পারে না। সুতরাং উদ্ভিদাদি পদার্থ সকলের উৎপত্তি ও রক্ষার নিমিত্ত মৃত্তিকাদি পদার্থ-চতুষ্টয়ের যথা নির্দ্দিষ্টরূপে যোগাযোগের আবশ্যক করে। পৃথিবীর প্রায় তিন ভাগ জল ও একভাগ স্থল। তথাপি মৃত্তিকা তাপ ও বায়ুর ন্যায় সর্ব্বত্র জলের সংযোগ বর্ত্তমান নাই। জলাভাবে কত শত স্থান ভয়ঙ্কর মরুভূমি হইয়া রহিয়াছে। ভারতের প্রকৃতি দেবী সানুকূল হইয়া সেই জল-সংযোগের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই ভারতের এত সৌভাগ্য এত গৌরব। কিন্তু এক্ষণে ভারতের দুরদৃষ্ট-বশতঃ প্রকৃতি দেবী তৎকার্য্য হইতে ক্রমশঃ অবসর গ্রহণে উদ্যত হইয়াছেন; এক্ষণে ভারতের উপায় কি? কৃষি-প্রধান ভারতবর্ষে, শিল্প বল, বাণিজ্য বল, কিছুতেই কিছু হইবে না। কৃষিকার্য্যের উন্নতি ব্যতীত কেবল মাত্র বিদ্যার উন্নতিতে কোন উপকার দর্শিবে না। সম্প্রতি যেরূপ প্রকৃতি-বিভ্রাট উপস্থিত, তাহাতে ভারতের সর্ব্বত্র জল-সংস্থান ভিন্ন আকাশের দিকে তাকাইয়া কৃষিকার্য্য করা চলিবে না। কিন্তু এই প্রথম ভাগ কৃষিতত্ত্বের আকার-বাহুল্য-ভয়ে এ স্থলে তাহাতে নিরস্ত হওয়া গেল। জল-সংস্থান, কৃষকদিগের অবস্থা, এবং ভূমির সত্বাসত্বের বিবরণ দ্বিতীয় ভাগের উপক্রমণিকায় বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীহারাধন মুখোপাধ্যায়।

সূচী-পত্র।

শুদ্ধি-পত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	১-২	ঐ বিভিন্ন'কৃতি কোথায় ব',	ঐ বিভিন্নাকৃতি মৃত্তিকা কোথায় বা
"	২-৩	বিশ্বপরিপালিনী মৃত্তিকারূপে	বিশ্বপরিপালিনী রূপে।
"	১৭	ক্টক	কটক
"	১৯	ক্টকের	কটকের
৬	১৩	৪। শৈলতল	৩। শৈলতল
৭	২৪	এবং জন্য	এবং এই জন্য
১৫	৮	৫। চণে ম্যেটেল	৫। চূণে ম্যেটেল
২১	১১	জা তর	জাতীয়
২৪	৪	অ.ব	আবর্জ্জনা
২৭	১০	পলন	পলল
"	১৮	নদীর পলি—বালী ও পলি	নদীর পলিসকল, পলি ও বালি
"	১৯	গেলে	পতিত হইলে
৩৯	২৪	নায়ক	নায়েক
৪০	১	গর-নায়ক	গর-নায়েক
৪৬	১৫	ভূমিসমেত	ভুবিসমেত
৪৭	১৪	লুড়াইয়া	ছড়াইয়া
৫০	৩	সমুদয়ই	তৎ সমুদয়ই
৫৩	৩১	মাংসম্পহাটা	মাসম্পূহাটা
৫৪	৬	ব.য়র	বায়ুর
৬৩	১৮	কৃষিক্ষেত্রে	কৃষিক্ষেত্র
৬৭	২৬	কথিত	কর্ষিত
৬৮	২১	একথা	এক ঘা
৭০	৯	তাহা	তাহাকে
"	"	করিতে হয়	চষিতে হয়
৭২	২০	ক্ষেত্রেই	ক্ষেত্রের
৭৪	৬	নাকাচিকা জলসিক্ত	নাকাচিকা জলযুক্ত

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭৭	১৫	বনন	বপন
৮০	২৫	বাগ্‌ড়ো ও আমন	বাগ্‌ড়ো আমন
১০৮	২৩	হওয়া	হইয়া
১০৯	২	কাষ্ঠ হয়	কাষ্ঠ
১১৪	...	এই পৃষ্ঠায় তিনটি অস্ত্রের প্রতিকৃতি আছে। তাহার প্রথম চিত্রকে নিড়ানী, দ্বিতীয়টিকে কুড়ানী, ও তৃতীয়টিকে খুরপী বা বাক বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রথম ও দ্বিতীয় দুইটি চিত্রই দ্বিবিধ নিড়ানীর প্রতিকৃতি হইয়াছে। ভ্রমক্রমে চিত্রকর কুড়ানী এবং খুরপীর আকার চিত্র করেন নাই। এবং তৃতীয় চিত্রটি কোন অস্ত্রই হয় নাই।	
১১১	...	এই পত্রস্থ কাঁদালের চিত্র ঠিক হয় নাই।	
১২৫	২২	পুর্ণিকোলে	সুনিকোলে
১৩২	১০	মম্যা	মূল্য
১৩৭	...	রোয়া আমনের চিত্র-ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ স্থানে ধান্যের গুছি বসিবে, তাহার চিহ্ন দিতে ভুল হইয়াছে।	
১৩৮	৪	বৈশাখী রোয়া	বৈশাখী বোয়া
”	১৭	আকরে	আফোরে
”	২৫	আকরে	আফোরে
১৪০	৪	আকারে	আফোরে
”	১৪	আকর	আফোর
১৪২	৫	করিয়া করিয়া	করিয়া
১৪৪	৭	বুনানীয় সময় তিন ভাগে	বুনানীর সময় বিলান ক্ষেত্র সকল তিন ভাগে।
১৫৪	৯	করিলে	করিতে
১৬৬	...	শুকরগুঞ্জরির উৎপন্ন লভ্যের মধ্য হইতে খাজানা বাবদ আর ॥০ আট আনা বাদ যাইবে।	
	১৫	পেচান	পচান
১৭০	২১	লাভ ৩॥/১০	লাভ ৬॥/১০
১৭৪	৪	হরিদাক্ত	হরিদ্রাক্ত
১৭৪	৬	উলটাইয়া	উচলাইয়া
	৬-৭	চেঙ্গাইয়া	ঠেঙ্গাইয়া

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৯১	৭	ক্ষেত্রে	ক্ষেত্র
১৯৬	২৩	বিল ঘাটে	বিল মাটে
১৯৮	১৯	ও এই হৈমন্তিক	ও হৈমন্তিক
২০০	১৭	বৈশাখ মাসে পাকিয়া উঠে	বৈশাখ মাসে বুনানী হইয়া শ্রাবণ ভাদ্র মাসে পাকিয়া উঠে।

কৃষি-তত্ত্ব।

অনুষ্ঠান।

ভূমির কর্ষণ প্রভৃতি শস্যোৎপাদন ক্রিয়াকে কৃষিকার্য্য বলে। যে পুস্তক পাঠ করিলে কৃষিকার্য্যের সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়, তাহার নাম কৃষিতত্ত্ব।

কৃষিতত্ত্ব প্রধানতঃ চারি ভাগে বিভক্ত। প্রথম, ভূবৃত্তান্ত; দ্বিতীয়, কৃষি-অনুষ্ঠান; তৃতীয়, উদ্ভিজ্জ-ভেদ; চতুর্থ, ভূমির রাজস্ববিবরণ ও স্বত্ব সাব্যস্ত, ইত্যাদি।

ভূ-বৃত্তান্ত।

মণ্ডল প্রপঞ্চ।

আমরা যে প্রকাণ্ড ভূপিণ্ডে অবস্থিতি করিতেছি, ইহা প্রধানতঃ পঞ্চ মণ্ডলে বিভক্ত। প্রথম, গ্রীষ্ম মণ্ডল; তদুভয় পার্শ্বে সমমণ্ডল; তদ্বহির্ভাগে পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তস্থিত মেরুসন্নিহিত স্থানের নাম হিম মণ্ডল।

পৃথিবীর মধ্য স্থানে যে নিরক্ষ বৃত্তের কল্পনা করা যায়, তথায় সূর্য্যরশ্মি ঠিক ঋজুভাবে নিপতিত হইয়া থাকে। ঐ ভূভাগে গ্রীষ্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। গ্রীষ্ম মণ্ডলে বৃক্ষ লতাদি যেমন সুচারুরূপে জন্মে, তেমন অন্য কুত্রাপি সম্ভবে না। সুতরাং গ্রীষ্ম মণ্ডলই বৃক্ষ লতাদির আকর-স্থান বলিতে হইবে।

গ্রীষ্ম মণ্ডলের উভয় পার্শ্বে সূর্য্য কিরণ কিঞ্চিৎ বক্রভাবে পতিত হইয়া শীত গ্রীষ্মের সমতা রক্ষা করিতেছে। ঐ সম-মণ্ডলেও উদ্ভিদ্ পদার্থের অভাব নাই। তথায় বৃক্ষ, লতা, গুল্মাদি বিবিধ উদ্ভিজ্জ জন্মিয়া থাকে।

অনন্তর পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তস্থিত মেরুসন্নিহিত স্থানে সূর্য্য-রশ্মি এরূপ তীর্য্যক্ ভাবে পতিত হইয়া থাকে, যে তথায় উত্তাপের অভাবে সমুদয় স্থান প্রায় চির নীহারে আবৃত। সেই জন্য হিম মণ্ডলে বৃক্ষাদির বিরল উৎপত্তি। কেবল কয়েক জাতীয় তৃণ, গুল্ম ও শৈবাল ভিন্ন আর কিছুই তথায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

উদ্ভিদ্ পদার্থের আকর-স্থান গ্রীষ্ম মণ্ডল সর্ব্বত্র এক ভাবাপন্ন নহে। বিবিধ কারণ বশতঃ নানা স্থানে তাহা বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। সম মণ্ডলে ও হিম মণ্ডলেও ঐ নিয়ম বর্ত্তমান রহিয়াছে। সুতরাং একই মৃত্তিকা বিশেষ বিশেষ লক্ষণ দ্বারা পৃথক পৃথক শ্রেণী-ভুক্ত হইয়াছে। একই মৃত্তি-কার আকৃতি, প্রকৃতি, এবং উৎপাদিকা শক্তির, বিস্তর অবান্তর ভেদ দৃষ্ট হয়।

অতল-স্পর্শ গভীর সমুদ্র-তলস্থ মৃত্তিকা হইতে (১) অত্যুচ্চ পর্ব্বত শিখর-স্থিত মৃত্তিকা, এবং সমভূমি ও মরুভূমি (২) পর্য্যন্ত প্রত্যেক ভূমির আকৃতি

১। ভূগর্ভে নানা জাতীয় স্তর সকল বর্ত্তমান আছে। পৃথিবীর আন্তরিক শক্তি এবং অগ্নি জলের সাহায্যে ঐ সকল স্তর স্ফীত এবং ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পর্ব্বতের উৎপত্তি করে। সমতল ক্ষেত্র হইতে পর্ব্বতের উচ্চতা অনেক অধিক। কোন কোন ক্ষুদ্র পর্ব্বতের একটি মাত্র শৃঙ্গ। আর বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত সকল শৃঙ্গোপশৃঙ্গে সংগঠিত, এবং প্রত্যেক শৃঙ্গের নিম্নদেশে এক একটি গভীর গহ্বর দৃষ্ট হয়। ঐ সকল পর্ব্বতের একপার্শ্ব ঋজুভাবে উচ্চ, ও অপর পার্শ্ব ঢলু। পর্ব্বতের কোন অংশে জমাট প্রস্তর, এবং কোন অংশে প্রস্তর মৃত্তিকা উভয় পদার্থই মিশ্রিত হইয়া থাকিতে দেখা যায়। পৃথিবীতে অনেক পর্ব্বত আছে। তন্মধ্যে ভারতবর্ষের উত্তর প্রান্তস্থিত হিমালয় পর্ব্বত সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও উচ্চ।

২। আফ্রিকা ও মধ্যএসিয়া প্রভৃতি দেশ সকলে বৃহৎ বৃহৎ মরুভূমি দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের পশ্চিম মাড়োয়ার দেশেও মরুভূমি আছে। কিন্তু আরব ও সাহারা মরুভূমিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও ভয়ঙ্কর। ঐ সকল প্রদেশে শত শত ক্রোশ বিস্তীর্ণ বালুকা-রাশি চতুর্দ্দিকে ধূ ধূ করিতেছে, এবং তাহার মধ্যে এক বিন্দু জল বা একমুষ্টি তৃণও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। উষ্ট্র ভিন্ন অপর কোন পশু এই মরুভূমিতে চলিতে পারে না। বার্ত্তাবাহেরা উষ্ট্র আরোহণে মরুভূমি সকল অতিক্রম করিয়া যায়। কখন কখন উত্তপ্ত বালুকারাশি বায়ু প্রবাহে উড্ডীন হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে। শুনিতে পাওয়া যায়, এই প্রকারে অনেক পথিকের প্রাণ নষ্ট হইয়াছে। মরুভূমিতে সচরাচর মরীচিকা উৎপন্ন হইয়া থাকে। বালুকাময় মরুভূমি নয়, এরূপ বৃহৎ প্রান্তরেও চৈত্র বৈশাখ মাসের মধ্যাহ্ন সময়ে

প্রকৃতি পৃথক্‌রূপে অবস্থিত রহিয়াছে*। প্রাকৃত ধর্ম্মভেদে ঐ বিভিন্নাকৃতি কোথায় বা নানা জাতি বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, ওষধি প্রসব করিয়া বিশ্বপরিপালিনী মৃত্তিকা রূপে জীবের জীবনীস্বরূপা; কোথায় বা জীব-সংহারিণী মরীচিকা-উৎপাদিনী, অপ্রীতিকর-মূর্ত্তিময়ী মরুভূমি নামে পরিচিতা; কোথায় বা কদর্য্য তৃণ পরিপূর্ণ, দাবানল-গর্ভিণী, তৃণ-ক্ষেত্র-নামাঙ্কিতা; (১) কোথায় বা গগন-স্পর্শী বিশাল-তরু-লতা-সমাকীর্ণ, শ্বাপদ পশুদিগের আবাস স্থল, মহারণ্য-রূপিণী; কোথায় বা জল-স্থল-শায়িনী পঙ্কিল জলাভূমি-নাম-ধারিণী।

মরীচিকা উৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে। উত্তরে মুরশিদাবাদ ও রাজপুর পরগণা, দক্ষিণে কালীগঞ্জ হইতে কৃষ্ণনগর, পশ্চিমে গঙ্গা, পূর্ব্বে হাউলীয়া নদী, এই চতুঃসীমান্তর্ব্বর্ত্তী ভূভাগের আকার দেখিয়া ইহা পুরাকালীয় সমুদ্রের গভীর গহ্বর বলিয়া বোধ হয়। সমুদ্রের জল সরিয়া গেলে, ইহা এক সময় হ্রদ নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। কালক্রমে ঐ হ্রদ স্থলাংশে পরিণত ও মনুষ্যের বাসোপযোগী হইয়াছে। ইহার অনেক স্থান অদ্যাপি পরিশুষ্ক হয় নাই, পঙ্কিল ও জলময় রহিয়াছে। জলঙ্গী নদী ইহাকে দ্বিধা বিভক্ত করিতেছে। পূর্ব্ব ভাগকে বনাজ এবং পশ্চিম ভাগের নাম কালান্তর কহে। এই কালান্তর প্রদেশের বৃহৎ বৃহৎ প্রান্তর সকলে মরীচিকা উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। আবার কখন কখন দূর হইতে ঐ সকল প্রান্তর মধ্যে অট্টালিকা, পুরীর ন্যায় এক অতি আশ্চর্য্য দৃশ্য নয়ন-গোচর হইয়া থাকে। তত্রত্য অধিবাসীরা তাহাকে "হরিশ্চন্দ্রের ফটক" বলে। বোধ হয়, প্রাচীন কালে ঐ আশ্চর্য্য দৃশ্য দর্শনেই হরিশ্চন্দ্রের ফটকের কথা কল্পনা হইয়া থাকিবে। মরীচিকার কথা সকলেই অবগত আছেন, কিন্তু হরিশ্চন্দ্রের ফটকের বিষয় সাধারণে পরিজ্ঞাত নহেন। বাস্তবিক উহা মরীচিকার ন্যায় এক প্রকার ভ্রম বিশেষ। কালান্তর ও বনাজ প্রদেশের বৃহৎ বৃহৎ প্রান্তর সকলে রাত্রিকালে অনেক আলোক প্রজ্জ্বলিত হইতে দেখা যায়।

(১) "আমেরিকা খণ্ডে শত শত ক্রোশ বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড সকল কেবল তৃণে পরিপূর্ণ। বর্ষাকালে ঐ সমস্ত তৃণ পাঁচ ছয় হাত উচ্চ হইয়া সমুদয় স্থান মনোহর হরিদ্বর্ণে আবৃত করে। পরে গ্রীষ্ম সমাগমে সমুদয় তৃণ পরিশুষ্ক হইয়া যায়। মধ্যে মধ্যে দাবানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া, সমস্ত ক্ষেত্র অগ্নিময় হইয়া উঠে। তথায় কোন বৃক্ষাদি জন্মে না এবং মনুষ্যের বসতি নাই, কৃষি কার্য্যের প্রচার নাই। ঐ সকল ভূভাগকে তৃণ-ক্ষেত্র বলে।" প্রকৃত ভূগোল।

ভূমি-ভেদ।

পঙ্ক-মণ্ডল-স্থিত পৃথিবীর সমুদয় ভূভাগ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত; একাংশের নাম উর্ব্বরা ভূমি; অপরাংশের নাম উষর ভূমি।

উপত্যকা, অধিত্যকা, শৈলতল, সমভূমি, নদীমুখাশ্রয় ভূমি প্রভৃতি যে যে ভূভাগে হল-চালনা ও নানাবিধ বৃক্ষ লতা ঔষধি আদি উৎপন্ন হইতে পারে, সেই সকল ভূভাগ উর্ব্বরা ভূমির অন্তর্নিবিষ্ট। আর পর্ব্বত শিখর, তৃণক্ষেত্র, লবণাকর সমুদ্রতলস্থ মৃত্তিকা, এবং জলাভূমি ও মরুভূমি প্রভৃতি, যে যে স্থানে হলচালনা হইবার উপায় নাই (তথায় বীজ অঙ্কুরিত হউক বা না হউক), সেই সকল ভূভাগ উষর ভূমি বলিয়া পরিগণিত।

যদিচ পর্ব্বত-শিখরে বহুবিধ বৃক্ষ লতাদি, জলাভূমিতে নানাজাতীয় শৈবাল, ও তৃণক্ষেত্রে বহুল পরিমাণে তৃণ জন্মিয়া থাকে, এবং নিতান্ত মরুভূমি বা লবণ-ক্ষেত্রের ন্যায় উৎপাদিকা-শক্তি-বিহীন ও উদ্ভিজ্জ-শূন্য নহে, কিন্তু হলব্যবহার্য্য নহে বলিয়া ঐ সকল ভূভাগকে প্রথমাংশের অন্তর্নিবিষ্ট উর্ব্বরা ভূমি বলিতে আমাদের অভিরুচি হইল না। সুতরাং পর্ব্বত-শিখর, তৃণ-ক্ষেত্র, লবণাকর, জলাভূমি ও মরুভূমি, ইত্যাদি ভূখণ্ড সকল, উষর ভূমির অন্তর্গত দ্বিতীয়াংশে পরিগণিত করিয়া অনাবশ্যক বিবেচনায়, তাহাদের বর্ণনায় নিরস্ত হওয়া গেল। প্রথমাংশে নির্ণীত উপত্যকাদি পঞ্চখণ্ডের বিষয় অতি প্রয়োজনীয় বোধে তদ্বর্ণনে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

১। উপত্যকা। (১)

নিকটস্থ দুইটি পর্ব্বত বা পর্ব্বত-শ্রেণী বা পর্ব্বত-শৃঙ্গ পরিবেষ্টিত নিম্ন তল ভূমির নাম উপত্যকা। পর্ব্বত এবং অধিত্যকাংশের সমস্ত জলরাশি আসিয়া

(১) শৈলতল ভিন্ন অন্য চারিখণ্ডের বিবরণ, মাননীয় বাবু রাজেন্দ্র লাল মিত্র প্রণীত প্রাকৃত ভূগোল অনুসারে লিখিত হইয়াছে। দারজিলিং প্রদেশে হিমালয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপত্যকা ও অধিত্যকা সকল এবং শৈলতল আমি স্বয়ং দেখিয়াছি। প্রাকৃত ভূগোলে তাহাদের উল্লেখ নাই।

ঐ উপত্যকায় পতিত হয়। ঐ জল-স্রোতে উপত্যকার নিম্ন প্রদেশে দুই একটি নদীর উৎপত্তি করে। সমস্ত পার্ব্বত্য জলরাশি ঐ নদী দিয়া প্রবাহিত হইয়া যায়। আকৃতি প্রভেদে কোন উপত্যকা সমভূমির ন্যায় প্রশস্ত, কোনটা নিতান্ত অপ্রশস্ত, কোনটা বা গোলাকার।

ভারতবর্ষে কাশ্মীর, ইয়ুরোপে বহিমিয়া, দক্ষিণ আমিরিকা, কর্ডিলেরা, প্রধান উপত্যকা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন পর্ব্বত সকলের নিম্নদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপত্যকা দৃষ্ট হয়। কিন্তু সে সকল তত বিখ্যাত নহে। উপত্যকার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর এবং ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা। উপত্যকার মৃত্তিকা. বৃক্ষাদির পক্ষে ও কৃষিকার্য্যে বিলক্ষণ অনুকূল। তথায় নানাজাতীয় বৃক্ষ লতা ও ঔষধি সকল উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। এক্ষণে হিমালয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপত্যকা সকলে অতি উৎকৃষ্ট চা (১) জন্মিতেছে।

২। অধিত্যকা।

বহুদূর-বিস্তীর্ণ পর্ব্বত শ্রেণীর এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত-শৃঙ্গের উপরিভাগস্থ ভূমির নাম অধিত্যকা। উহা উর্ব্বরতা বিষয়ে উপত্যকা হইতে অনেকাংশে নিকৃষ্ট। তথায় জলকষ্টেরও সম্ভাবনা আছে। কিন্তু স্বাস্থ্য বিষয়ে অধিত্যকা অতিশয় প্রসিদ্ধ, এই জন্য তত্রস্থ অধিবাসীরা যে প্রকার বলবান ও শৌর্য্যশালী হয়, উপত্যকা ও সমভূমি-নিবাসীদের তাদৃশ হইবার সম্ভাবনা নাই।

অধিত্যকামাত্রই পর্ব্বতের উপরিভাগস্থিত হওয়াতে, তাহারা সমুদ্রের জলসীমা হইতে অনেক উচ্চ হয়। হিমালয় ও কৈলাস পর্ব্বতের মধ্যস্থিত স্থান

---

(১) প্রায় চল্লিশ বৎসর গত হইল, ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট বহু যত্ন সহকারে চীন দেশ হইতে বীজ আনাইয়া, ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে চা আবাদের সূত্রপাত করেন। কিন্তু চীনের চা হইতেও অতি উৎকৃষ্ট এক জাতীয় চায়ের গাছ আসাম প্রদেশের অরণ্য মধ্যে জন্মিয়া থাকে। তাহার বৃত্তান্ত পূর্ব্বে কেহই অবগত ছিলেন না। কয়েক বৎসর অতীত হইল ঐ চায়ের গাছ আবিষ্কার হইয়াছে। উদ্ভিজ্জ-প্রকরণে তাহার বিশেষ বিবরণ লিখিত হইবে। রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁর বস্তুবিচারে চায়ের বিষয় যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার সকল অংশ যে সম্পূর্ণ সত্য নহে, তাহা আমি স্বহস্তে চায়ের আবাদ ও চা প্রস্তুত করিয়া জানিয়াছি।

স্থিরীকৃত দেশ, ভারতবর্ষে কর্ণাট, আমেরিকার গোয়াটিমালায় টিটীকাকা, প্রভৃতি স্থান সকল অধিত্যকা বলিয়া বিখ্যাত। কোন কোন অধিত্যকার উচ্চতা অত্যন্ত অধিক। উচ্চতার আধিক্যানুসারে তথায় শীতের আধিক্য হইয়া থাকে। অধিক শীতল স্থানে উদ্ভিদ্ পদার্থের বিরল উৎপত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং সমভূমি ও উপত্যকার ন্যায় অধিত্যকায় কৃষিকার্য্যের সমুচিত ফল পাইবার প্রত্যাশা নাই। কিন্তু অধিত্যকামাত্রই যে নিতান্ত উদ্ভিজ্জ-শূন্য ও কৃষিকার্য্যের অনুপযুক্ত, এমন নহে। হিমালয়ের পাঁচ হাজার, সাত হাজার ফীট উর্দ্ধ স্থলে যে সকল অধিত্যকা অবস্থিত রহিয়াছে, উপত্যকা হইতে সে সমস্ত ভূভাগকে উর্ব্বরতা শক্তিতে নিকৃষ্ট বলা যায় না। সেখানে নানা জাতীয় উদ্ভিজ্জ-শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়, এবং যথেষ্ট চাও উৎপন্ন হইতেছে। কিন্তু পাঁচ হাজার ফীট উর্দ্ধ স্থলে, গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের অধিকাংশ বৃক্ষাদি ভালরূপ জন্মে না।

৪। শৈলতল।

আমি কৃষিতত্ত্বে যে শৈলতল শব্দ ব্যবহার করিতেছি, ইহা কোন একটি প্রদেশ বিশেষের চিরপ্রচলিত সুপ্রসিদ্ধ নাম নহে। পর্ব্বততলে যে প্রশস্ত ভূমিখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সমভূমিরই তুল্য। সুতরাং তাহা সমভূমি বলিয়াই চিরদিন কথিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু যথার্থ তাহা সমভূমির সহিত অভিন্ন নহে। এই জন্য শৈলতল বলিয়া উহার পৃথক নাম করণ করা হইল।

হিমালয়ের দক্ষিণস্থ শৈলতল অত্যন্ত গ্রীষ্ম-প্রধান স্থান। তাহার জল বায়ু এরূপ অস্বাস্থ্যকর যে, তাহাকে এক প্রকার যমপুরী বলিলে বলা যাইতে পারে। কিন্তু বৃক্ষাদির পক্ষে এরূপ উর্ব্বরা ভূমি আর দ্বিতীয় নাই। পার্ব্বত্য নির্ঝর বারি সকল ঐ ভূভাগ দিয়া প্রবাহিত হইয়া থাকে। এজন্য শৈলতলের প্রায় সর্ব্বাংশেই অগণ্য (ক্ষুদ্র বা বৃহৎ) নদী সকল দেখিতে পাওয়া যায়। বৃষ্টি-জলে পর্ব্বত-গাত্র-ধৌত মৃত্তিকা-রাশি স্রোত-সহকারে নিপতিত হইয়া শৈলতলের উর্ব্বরতাশক্তি বৃদ্ধি করে।

শৈলতলের দুই তিন হস্ত নিম্নে সমস্ত ভূগর্ভ রাশি রাশি প্রস্তর খণ্ডে

পরিপূর্ণ। পর্ব্বত হইতে যতদূর পর্য্যন্ত ভূগর্ভে শিলাখণ্ড দৃষ্ট হয়, ততদূর অবধিই শৈলতলের সীমা বলিতে হইবে।

হিমালয়ের দক্ষিণস্থ শৈলতলকে, নেপালের নিম্নে মোরং, দারজিলিঙ্গের নিম্নে তরাই, ও ভূটানের নিম্নে ডুয়ার বলে। তত্রত্য অধিবাসীগণ দেখিতে সুশ্রী ও বলবান নহে। এই ভূভাগের অধিকাংশ স্থান অদ্যাপি মহারণ্যে আবৃত রহিয়াছে।

একণে এই প্রদেশে বহুল পরিমাণে চায়ের আবাদ হইতেছে। এখানকার তুল্য চা আর কোন স্থানে জন্মে না। অধিত্যকা ও উপত্যকায় একার প্রতি চারি মণের অধিক চা হয় না; কিন্তু শৈলতলে প্রতি একারে আট মণ দশ মণ পর্য্যন্ত চা ফলিয়া থাকে।

৪। সমভূমি।

বহুদূর বিস্তীর্ণ প্রশস্ত ভূভাগের নাম সমভূমি। সমুদ্রের জল-সীমা হইতে ইহা অধিক উচ্চ নহে। সমুদ্র হইতে ইহার উচ্চতা দশ হস্ত হইতে পঞ্চাশ হস্ত পরিমিত হইবে। সমভূমিতে বহু হ্রদ, নদী, ও ক্ষুদ্র সরিৎ, এবং বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, ওষধি, ও শ্যামল শস্য পরিপূর্ণ ক্ষেত্র সকল নয়ন-গোচর হইয়া থাকে। তথায় কোন পর্ব্বতাদি দৃষ্ট হয় না। আর্য্যাবর্ত্ত, পারস্য, সিবিরিয়া, চীন, হঙ্গেরি, শ্যাম, প্রভৃতি দেশ সকল প্রশস্ত সমভূমির দৃষ্টান্ত-স্থল। কৃষিকার্য্যে সমভূমি অতিশয় প্রসিদ্ধ। কিন্তু উর্ব্বরতা শক্তিতে সকল সমভূমির মৃত্তিকা সমান নহে। দেশীয় প্রাকৃত ধর্ম্মভেদে তাহার বিলক্ষণ তারতম্য হইয়া থাকে।

৫। নদীমুখাগ্রস্থ ভূমি।

নদী মুখাগ্রস্থ ভূমি দেখিতে প্রায় সমভূমিরই তুল্য, কেবল তত্তুল্য বহুদূর-বিস্তীর্ণ নহে। ইহার আকৃতি প্রায় ত্রিকোণ, ও "ব" এই অক্ষরের ন্যায়, এবং জন্য ইহাকে "ব" দ্বীপও কহিয়া থাকে। নদীর স্রোতো জলে আনীত মৃত্তিকারাশি নদীমুখে বৎসর বৎসর পলিরূপে পরিণত হইয়া থাকে। সুতরাং নদী মুখাগ্রস্থ ভূমি, উৎপাদিকা শক্তিতে শৈলতলের সমকক্ষ, এবং কৃষি কার্য্যের পক্ষে বিলক্ষণ অনুকূল। তথায় প্রধানা, শাখা, এবং

কর প্রবাহিনী প্রভৃতি নদী সকলের, উভয় পার্শ্বের স্থানে স্থানে সর্ব্বদাই তট ভগ্ন হইয়া থাকে। নদীমাত্রেরই একদিকে সিকস্তি, অন্যদিকে পয়স্তি দেখিতে পাওয়া যায়। পয়স্তি ভূমিকে সচরাচর "চর" কহে; কখন কখন "মেদে" বা "দেয়ার"ও বলা গিয়া থাকে।

নূতন মেদের জমি অত্যন্ত উর্ব্বরা; এবং এই খণ্ডের করারি ভূমিও উর্ব্বরা শক্তিতে অমুৎকৃষ্ট নহে। নদীমুখাগ্রস্থ ভূমি কৃষিকার্য্যে অতিশয় প্রসিদ্ধ, কিন্তু কখন কখন নদীর স্ফীত জলে ধান্যাদির বিলক্ষণ অপচয় হইয়া থাকে।

ক্ষেত্র-ভেদ।

সামান্য লক্ষণানুসারে পৃথিবীর স্থলাংশের সাধারণ নাম ভূভাগ। ঐ ভূভাগ, বিশেষ বিশেষ লক্ষণানুসারে (আকৃতি ও প্রকৃতির অসমতাহেতু), পর্ব্বত, উপত্যকা, অধিত্যকা, শৈলতল, সমভূমি, নদীমুখাগ্রস্থ ভূমি, মরুভূমি, ও তৃণ-ক্ষেত্র ইত্যাদি পৃথক পৃথক নাম ধারণ করিয়াছে। তম্মধ্যে কৃষ্যুপযোগী উপত্যকাদি প্রধান পঞ্চ খণ্ডের স্থূল স্থূল বিষয়ের বর্ণনা করা হইল। উক্ত উপত্যকাদি পঞ্চ খণ্ড প্রধান দুই ভাগে বিভক্ত, উচ্চ ভূমি ও নিম্ন ভূমি।

ঐ উচ্চ ও নিম্ন ভূমিরও সমস্ত স্থান ঠিক সমানাকৃতির নহে; বিস্তর অবান্তর ভেদ দৃষ্ট হয়। তাহাকে "ক্ষেত্র"ভেদ বলে। আকৃতি প্রকৃতি ভেদে প্রত্যেক ক্ষেত্রের পৃথক পৃথক নামকরণ হইয়াছে। এইরূপে পাঁচ প্রকার ক্ষেত্র হইয়াছে। যথা—

১, কূর্ম্মপৃষ্ঠ (পিঠেটান); ২, ক্রমনিম্ন (আড়গড়ান); ৩, সমতল (একতালা); ৪, কুণ্ডী (জোল); ৫, বিলান (১)।

ইহার মধ্যে কূর্ম্মপৃষ্ঠ, ক্রমনিম্ন, ও সমতল এই তিনটি উচ্চ ক্ষেত্র নামে পরিচিত। এবং কুণ্ডী ও বিলান এই দুইটি নিম্ন ক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধ। এই সকল ক্ষেত্রের নামও লক্ষণ ক্রমশঃ প্রদর্শিত হইতেছে।

---

(১) বহ্বায়ত বিলান ক্ষেত্রের মধ্যে অনেক স্থান দেখিতে পিঠেটান, ক্রমনিম্ন, ও সমতল ক্ষেত্রের ন্যায়। কিন্তু সে সকল ক্ষেত্র ঐ সকল নামে কথিত হয় না। তাহার অন্য স্থানে এক প্রকার নাম আছে। বিলান ক্ষেত্র বর্ণনার সময় তাহা প্রকাশিত হইবে।

১। কূর্ম্ম পৃষ্ঠ।

প্রশস্ত মাঠের মধ্যে চতুর্দ্দিকের ভূমি অপেক্ষা যে স্থান কিছু অধিক উচ্চ হয়, সেই ক্ষেত্রের নাম "কূর্ম্ম পৃষ্ঠ"। ইতর ভাষায় ইহাকে "পিঠে-টান" বলে। ঐ ক্ষেত্র দেখিতে কচ্ছপের পৃষ্ঠের মত কুব্জাকার; কোথাও সমতল কোথাও বা বন্ধুর। ইহাতে বর্ষার জল আবদ্ধ হইয়া থাকে না, পতিত মাত্রেই চারিদিকে গড়াইয়া যায়। বৃষ্টি জলে এই ক্ষেত্রের পৃষ্ঠ দেশের মৃত্তিকাসকল ধৌত হইয়া স্থানান্তরে গিয়া পতিত হয়। তজ্জন্য ইহার উৎপাদিকা শক্তির অনেকটা হ্রাস হইয়া যায়। সুতরাং সমতল, কুড়ী, ও বিলান ক্ষেত্র হইতে এই ক্ষেত্র অনেকাংশে নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত।

২। ক্রম-নিম্ন।

স্বভাবতঃ উচ্চ ভূমি, কোন নিম্ন ভূমি বা জলাশয়ের সহিত যে স্থানে মিলিত হয়, সেই সন্ধিস্থলের ভূমি ক্রমশঃ অধোভাগে নিম্ন হইয়া থাকে। ঐ ভূমির নাম "ক্রম-নিম্ন।" এদেশের কৃষকেরা ইহাকে আড়গড়ানে, কখন বা সংক্ষেপে কেবল গড়ান কহে।

এই ক্ষেত্রে বর্ষার জল বদ্ধ না হইয়া, ঢালুর দিকে স্রোত বহিয়া যায়। ঐ স্রোতজলে ক্রম-নিম্ন ক্ষেত্রের গাত্র ধৌত হইয়া থাকে। তাহাতে ইহার সমুদয় সারাংশ বিধৌত হইয়া নিম্ন ক্ষেত্রে গিয়া পলিরূপে পতিত হয়। তৎপ্রযুক্ত ক্রম-নিম্ন ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তির ক্রমশঃ বিলক্ষণ হ্রাসের সম্ভাবনা। ফলতঃ এই ক্ষেত্র কূর্ম্মপৃষ্ঠ হইতেও নিকৃষ্ট।

৩। সমতল।

উচ্চ নীচ রহিত প্রশস্ত ভূমিখণ্ডকে "সমতল" ক্ষেত্র কহে। কৃষকেরা ইহাকে সচরাচর "একতালা" বলিয়া থাকে। এই ক্ষেত্রের পৃষ্ঠ-দেশ ঠিক সমান, কোন দিকে ঢালু ও উচ্চ নীচ দৃষ্ট হয় না। সমতল ক্ষেত্রে বৃষ্টিবারি পতিত হইয়া সমভাবে সমস্ত স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, চারি আইল পূর্ণ না হইলে কোন দিকে বহিয়া যায় না। সুতরাং এই ভূমির সারাংশ কদাচ নিক্রান্ত হইতে পায় না।

ইহার কোন এক স্থানে জল সেচন করিয়া দিলে, আপনাপনিই সমুদয় ভূমি সিক্ত হইতে থাকে। কৃষকেরা এই ক্ষেত্রের সমধিক আদর করে। উচ্চ ভূমির মধ্যে সমতল ক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত উর্ব্বরা এবং কৃষিকার্য্যের পক্ষে বিলক্ষণ সুবিধাকর। সমতল ক্ষেত্র কিঞ্চিৎ নিম্ন হইলে তাহাকে "দোপ" বা "ন্যাদা" বলে।

৪। কুড়ী।

চতুর্দ্দিকস্থ উচ্চ ভূমির মধ্যস্থিত গভীর ক্ষেত্রকে কুড়ী বলে। সমস্ত কুড়ী ক্ষেত্র দেখিতে একরূপ নহে। কোন ক্ষেত্র এক ফুট, কোন ক্ষেত্র দুই ফুট, কোন ক্ষেত্র বা ততোধিক ফুট গভীর দৃষ্ট হয়। গভীরতার ন্যূনাধিক্যে উর্ব্বরতা শক্তির তারতম্য হইতে দেখা যায়। বর্ষাকালে বৃষ্টিবারি পতিত হইয়া কুড়ী ক্ষেত্রে বদ্ধ হইয়া থাকে, এবং চতুর্দ্দিকস্থ উচ্চ ভূমির জল আসিয়া এই ক্ষেত্রকে পরিপূর্ণ করে। কুড়ী ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইলে তাহাকে "জোল" বলে। রাঢ়দেশে গ্রাম সীমার অন্তঃস্থিত হইলে, কুড়ী ক্ষেত্রকে "কাইচোল" জোল বলে। গ্রাম-নিঃসারিত সমুদয় জলরাশি কাইচোল জোলে পতিত হইয়া, তাহার উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করে। কুড়ী ক্ষেত্রের গভীরতা এক ফুটের অনধিক হইলে "কোলকুড়ী" অথবা "কোল-দোপ" বলে। শালি ধান্য উৎপাদনের নিমিত্ত কুড়ী ক্ষেত্র বিশেষ প্রসিদ্ধ।

৫। বিলান। (১)

কুড়ী ক্ষেত্র বহু বিস্তীর্ণ হইলে, তাহাকে "বিল" কহে। সামান্য কুড়ী ক্ষেত্র হইতে তাহার গভীরতা অধিক। ঐ বিল দেখিতে পাহাড় শূন্য পুষ্করিণীর ন্যায়, কোথাও বা নদীবৎ দীর্ঘাকার। কোন কোন বিলে বন্যার

১। পূর্ব্বে যে কান্তান্তর প্রদেশের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহা অতিশয় বহ্বায়ত একটি বিলান ক্ষেত্র বিশেষ। বর্ষাকালে তাহার সমুদয় স্থান জলঙ্গী নদীর স্ফীত জলে নিমগ্ন হইয়া যায়। পাঁচ, সাত, দশ, বার, ও স্থানে স্থানে চৌদ্দ পোনের হাত জলের উপর, দীঘে, খলি, পিওয়াজ, কাল বয়রা, হাশরত, প্রভৃতি ধান্য সকল ভাসিতে থাকে। দুই তিন ক্রোশ অন্তরে এক এক খানি গ্রাম "টোপাপানার" মত দেখায়। বর্ষা নিবৃত্ত হইলে, সমুদয় বারিরাশি নদী গর্ভে নিষ্কাশিত হইয়া যায়। তখন ধান্যের মধ্যে বীজ ছিটাইলে প্রচুর পরিমাণে রবিশস্য জন্মে। চলন, বনাজ প্রভৃতি এরূপ বহ্বায়ত বিলান ক্ষেত্র অনেক আছে।

জল প্রবেশ করে না। বর্ষাকালে বৃষ্টি বারিতে তাহার গর্ভ পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। বর্ষা নিবৃত্ত হইলে ক্রমশঃ সমুদয় জল প্রায় শুষ্ক হইয়া যায়। কোন কোন বিলের গভীরতা এক দিকে অগ্রসর হইয়া, নিকটস্থ কোন জলাশয়ের সহিত সম্মিলিত হয়। কোথাও বা বহুবিস্তৃত বিলান ক্ষেত্র, কোন প্রসিদ্ধ নদীর সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে। ঐ নদীর সাহায্যে, বৎসর বৎসর তথায় বন্যার জল আসিয়া প্রবেশ করে। স্রোতোজলে আনীত মৃত্তিকা-রাশি তথায় পলিরূপে পরিণত হয়। পলির মিশ্রণে সমুদয় ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা হইয়া উঠে।

বর্ষান্তে বিলান ক্ষেত্রের সমুদয় জল-রাশি নদীগর্ভে পুনর্ব্বার নিঃসারিত হইয়া যায়। তখন জলপ্লাবিত ক্ষেত্র সকল পরিশুষ্ক হইতে থাকে।

যে বিলের গভীরতা নিতান্ত অল্প, তাহাকে চাতরের বিল বলে। বিল-সীমাবস্থিত চতুর্দ্দিকের ভূমিকে আড়কান্দি" কহে। আড়কান্দি দেখিতে ঠিক ক্রম-নিম্ন ক্ষেত্রের তুল্য। আড়কান্দির নিম্নস্থ সমতল ক্ষেত্রের নাম "চাতাল।" কোন বিলের মধ্যে যদি কূর্ম্ম-পৃষ্ঠ ক্ষেত্র থাকে, তবে তাহাকেও চাতাল বলে। ঐ আড়কান্দি ও চাতাল ভূমির সাধারণ নাম বিলান ক্ষেত্র।

সমুদয় বিলের গভীরতার চরম সীমা প্রায় মধ্যস্থলেই দৃষ্ট হয়। কদাপি কোন বিলেরও বা একপার্শ্বে গভীরতার শেষ হইয়া থাকে। ঐ গভীর স্থানকে "রই" বলে। কোন কোন সুগভীর বিলের রই প্রায় পরিশুষ্ক হয় না। তথায় বার মাস জল প্রাপ্তির সম্ভাবনা। ঐ জলসীমার উভয় তটে অনেক দূর পর্য্যন্ত মৃত্তিকা প্রায় কর্দ্দমময় দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার নাম পঙ্কিল ভূমি। পাঁকি জমিতে বোর ধান্য উৎপন্ন হয়। শুষ্ক পাঁকি জমি জলার্দ্র থাকিলে, তাহাকে "কান্দুনে" বা "কেঁ্যটেল" মাটি বলে। কেঁ্যটেল মাটিতে জলি-ধান্য অতি উত্তমরূপ জন্মে।

কূর্ম্মপৃষ্ঠাদি যে পঞ্চ ক্ষেত্রের বিষয় বর্ণিত হইল, অনেক স্থানে তাহাদের আকার অন্যরূপ দৃষ্ট হয়। কিন্তু যে কোন আকারেরই ক্ষেত্র হউক, বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে, তৎ সমুদয়ই ঐ পঞ্চ ক্ষেত্রের অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া বোধ হইতে পারে।

মৃত্তিকা-ভেদ।

গ্রীষ্মাদি পঞ্চ মণ্ডল, উপত্যকাদি পঞ্চ খণ্ড, এবং কূর্ম্মপৃষ্ঠাদি পঞ্চ ক্ষেত্রের স্থূল মর্ম্ম সংক্ষেপে বিবৃত করা হইল। কিন্তু ঐ সকল ক্ষেত্র মধ্যে আর এক প্রকার ভেদ দৃষ্ট হয়। তাহাকে "মৃত্তিকা ভেদ" বলে। এপর্য্যন্ত মৃত্তিকা-ভেদের কোন উল্লেখ করা হয় নাই। এক্ষণে তদ্বৃত্তান্ত কথনে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

যেরূপ নীল, পীত, লোহিত, তিনটি মূলবর্ণ পরস্পর মিশ্রিত হইয়া নানা-বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে, সেইরূপ মেটেল, পলি, বালি, এই ত্রিবিধ মূল মৃত্তি-কার সংযোগে এবং তৎসঙ্গে ভস্ম, চূর্ণ, উদ্ভিজ্জাবশেষ, ও জীব-দেহাবশেষ প্রভৃতি পদার্থ সকল একত্রে মিশ্রিত হইয়া, নানা জাতীয় মৃত্তিকার উৎপত্তি করিয়াছে। উপত্যকাদি প্রধান পঞ্চ খণ্ডের উচ্চ নিম্ন সকল প্রদেশে ও সকল প্রদেশে ও সকল ক্ষেত্রে, সেই সকলের মধ্যে কোন না কোন জাতীয় মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের নাম ও লক্ষণ ক্রমশঃ প্রদর্শিত হইতেছে।

১। মেটেল।

মেটেল মাটি স্বভাবতঃ অত্যন্ত কঠিন। যত প্রকার মাটি আছে, কেহই মেটেলের তুল্য শক্ত নহে। ইহা এক প্রকার দুর্ভেদ্য পাষাণবৎ মৃত্তিকা। ইহার যোগাকর্ষণ শক্তি অত্যন্ত প্রবল। এই মাটি জলে ভিজিয়া পিচ্ছিল ও ঈষদুষ্ণ ময়ের তুল্য আটা বিশিষ্ট হয়। তজ্জন্য কেহ কেহ ইহাকে এটেলও মাটিও বলে।

ইহা জল সংযোগে শীঘ্র গলিত হয় না, এবং স্রোতের জলেও অধিক কাটিতে পারে না। ইহার পরমাণু সকল বিলক্ষণ সংলিপ্ত। অন্যান্য মৃত্তিকা অপেক্ষা অধিকতর অচ্ছিদ্র বিধায়, মেটেল মাটিতে অধিক পরিমাণে জল শোষণ করে না, এবং সামান্য বৃষ্টিতেও পূর্ণ সিক্ত হয় না। কিন্তু সামান্য জলেই ইহার পৃষ্ঠদেশ কর্দ্দমময় হইয়া উঠে ও অল্প রৌদ্রেই শুখাইয়া যায়। পরিশুষ্ক মেটেল মাটি সহজে খনন করা যায় না।

কোন রাস্তায় মোটেল মাটি থাকিলে বর্ষাকালে তথায় এরূপ কাদা হয় যে, মনুষ্য ও পশ্বাদি জন্তুবর্গের যাতায়াত করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠে। মোটেলের কাদা গায়ে লাগিলে শীঘ্র ছাড়ান যায় না।

এই মাটি কৃষিকার্য্যের বিশেষ উপযোগী। প্রথম লাল করিবার সময় কিছু কষ্ট হয় বটে; কিন্তু একবার কষ্টে সৃষ্টে লাল করিতে পারিলে তখন অল্প চাষেই দ্রব্য আবাদ হইয়া থাকে। ইহাতে যেরূপ ফসল জন্মে, তেমন অন্য কোন মৃত্তিকাতে জন্মে না। মোটেলের বৃক্ষ অতীব তেজস্বী ও ফসল সুন্দর পুষ্ট দানা বিশিষ্ট হয়।

শিষেটান হইতে বিলান ক্ষেত্র পর্য্যন্ত যে কোন ক্ষেত্রের অন্তর্নিবিষ্ট হউক, মোটেল মাটি সর্ব্বত্রেই সমান উর্ব্বরা। পচা বাদলা পাইলে ইহার উৎপাদিকা শক্তির আর ইয়ত্তা থাকে না।

এই মৃত্তিকা রাঢ় দেশে অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। তাহার কোন কোন স্থানে বালি মিশিয়া অতিশয় উর্ব্বরা হইয়া উঠিয়াছে। কোথাও বা কাঁকর মিশাইয়া খারাপ করিয়া ফেলিয়াছে। বর্ণ ভেদে মোটেলের জাতি ভেদ হইয়া থাকে, এবং প্রত্যেক মোটেলের পৃথক পৃথক নাম আছে। নিম্নে তাহা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে।

২। হেড়্‌মো মোটেল।

হেড়্‌মো মোটেল স্বভাবতঃ কৃষ্ণবর্ণ। তাহার পৃষ্ঠ দেশ হইতে নিম্নতল ক্রমশঃ কোরাক্ত। এই মোটেলে অত্যন্ত ফাটল দৃষ্ট হয়। ক্ষেত্র বিশেষে এক ফুট, দুই ফুট মাত্র গভীর স্থান হইতে তলদেশ যতদূর খনন করা যায়, ততদূরই ছোট বড়, শিলাখণ্ডের ন্যায়, মৃৎপিণ্ড সকল বহির্গত হইয়া থাকে। ইহাতে কঙ্কর বা বালুকার অংশ দেখিতে পাওয়া যায় না।

হেড়্‌মো মোটেল পরিশুষ্ক হইলে যেমন হাড়ের তুল্য কঠিন হয়, আবার জলসিক্ত হইলে, তেমনি প্রগাঢ় আটাবিশিষ্ট ও পিচ্ছিলময় হইয়া উঠে। ইহার আর আর সমুদয় লক্ষণ প্রথমোক্ত মোটেলের তুল্য।

হেড়মো মোটেল, ডেঙ্গালিতে অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। বান্‌-চড়ী নিম্ন ক্ষেত্রে ও কোন কোন নদীগর্ভে ইহা অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া

থাকে। নদীয়া জেলার উত্তর কালান্তর ও বনাজ প্রদেশ এই মৃত্তিকার আকর স্থান।

ইহাতে ধান্য, গোধূম, ও অন্যান্য রবিখন্দ অতি উৎকৃষ্টরূপ জন্মে। এই মৃত্তিকা এক বার লাল হইয়া উঠিলে, দোয়ার চাষেই ইহার বার্ষিক আবাদ সুসম্পন্ন হয়। কৃষিকার্য্যে এই মোটেল যথেষ্ট সুবিধাকর। ইহা দেখিতে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ; এই জন্য ইহাকে কখন কখন কাল মোটেলও বলে। কৃষ্ণবর্ণে অধিক তাপ আকৃষ্ট হয় বলিয়া হেড়মো মোটেল এত উর্ব্বরা হইয়াছে।

৩। খোষকা মোটেল।

আকার প্রকারে খোষকা মোটেল. হেড়মো মোটেলের তুল্য। কিন্তু তত্তুল্য গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ নহে। এই মৃত্তিকার বর্ণকে ধূসর বর্ণ বলা যাইতে পারে। ইহার পৃষ্ঠ দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফাটল অতি বিরল। মধ্যে মধ্যে এক একটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ফাটল দৃষ্ট হয়।

ইহার যোগাকর্ষণ শক্তি অত্যন্ত প্রবল; তজ্জন্য অধোর্দ্ধ সকল স্থানেরই মৃত্তিকা সমভাবে সংলিপ্ত। খোষকা মোটেল বিলক্ষণ কঠিন, কর্কশ, ও টাটরা। কিঞ্চিৎ মাত্র রৌদ্র স্পর্শে অত্যন্ত পরিশুষ্ক হইয়া উঠে।

এই মৃত্তিকা উচ্চ মাঠেই অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা প্রায় তৃণ ক্ষেত্ররূপে পতিত থাকে। কিন্তু খোষকা মোটেল উৎপাদিকা শক্তিতে নিতান্ত নিকৃষ্ট নহে। যথোপযুক্ত রূপে জল প্রাপ্ত হইলে যথেষ্ট শস্য প্রসব করিতে সক্ষম হয়। ইহা কৃষিকার্য্যের পক্ষে একান্ত প্রতিকূল নহে।

ইহার আবাদে অধিক চাষ লাগে। অল্প চাসে ইহার কিছুই হয় না।

খোষকা মোটেল ফাকা কৃষ্ণবর্ণ হইলে তাহাকে “ছেয়ে মোটেল” বলে। ছেয়ে মোটেলে ছাইয়ের অংশ আছে বলিয়া বোধ হয়। এই মৃত্তিকা অতিশয় পরিশুষ্ক।

৪। দুধে মোটেল।

ঈষৎ আটা বিশিষ্ট শ্বেতাক্ত মৃত্তিকাকে দুধে মোটেল বলে। অন্যান্য মোটেল মাটি হইতে ইহা অপেক্ষাকৃত কোমল ও সচ্ছিদ্র। ইহার শোষকতা

শক্তি নিতান্ত দুর্ব্বল নহে। অল্প জলেই, ইহার আদ্যোপান্ত পরিসিক্ত হইতে পারে।

দুধে মোটেলের কাটল অতি সামান্য এবং কৃষিকার্য্যের পক্ষে ইহা বিশেষ অনুকূল। দুধে মোটেল উর্ব্বরতা শক্তিতে অদ্বিতীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অন্যান্য মোটেলে, কাঁঠাল, হরিদ্রাদি, অনেক জাতীয় উদ্ভিজ্জ সুচারুরূপ জন্মে না। কিন্তু দুধে মোটেলে, না জন্মে, এমন উদ্ভিজ্জই নাই। এই মৃত্তিকা অল্প চাষেই সুন্দর আবাদ হইয়া উঠে।

৫। চূণে মোটেল।

চূণে মোটেল মাটি অত্যন্ত কঠিন। ইহার নির্দ্দিষ্ট কোন একটা বর্ণ নাই। স্থান বিশেষে শ্বেত, পীত, নীল, লোহিত, ও ধূষর, ইত্যাদি বিবিধ বর্ণ দৃষ্ট হয়। ইহার কোন কোন স্থানের মৃত্তিকা এত শুভ্র যে, জলে গুলিলে প্রায় দুধের ন্যায় দেখায়। আবার লালবর্ণযুক্ত মৃত্তিকাকে সহসা গিরি মাটি বলিয়া ভ্রম জন্মে।

অন্যান্য প্রকার মৃত্তিকা হইতে ইহার আকৃতি প্রকৃতি সম্পূর্ণভাবে পৃথক। ইহা জলে ভিজিলে যেমন পিচ্ছিল ও আটাবিশিষ্ট হয়, শুখাইলে তেমনই কঠিন ও কর্কশ হইয়া উঠে।

ইহার যোগাকর্ষণ শক্তি অত্যন্ত প্রবল। সচরাচর ইহাকে পাথুরে মাটি বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহার অণুসকল অত্যন্ত সংলিপ্ত বলিয়া ইহার শোষকতা শক্তি অতি কম। চূণে মোটেল, একবার পূর্ণসিক্ত হইলে, আর অধিক পরিমাণে জল শোষণ করে না। পরিশুষ্ক চূণে মোটেলের পৃষ্ঠ দেশে অসংখ্য ক্ষুদ্রাকার ও মধ্যে মধ্যে একএকটি বৃহদাকার ফাটল দৃষ্ট হয়।

এই মাটি, সমস্ত রাঢ় দেশে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। তত্রত্য কৃষকেরা ইহাকে চূণে মোটেল না বলিয়া, কেবল মাত্র "মোটেল" কহে। এই মাটি ঘটিংএর জন্মভূমি। ইহাতে রাশি রাশি ঘটিং আবহমান কাল হইতে উৎপন্ন হইয়া আসিতেছে। ঘটিংএর বাহুল্য দৃষ্টে, বোধ হয়, ইহাতে, এক-তৃতীয়াংশ চূণ মিশ্রিত আছে। তজ্জন্য ইহাকে "চূণে মোটেল" শব্দে

নির্দ্দিষ্ট করা হইল। ইহাতে নানা জাতীয় কাঁকরের যোগ যে কত আছে, তাহার সংখ্যা নাই।

চুণে মেটেলের অধোর্দ্ধে সর্ব্বত্রই অসংখ্য ঘটিং ও কাঁকর মিশ্রিত; তথাপিও ইহার উর্ব্বরত্বের নিতান্ত অভাব নাই। কিন্তু ইহাতে প্রতি বৎসর কিয়ৎ পরিমাণে সার দেওয়া আবশ্যক। নতুবা ইহাতে ধান্যাদি উৎকৃষ্ট রূপে জন্মে না। এই মৃত্তিকায় কাঁঠাল, কদলী প্রভৃতি কতক গুলি উদ্ভিজ্জ ভাল সতেজ হয় না। কিন্তু তুত ও শালী ধান্য উৎপাদনের নিমিত্ত ইহা অতীব প্রসিদ্ধ।

ইহার গর্ভ মধ্যে কোন কোন স্থানে পুরাতন চূণের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়।

৬। রাঙ্গামাটী।

বিশুদ্ধ মেটেল মাটি লোহিত বর্ণ হইলে তাহাকে "রাঙ্গামাটি" বলে। রাঢ় দেশের কোন কোন অংশে ও সোনারগাঁ বিক্রমপুর অঞ্চলে এবং হিমালয়ের উপত্যকা অধিত্যকার কোন কোন স্থানে লোহিত বর্ণ মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়। কদাপি কোন নদী গর্ত্তেও ইহা দৃষ্ট হয়।

এই মাটি অনুর্ব্বরা নহে। ইহাতে প্রায় সমস্ত উদ্ভিজ্জই জন্মিয়া থাকে।

ইহাকে লোহিতবর্ণ চুণে মেটেলের রূপান্তর বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু ইহাতে ঘটিং উৎপন্ন হয় না। যে রাঙ্গামাটিতে ঘটিং উৎপন্ন হয়, তাহা চুণে মেটেলেরই অন্তর্গত। আর যাহাতে ঘটিংএর অবস্থিতি নাই, তাহাই রাঙ্গামাটি নামে প্রসিদ্ধ।

রাঙ্গামাটির যোগাকর্ষণ শক্তি যথেষ্ট আছে। কুম্ভকারেরা ইহা দ্বারা হাঁড়ির গায়ে রং করিয়া থাকে। কিন্তু উপত্যকা ও অধিত্যকার মৃত্তিকায় যোগাকর্ষণ শক্তির শৈথিল্য দৃষ্ট হয়, এবং তাহার সহিত প্রচুর পরিমাণে শিলাখণ্ড সকল মিশ্রিত হইয়া আছে।

৭। ঝাঁঝরা মেটেল।

পূর্ব্বোক্ত সকল প্রকার মেটেল মাটিতে কিয়দংশ বালির মিশাল থাকিলে তাহাকে "ঝাঁঝরা মেটেল" বলে।

ঝাঁঝরা মোটেল সর্ব্বত্র একভাবাপন্ন নহে। বালির অংশানুসারে ইহার রূপান্তর হয়, এবং কঠিনতার ও উর্ব্বরতারও তারতম্য হইয়া থাকে।

মোটেল মাটিতে যত প্রকার বর্ণ আছে তৎসমুদয়ই ঝাঁঝরা মোটেলে থাকা সম্ভব। আর বালির বর্ণানুক্রমেও ইহার বর্ণের বিভিন্নতা হয়। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইতে নির্ম্মল শ্বেতবর্ণ পর্য্যন্ত, এবং পীত, লোহিত ইত্যাদি সকল বর্ণেরই ঝাঁঝরা মোটেল দেখিতে পাওয়া যায়। বালির যোগ থাকা-প্রযুক্ত স্বাভাবিক মোটেল অপেক্ষা এই মাটি অধিক উর্ব্বরা হইয়াছে।

৮। পলিমাটি। (১)

ধূসর বর্ণ, সুচিকণ, প্রায় বালুকা সদৃশ, এক জাতীয় মৃত্তিকাকে "পলি-মাটি" বলে।

বালি মহা চিকণ হইলেও, তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশসমুদয় কঠিন ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে, কদাচ সংলিপ্ত হয় না। কিন্তু পলিমাটির আকার সেরূপ নহে। ইহা মোটেল সদৃশ সংলিপ্ত ও অতি সামান্য পরিমাণে আটা বিশিষ্টও বটে।

পলিমাটির যোগাকর্ষণ শক্তি নিতান্ত অল্প। সুতরাং ইহা স্বভাবতঃ কোমল ও সচ্ছিদ্র। ইহার তুল্য সুকোমল মৃত্তিকা আর নাই। পলিমাটি জলস্পর্শমাত্রেই গলিয়া যায়, এবং রৌদ্রে অতিশয় পরিশুষ্ক হইলেও মোটেলের মত কঠিন হয় না।

পলির বিলক্ষণ শোষকতা শক্তি আছে। পতিত বারিবিন্দু পরক্ষণেই ভূগর্ভে অন্তর্হিত হইয়া যায়। ইহা উর্ব্বরতা শক্তিতে কোন অংশেই মোটেল অপেক্ষা হীন নহে। কিন্তু ইহার তৃণসকল শীঘ্র পরিশুষ্ক হয় না বলিয়া, ইহাতে অধিক পরিমাণে চাষ দেওয়ার আবশ্যক করে।

ইহাতে সকল প্রকার উদ্ভিজ্জই জন্মিতে দেখা যায়। বিশেষতঃ এই মাটিতে বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ যেমন সুচারুরূপ জন্মে ও তেজস্বী হয়, তেমন

(১) যে প্রদেশে অত্যধিক পলিমাটির ক্ষেত্র আছে, তথায় প্রাচীন কালের বিলুপ্ত নদীর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে বোধ হয় নদীর স্রোতোজলে আনীত সুকোমল মৃত্তিকা পলিরূপে পরিণত হইয়া ঐ সকল ক্ষেত্রের উৎপত্তি করিয়াছে। নদীর পলি ও প্রাচীন-কালের পলিমাটি দেখিতে ঠিক এক রূপ। কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই।

অন্য কোন মৃত্তিকাতেই সম্ভবে না। আম, কাঁঠাল, খর্জ্জুর, হরিদ্রা, গোল-আলু প্রভৃতির উৎপাদনের নিমিত্ত পলিমাটি অতিশয় প্রসিদ্ধ।

পলিমাটিতে বালির যোগ থাকিলে তাহাকে ঝাঁঝরা পলি বলে। ঝাঁঝরা পলির উৎপাদিকা শক্তি অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট। কিন্তু সকল প্রকার পলির কুড়ী ক্ষেত্র অত্যন্ত উর্ব্বরা। কোন স্থানে শস্য না জন্মিলেও, পলির কুড়ীতে কিছু না কিছু জন্মেই জন্মে।

৯। পান্তা মাটি।

পান্তা মাটির অবয়ব ঠিক পলিমাটিরই তুল্য। বিভিন্নতার মধ্যে পান্তা-মাটির একটি আশ্চর্য্য গুণ আছে এই যে, ইহাতে সূর্য্যকিরণ পতিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া যায়। তাপ-বিয়োজন শক্তি প্রভাবে এই মাটি সর্ব্বদাই সরস থাকে। জলীয় (পানীয়) অংশ সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকাতে, ইহার নাম পান্তামাটি হইয়াছে।

পান্তামাটিতে বালির যোগ থাকিলে তাহাকে "বেলে পান্তা" বলে। বালির যোগ যদি না থাকে, তবে "পলি পান্তা" কহে, এবং কখন কখন "রসপলি" শব্দেও উল্লেখ করা হইয়া থাকে।

এই মাটি অনুর্ব্বরা নহে। ইহাতে নানা জাতীয় উদ্ভিজ্জ সকল জন্মিয়া থাকে। পান্তামাটির বৃক্ষ সকল অতীব তেজস্বী। কিন্তু অধিক বৃষ্টি হইলে, ইহাতে ধান্যাদি ওষধিবাচক উদ্ভিজ্জ সকল উৎকৃষ্ট রূপে জন্মে না। পান্তা-মাটিতে বার মাস হলচালনা করা যাইতে পারে।

১০। বালুকান্তর—বেলে মাটি।

বালুকা, অভ্রের কুচির মত চাকচিক্যশালী এবং অতিশয় পাতলা, কোথায় বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র-দানাবিশিষ্ট। ঐ সকল দানা কাঁচের গুঁড়ার তুল্য কঠিন। ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশসমুদয় পরস্পর বিচ্ছিন্ন, কদাপি সংলিপ্ত হয় না, এবং জলাদি কোন পদার্থের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত করিতে পারা যায় না। বালি যে স্থানে যে কোন মৃত্তিকার সহিত এক যোগে থাকে, সর্ব্বত্রই আপন অবয়ব রক্ষা করিতে সক্ষম। বালিরাশিতে

জলবিন্দু পতিত মাত্রেই, শোষিত হইয়া যায়। বালুকা কণা অত্যন্ত কর্কশ। সুতরাং যোগাকর্ষণ শক্তির অভাবে, অল্পমাত্র জল-স্রোতে এবং বায়ুর আঘাতে পরিশুষ্ক বালি স্থানচ্যুত হইয়া পড়ে। ইহার উৎপাদিকা শক্তি নাই। তবে জল সন্নিকটে ইহার উপর কোন কোন উদ্ভিজ্জ জন্মিতে দেখা যায়।

বালি স্বভাবতঃ তাপাকর্ষক। সুতরাং রৌদ্রস্পর্শে উহা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় উত্তপ্ত হইয়া উঠে। এই বালিরাশি বহু বিস্তীর্ণ হইলে মরুভূমি নাম ধারণ করে, আর অল্লায়ত হইলে বালুচর নামে খ্যাত হয়।

অন্যান্য মৃত্তিকার সহিত অতি অল্প পরিমাণে ইহা মিশ্রিত থাকিলে, তাহাদিগকে অন্যরূপ উপাধি প্রদান করে। (১) এবং ইহার সহিত সামান্য পরিমাণে অন্য কোন মৃত্তিকার যোগ থাকিলে, "বেলে মাটি" শব্দে উক্ত হইয়া থাকে। বেলে মাটিকে সচরাচর "বেলেফুক্রো" বলে।

বেলে মাটির উৎপাদিকা শক্তির নিতান্ত অভাব হয় না। ইহাতে নানা জাতীয় উদ্ভিদ পদার্থের উৎপত্তি সম্ভবে। কিন্তু তথাপিও ইহাকে উর্ব্বরা মাটি বলা যাইতে পারে না।

মন্দা মন্দা বৃষ্টি হইলে, বেলে মাটিতে ধান্য নিতান্ত মন্দ হয় না। কিন্তু অত্যধিক বর্ষা হইলে, ইহার ধান্য প্রায় "থোবরা" পড়িয়া যায়। কারণ প্রবল বৃষ্টিতে বালি মাটির পৃষ্ঠদেশ ধৌত হইয়া সারাংশ সকল স্থানান্তরিত হইয়া যায়। সুতরাং তথাকার ঔষধি-বাচক উদ্ভিজ্জ শ্রেণী একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

বালির কুড়ী উর্ব্বরা ক্ষেত্র মধ্যে পরিগণিত। অতিবৃষ্টিতে তাহার শস্যের কোনরূপ হাঁনি হয় না। জল-স্রোতে চতুর্দ্দিকস্থ উচ্চ ভূমির সার ভাগ আসিয়া ঐ ক্ষেত্রে পতিত হয়। এই জন্য বালির কুড়ী ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তির অবনতি হইতে দেখা যায় না।

পলি মাটির তুল্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম এক প্রকার বালি মাটি আছে, তাহাকে "কাঁক বেলে" বলে। উহা প্রায় পলি মাটির তুল্য উর্ব্বরা।

(১) ঝাঁঝরা, মোটেল, ঝাঁঝরা পলি, ইত্যাদি।

১১। লোণা সেয়ারা।

পূর্ব্বোক্ত মৃত্তিকা সমূহে কিয়ৎপরিমাণে লবণত্বের (যবক্ষার জান) যোগ থাকিলে, তাহাকে "লোণা সেয়ারা মাটি" বলে।

লোণা সেয়ারা মাটি, পাতা মাটির তুল্য সর্ব্বদা সরস থাকে, কদাপি পরিশুষ্ক হইলেও দূর হইতে উহাকে আর্দ্র মত বোধ হয়। ইহার লবণাংশ (যবক্ষারজান) ভূপৃষ্ঠে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ধূলিকণাবৎ বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। তাহার দ্বারায় সোরা প্রস্তুত হয়।

লোণা সেয়ারা মাটি নিতান্ত অনুর্ব্বরা। তাহাতে বীজ অঙ্কুরিত হয় বটে, কিন্তু শস্য ভাল জন্মে না এবং বৃক্ষ সকলও সতেজ হয় না।

এক্ষণে ইয়ুরোপীয় কৃষিবিজ্ঞান মতে অনেক কৃষি-বিদ্ পণ্ডিত ক্ষেত্রে লবণ ও সোরা দেওয়ার ব্যবস্থা করিতেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের কৃষি-ক্ষেত্রে তাহা কিরূপ ফলদায়ক হইবে বলা যায় না। দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ক্ষেত্রে লবণ ও সোরা দিতে দিতে যদি লবণত্বের অংশ বেশী হইয়া যায়, তবে সে সকল ক্ষেত্র যে নিতান্ত অনুর্ব্বরা হইয়া উঠিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

১২। লোণা ফোটা।

লোণা ফোটা মাটি স্বভাবতঃ পলির ন্যায় ধূসর বর্ণ দেখায়। কিন্তু যখন লোণা ফুটিতে আরম্ভ করে, তখন আর সে ভাব থাকে না। সে সময় প্রায় পাঙ্গা লবণের তুল্য শ্বেতবর্ণ হইয়া উঠে, তবে তত্তুল্য দানা বিশিষ্ট হয় না।

লোণা ফাটা মাটিতে অতি সামান্য পরিমাণে যবক্ষার জানের যোগ আছে বটে, কিন্তু ইহা ক্ষারবৎ এক প্রকার বিস্বাদ পদার্থ। পরিশুষ্কাবস্থায় ইহাতে যোগাকর্ষণ শক্তির নিতান্ত অভাব হয় না কিন্তু জলসিক্ত হইলে সে শক্তি অত্যন্ত শিথিল হইয়া যায়।

লোণা ফোটা মাটি নিতান্ত অনুর্ব্বরা। ইহাতে কোন উদ্ভিজ্জই উৎকৃষ্ট-রূপে জন্মে না। বীজ সকল অঙ্কুরিত হইয়া গাছ হইয়া ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হইতে থাকে এবং শস্য প্রসবের পূর্ব্বেই সমুদয় মরিয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, লোণা ফোটা মাটির সন্নিকটে যে কোন মৃত্তিকাই থাকুক, তাহা

স্বভাবতঃ অত্যন্ত উর্ব্বরা হয়। এই জন্য এদেশীয় কৃষকেরা বলে "সোণার কোলে সোণা"।

ইহাতে অধিক পরিমাণে চূণ প্রদান করিলে, লোণা ফোটা সারিয়া যায় ও মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত উর্ব্বরা হইয়া উঠে। কিন্তু মনুষ্য মহাব্যাধিগ্রস্ত হইলে যেমন তাহাকে কেহ স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করে না, সেইরূপ লোণা ফোটাকে "মৃত্তিকার কুষ্ঠ" বলিয়া কৃষকেরা তথায় হলচালনা করিতে অগ্রসর হয় না। বাস্তবিক ইহা মাটির কুষ্ঠই বটে। কৃষিকার্য্যের পক্ষে ইহার তুল্য অপকারী মৃত্তিকা আর দেখা যায় না। উৎপাদিকা শক্তিতে মরুভূমির সহিত ইহার তুলনা করা যাইতে পারে।

১৩। দো-আঁশ মাটি।

যত জাতির মৃত্তিকার নামোল্লেখ করা হইল, ঐ সমস্ত পরস্পর মিশ্রিত হইয়া নানারূপ মিশ্র মৃত্তিকার উৎপত্তি করে। কৃষকেরা তাহাকে "দো-আঁশ" (বা দো-আঁশলা) মাটি বলে।

কোন উদ্ভিজ্জের শেষ, ভস্ম, চূর্ণ, প্রভৃতি বিবিধ পদার্থের সংযোগেও ইহার উৎপত্তি হয়। দেশ ভেদে, পদার্থ ভেদে, এই মৃত্তিকার আকৃতি প্রকৃতির বিস্তর বিভিন্নতা ঘটে, এবং শ্বেত, কৃষ্ণ, পীত, লোহিত, ইত্যাদি বিবিধবর্ণ ভেদও সম্ভবে।

দো-আঁশ মাটি স্বভাবতঃ কোমল এবং অত্যন্ত উর্ব্বরা। ইহাতে নানা-জাতীয় বৃক্ষ, লতা, এবং ধান্য, শন্দ, নীল, তুত, আলু, হরিদ্রা ইত্যাদি বিবিধ শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা কৃষি কার্য্যের পক্ষে বিলক্ষণ সুবিধাকর।

১৪। ভিটা মাটি।

ভিটা মাটি কোন এক জাতীয় বিশুদ্ধ মৃত্তিকা নহে। ইহা প্রান্তরে, নদী-তীরে, ও বৃহৎ বৃহৎ অরণ্য মধ্যে স্বভাবতঃ উৎপন্ন হয় না। যে স্থানে গ্রাম বা নগর সংস্থাপিত হয়, সেই স্থানেই ভিটা ভূমির উৎপত্তি হইয়া থাকে।

মনুষ্যের ব্যবহৃত বিবিধ পদার্থ, পোয়াল, খড়, ভুষি, বিবিধ জাতীয় তৃণ, লতা, বৃক্ষপত্র, এবং তুষ, মাটি, ছাই, গোবর, খিচ, ওচলা, গৃহভগ্নাব-

শেষ, ইত্যাদি দ্রব্য সকল, একত্রিত হইয়া ক্রমশঃ গ্রামসীমা উচ্চ হইতে থাকে। ঐ গ্রাম-সীমার মধ্যস্থিত গৃহস্থের ত্যজ্য বাস্তু ভূমিকে "ভিটাভূমি" কহে।

ইহা মিশ্র মৃত্তিকা বটে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দো-আঁশ মাটির সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য নাই। ইহা অতি সুকোমল, সচ্ছিদ্র, বারি-শোষক, এবং তাপাকর্ষক। ইহার যোগাকর্ষণ শক্তি অতি সামান্য, সুতরাং জলসিক্ত হইলে ইহা অধিক আটাবিশিষ্ট হয় না।

এই মৃত্তিকা অতিশয় উর্ব্বরা। ইহাতে নানা জাতীয় বৃক্ষ, লতা অতি সুচারুরূপ জন্মে, এবং শাক, সবজি সকল প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। বিশেষতঃ তামাক ও সরিসা যেমন ইহাতে উৎকৃষ্টরূপ জন্মে, তেমন আর অন্য কুত্রাপি সম্ভবে না। কিন্তু ভিটা মাটিতে ধান্য ভাল হয় না, প্রায় পুড়িয়া যায়।

উপরে যে কয়েক জাতীয় মৃত্তিকার উল্লেখ করিয়া মৃত্তিকাভেদ প্রকরণের উপসংহার করা যাইতেছে, তাহাতে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, মৃত্তিকাভেদ অধ্যায়টী নিতান্ত অসম্পূর্ণ থাকিয়া গেল। দেশ বা প্রদেশ বিশেষে কত জাতীয় মৃত্তিকা আছে, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। বিশেষতঃ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে, তাহার আমূল বৃত্তান্ত বিবৃত করা বড়ই সুকঠিন ব্যাপার। যাহা হউক, মৃত্তিকার স্থূল স্থূল বিবরণ কতক অবগত থাকিলেই যে কৃষিকার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারা যায়, তাহার সন্দেহ নাই।

হিমালয়ের উপত্যকা, অধিত্যকা, এবং শৈলতলে যেরূপ মৃত্তিকা দেখা গিয়াছে, তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত মৃত্তিকা সকলের কোন সৌসাদৃশ্য নাই। উপত্যকা ও অধিত্যকায়, পীত, লোহিত, পাটল, কৃষ্ণ ইত্যাদি বিবিধ বর্ণের মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা প্রাচীন কালের অগ্নিদগ্ধ মৃত্তিকা বলিয়া বোধ হয় (১)।

---

(১) হিমালয় অতি প্রাচীন কালের আগ্নেয় গিরি। শত শত আগ্নেয় গিরির একত্র সমাবেশে হিমালয়ের উৎপত্তি। ভারত যখন অনন্ত সৃষ্টির অনন্ত গর্ভে লুক্কায়িত ছিল, তখন অগ্নির সাহায্য লইয়া সমুদ্রগর্ভ হইতে গিরিরাজ মস্তকোত্তোলন করিয়াছিলেন।" ভূত ভারতের উত্তর প্রদেশে সেই সময় কি ভয়ানক অগ্নিকাণ্ডই ঘটিয়াছিল, তাহা ভাবিতে গেলে, আত্মা পুরুষ বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইয়া যায়! বহু যুগযুগান্তর গত হইল, সেই

ঐ সকল মাটি অনেকাংশে ম্যোটেলের সদৃশ। কিন্তু তাহাদের যোগাকর্ষণ শক্তি অতি সামান্য। বস্তুতঃ দগ্ধ মৃত্তিকায় যোগাকর্ষণ শক্তির অভাব হইয়া থাকে। বহু প্রাচীন কালের শুর্কি পুনর্ব্বার মৃত্তিকা হইয়া গেলে যেমন হয়, উপত্যকা অধিত্যকায় মৃত্তিকা প্রায় সেইরূপ। তাহার সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড ও প্রস্তর কুচি প্রচুর পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। কোন কোন স্থানে বালিরও সংযোগ আছে। কিন্তু তাহাতে মৃত্তিকার উর্ব্বরত্বের হানি হয় নাই।

শৈলতলের মৃত্তিকা প্রাচীন কালের ভস্ম এবং বালুকা সংযোগে উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ইহাকে এক প্রকার ছেয়ে মাটি বলিলে বলা যাইতে পারে। ইহার যোগাকর্ষণ শক্তি নাই বলিলেও অন্যায় হয় না। কিন্তু পার্ব্বত্য মৃত্তিকা স্রোতোজলে চালিত হইয়া ক্রমে ক্রমে শৈলতলে পতিত হইয়াছে। এজন্য তাহার অনেক স্থানের মৃত্তিকা প্রায় উপত্যকা অধিত্যকার ন্যায়। কিন্তু তাহাতেও যথেষ্ট পরিমাণে সূক্ষ্ম বালির মিশাল দেখিতে পাওয়া যায়। শৈলতলের মৃত্তিকা ঘরের দেওয়াল ও ইষ্টক নির্ম্মাণোপযোগী নহে। কিন্তু উৎপাদিকা শক্তিতে উহা অদ্বিতীয়।

অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার চিহ্ন সকল, অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এই সঙ্কীর্ণ স্থলে কেবলমাত্র তাহার উল্লেখ ভিন্ন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিবরণ লিখিবার উপায় নাই। হিমালয়ের যে কোন অংশে দণ্ডায়মান হইয়া দেখা যায়, উহার শৃঙ্গ সকল চতুর্দ্দিকে ধুস্তুর পুষ্পের ন্যায় গোলাকার এবং তাহার মধ্যস্থলে গভীর গহ্বর। ঐ গহ্বরে বর্ষার জল বদ্ধ হইয়া শৃঙ্গের এক দিক ভগ্ন করিয়াছে। শৃঙ্গ দেশে যে সকল প্রস্রবণের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহারা ঐ ভগ্নাংশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। শৃঙ্গোপশৃঙ্গের মৃত্তিকারাশি দেখিতে ঠিক প্রাচীন কালীয় অগ্নিদগ্ধ মৃত্তিকার ন্যায়। প্রত্যেক শৃঙ্গে ধাতু নিঃস্রব স্তর সকল, গহ্বরের দিকে উর্দ্ধমুখ হইয়া রহিয়াছে। অগ্নি উদ্গিরণ কালে, বায়ু অথবা জল সংযোগে, ভস্ম ও বালুকা সকল দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া, শৈল তলের উৎপত্তি করিয়াছে। এই জন্য মোরং, তরাই, ও ডুয়ারের মৃত্তিকা, বালুকা মিশ্রিত প্রাচীন কালের ভস্মাবশিষ্ট মৃত্তিকা বলিয়া বোধ হয়। এস্থলে যদি বিন্ধ্য গিরিকে হিমালয়ের জ্যেষ্ঠ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয়, তাহা হইলেও বিন্ধ্যের উত্তরে সমুদ্র ছিল প্রমাণ হয়। হিমালয়ের উৎপত্তির পর হিমালয়স্থ গলিত মৃত্তিকা-দ্বারা ঐ সমুদ্রগর্ভ পূর্ণ হইয়া মধ্যদেশের উৎপত্তি করিয়াছে। হিমালয়ের অধিবাসীরা মধ্যদেশের অপভ্রংশে "মদেশ" বলিয়া থাকে।

সার (১)।

গবাদি পশুবর্গের মল মূত্র বিকৃত মৃত্তিকাবৎ হইলে, তাহাকে "সার" বলে। সার নানাবিধ, তন্মধ্যে অত্রস্থলে কয়েক জাতীয়মাত্র সারের উল্লেখ করা যাইতেছে।

১। উদ্ভিদ্। লতা, বৃক্ষপত্র, পোয়াল, খড়, ভুষি, নানা জাতীয় ঘাষ ও শৈবাল, ইত্যাদি পূত হইয়া, এক প্রকার সারের উৎপত্তি হয়। এই সার অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত।

২। খৈল। ইহা অতি উৎকৃষ্ট সার। ধান্য, খন্দ, পান, আলু, কপি, পাট, ইক্ষু, তামাক, আম্র, কাঁঠাল, ইত্যাদি সকল প্রকার উদ্ভিদের বিশেষ উপকারী। খৈল যে কোন মৃত্তিকায় প্রদান করা যায়, তাহারই উৎপাদিকা শক্তি অতিশয় বৃদ্ধি হয়।

এ দেশের পানের বরজে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে খৈল প্রদান করিতে দেখা যায়। শালী ধান্যের জমিতে জল বদ্ধ হইলে, অনেক কৃষক খৈলের গুড়া ছিটাইয়া দেয়। তিল, মসিনা হইতে সরিষা ও রেড়ীর খৈলই বিশেষ প্রশস্ত।

৩। মল মূত্র। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, ইত্যাদি সকল জাতীয় প্রাণীবর্গের মল মূত্র হইতে সার প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু এ দেশের কৃষকেরা মনুষ্য বিষ্ঠা ও শূকর বিষ্ঠাকে অতিশয় অপবিত্র বলিয়া জ্ঞান করে। তদ্দারায় সার প্রস্তুত দূরে থাকুক, দৈবাৎ স্পর্শ হইলে যে পর্য্যন্ত স্নান না হয়, সে পর্য্যন্ত আপনাকে অত্যন্ত অশুচি বিবেচনা করে।

ঐ উভয়বিধ সার ব্যবহার করিতে হিন্দু বা মুসলমান সম্প্রদায়ের কোন কৃষক কখন যে প্রবৃত্ত হইবে, এরূপ প্রত্যাশা করা যায় না (২)। তবে

---

(১) ভারতের ভূমি উর্ব্বরা বলিয়া কৃষকেরা সারের প্রতি তাদৃশ যত্ন করে না। কিন্তু অতি প্রাচীন গ্রন্থ কৃষি-পরাশরে সারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থে যেরূপ নিয়মে সার দেওয়ার কথা লিখিত আছে, তাহা আধুনিক বিজ্ঞানের অনুমোদিত।

(২) অনেকের বিশ্বাস যে, মনুষ্য ও শূকর বিষ্ঠা এ দেশের কৃষকেরা ব্যবহার না করায়, উহা অযত্নে নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু উহা কদাচই নষ্ট হয় না। ঐ সকল বিষ্ঠা ভারতের যদৃচ্ছাতথা পতিত হইয়া ভূশক্তির সমতা রক্ষা করে। বরং এক জন কৃষক কুড়াইয়া জড় না

প্রত্যেক জেলখানায় মনুষ্য-বিষ্ঠাদ্বারা সার প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহাতে কপি ও নানাবিধ শাক সবজি অতি উৎকৃষ্ট রূপ জন্মে।

গোরুর গোবর ও চোনা বিকৃত হইয়া যে সার প্রস্তুত হয়, প্রাচীন কাল হইতে ভারতের সর্ব্বত্র তাহা উৎকৃষ্ট সার বলিয়া কৃষি ক্ষেত্রে ব্যবহার হইয়া আসিতেছে।

এক্ষণে রসায়নবিদ্ পণ্ডিতেরা নিরূপণ করিয়াছেন যে, ঘোড়া, ভেড়া, ও ছাগলাদির মল হইতে গোবরের সার অনেকাংশে নিকৃষ্ট। কিন্তু আমরা কৃষি ক্ষেত্রে ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, গোবরের সার-সংযোগে এমন মৃত্তিকা নাই যাহার উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায় না, এমন উদ্ভিজ্জ নাই (একমাত্র কাঁটাল ভিন্ন) যাহা তেজস্বী হইয়া উঠে না। তবে কি জন্য গোবর-পচা সার নিকৃষ্ট শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়াছে, তাহা রসায়নবিদ্ পণ্ডিতেরাই বলিতে পারেন; যাহারা স্বহস্তে কৃষি কার্য্য করে, তাহাদের তাহা বোধগম্য নহে, এবং পরীক্ষা-সিদ্ধও নহে।

যে সকল প্রাণী অন্যান্য জীব-দেহ ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে, তাহারা নিরামিষ-ভোজী প্রাণী হইতে অধিক শক্তি ধরে এবং তাহাদের মলোদ্ভূত সার অতীব তেজস্বী তাহার সন্দেহ নাই।

এদেশের কৃষকেরা এবিষয় নিতান্ত অপরিজ্ঞাত নহে। কোন কোন কৃষক ইক্ষুক্ষেত্রে চর্ম্মচটীকার নাদি প্রদান করিয়া থাকে। চর্ম্মচটিকা মাংসাশী জীব, উহার মল জীব-দেহাবশের ভিন্ন অন্য কিছু নহে। দেখা গিয়াছে, যে ক্ষেত্রে চর্ম্মচটিকার নাদি প্রদত্ত হয়, সে ক্ষেত্রের উদ্ভিদ্ সকল অতীব তেজস্বী হইয়া উঠে। কিন্তু ইহা নিতান্ত অল্প পরিমাণে দেওয়া কর্ত্তব্য। অধিক মাত্রায় দিলে ইক্ষু জলিয়া যায়।

পক্ষী জাতির মধ্যে কতকগুলি পক্ষী বৃক্ষাদির ফল ও কীট পতঙ্গ ভক্ষণ করিয়া থাকে। অপর কতক গুলি পক্ষী, মৎস্য, মাংস আহার

করায় উহার সত্ত্ব প্রত্যেক কৃষকে সমান অংশে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ সার কৃষকেরা স্বহস্তে ব্যবহার না করিলেই যে উহা দ্বারা ভারতীয় কৃষি কার্য্যের উপকার হইতেছে না, এমন নহে।"

করিয়া জীবন ধারণ করে। সুতরাং উভয়বিধ পক্ষীরই মল হইতে অতি উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত হইতে পারে।

ভারতবর্ষে পক্ষীমলের দ্বারা সার প্রস্তুত করিবার প্রথা প্রচলিত নাই। কিন্তু ইয়ুরোপীয় কৃষকেরা সামুদ্রিক পক্ষী বিশেষের (গুয়েনা) মল হইতে বিস্তর সার সংগ্রহ করিয়া কৃষিক্ষেত্রে প্রদান করিয়া থাকে।

৪। অস্থি ও মাংস (১)। অস্থি ও মাংস হইতে অতি উৎকৃষ্ট সার জন্মে। কিন্তু মাংস দ্বারা সার প্রস্তুত করিবার প্রথা কোন স্থানেই প্রচলিত নাই। তবে এ দেশের কোন কোন কৃষক ক্ষেত্রে "পলুর চরকি" প্রদান করিয়া থাকে। কেহ বা, নিচু ও কঁটাল গাছের গোড়ায়, মৃত কুকুর, পাঁঠার ভুড়ি, ও পুটি মৎস্য প্রদান করে। তাহাতে গাছ সকল অত্যন্ত তেজস্বী হইয়া উঠে।

এক্ষণে এদেশে অস্থিচূর্ণের ব্যবহার অল্প পরিমাণে আরম্ভ হইয়াছে। অস্থিচূর্ণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট সার। কোন কৃষি-বিদ্ পণ্ডিত লিখিয়াছেন, অস্থিচূর্ণ মেটেল মাটির পক্ষে বিশেষ উপকারী। কিন্তু দেখা গিয়াছে, উহা যে কোন মৃত্তিকায় ও উদ্ভিদ্ পদার্থে প্রদান করা যায়, তাহাই বলশালী হইয়া উঠে।

৫। ভস্ম। ইহা সচরাচর গোবর-পচা সারের সহিত ব্যবহার হইয়া থাকে। কিন্তু মেটেল মাটীতে পৃথকরূপে ভস্ম প্রদান করিলে যথেষ্ট উপকার দর্শে।

তামাক, মানকচু, ওল, এবং শশা, কুমড়া, লাউ ইত্যাদি অনেক গাছপালায় ভস্ম দিতে দেখা যায়। ঐ সকল গাছের পক্ষে ভস্ম বিশেষ উপকারী।

কোন গাছের পাতায় কীট বা পিপীলিকা লাগিলে, ভস্মের গুড়া ছড়াইয়া দিতে হয়। তাহাতে কীটাদি পলায়ন করে। কীটাদি ছাড়ানর নিমিত্ত

---

(১) অস্থি সম্বন্ধে অনেক বিবেচনা করেন, এ দেশের অস্থিসকল নিরর্থক মাটি হইয়া যায়। মাটি হয় সত্য বটে, কিন্তু নিরর্থক যায় না। অস্থিসকল আবহমান কাল হইতে ক্রমশঃ যেমন পতিত হইয়া আসিতেছে, তেমনই পর্য্যায়ক্রমে ক্রমশঃ মাটি হইয়া সমষ্টিভাবে ভারতের ভূশক্তির সমতা রক্ষা করিতেছে। এই পর্য্যায়টি যেরূপ চলিতেছে, তাহাতে ব্যক্তিভাবে না হউক, সমষ্টিভাবে সকল কৃষকেই যে উহার উপস্বত্বভোগী, তাহার সন্দেহ নাই। এ পর্য্যায় ভঙ্গ না করাই উত্তম কল্প বোধ হয়।

হরিদ্রার গুড়াও ব্যবহার করা যাইতে পারে। এবং হুকার জল দেওয়াও মন্দ ব্যবস্থা নহে।

৬। বোদ মাটী। ভূগর্ভে উদ্ভিজ্জাবশেষ এক স্তর মৃত্তিকা আছে, তাহাকে "বোদ মাটি" বলে। বোদ মাটী সার রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ইহা আম্র, কাঁটাল, নারিকেল প্রভৃতি যাবতীয় বৃক্ষে বিশেষ উপকারী। কিন্তু ইহাতে উই লাগিয়া থাকে। সে পক্ষে কৃষককে একটু সতর্ক হওয়া উচিত।

পুষ্করিণী ও কূপ খননের সময় ভিন্ন বোদ মাটি সচরাচর পাওয়া যায় না।

৭। পলিমাটি। স্রোতোজলে আনীত মৃত্তিকাকে "পলিমাটি" বা "পলল" শব্দে কহে। নদী-গর্ভে এবং বন্যাজল-প্লাবিত তীর-ভূমিতে ও বিল খালে ইহা অধিক পরিমাণে পতিত হয়। কৃষকেরা পলিমাটীর দ্বারা আলু, কপি, তামাক, ও নানাবিধ শাক সবজি প্রস্তুত করিয়া থাকে।

উৎপাদিকা শক্তিতে পলিমাটি অন্যান্য প্রকার সার হইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। ভারতের উভমাতৃক প্রদেশ সকলে পলি পড়িয়া ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করে। তত্রত্য কৃষকেরা অতি অল্প আয়াসে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন করিতে সক্ষম হয়।

নদীর পলি-বালি ও পলি দুই ভাগে বিভক্ত। উভয় পদার্থ একযোগে ক্ষেত্রে গেলে কোন অনিষ্ট হয় না। কিন্তু কোন ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে বালি চাপিয়া গেলে, সে ক্ষেত্র অনুর্ব্বরা হইয়া উঠে। তবে যেঁটেল মাটিতে অত্যল্প বালির যোগ থাকিলে, তাহা সারের ন্যায় কার্য্য করে। বালুকার সূক্ষ্মাংশ আকর্ষণ করিয়া, উদ্ভিদ্ সকল সতেজে বাড়িয়া উঠে। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন কচকচে বালুকাময় ক্ষেত্রে কিছুই জন্মে না।

৮। ভরাট মাটী। পল্লিগ্রামের মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডোবা দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রামের বাস্তু, উদ্বাস্তু, খোয়াড়, সারকুড়, এবং রাস্তা প্রভৃতির ময়লা মাটী, বৃষ্টিজলে ধৌত হইয়া, ঐ সকল ডোবায় গিয়া পতিত হয়। সুতরাং গর্ত্তগুলি বৎসর বৎসর কতকটা ভরাট হইয়া উঠে। ঐ ভরাট মাটি উৎকৃষ্ট সার বলিয়া পরিগণিত।

শীত-সমাগমে গর্ত্তের জল শুখাইয়া গেলে, এদেশের কৃষকেরা ঐ মাটী তুলিয়া এক স্থানে জমা করিয়া রাখে। কিঞ্চিৎ পরিশুষ্ক হইলে, তাহা লইয়া গিয়া ক্ষেত্রে প্রদান করিয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কাঁচা মাটি অপেক্ষা পরিশুষ্ক মৃত্তিকার ঢোলাই খরচ কিছু কম পড়ে।

ভরাট মাটিতে ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি হয়। ইহাও গোবর-সারের ন্যায় সকল মৃত্তিকারই উপযোগী। বিশেষতঃ ইহা কাঁটাল ও নারিকেল প্রভৃতি সকল গাছের গোড়ায় দেওয়া যাইতে পারে, এবং ইক্ষু-ক্ষেত্রের অত্যন্ত উপকার করে।

পুষ্করিণী এবং অন্যান্য জলাশয়ের ভরাট মাটি বা পচাপাঁক (কর্দ্দম) মন্দ সার নহে। ইহাতেও সকল উদ্ভিদেরই পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে।

৯। পোড়া মাটি। পোড়া মাটি মন্দ সার নহে। মৃত্তিকা অগ্নিদগ্ধ হইলে, তাহার উৎপাদিকা শক্তি অতিশয় প্রকাশিত হয়। সুতরাং নিতান্ত অনুর্ব্বরা ক্ষেত্রের মাটি কোন উপায়ে পোড়াইয়া দিতে পারিলে, তাহা যথেষ্ট উর্ব্বরা হইয়া উঠে। ইষ্টক-নির্ম্মিত পুরাতন অট্টালিকা ও প্রাচীরের উপর কোন বৃক্ষাদি জন্মাইলে কিরূপ সতেজ বৃদ্ধি হয়, তাহা সকলেই দৃষ্টি করিয়াছেন।

এদেশে নেবু, পেয়ারা প্রভৃতি গাছের গোড়ায় "আকার বুকো" দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। বাঁশের ঝাড় ও খড়ের জমির তেজ বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত, প্রতি বৎসর অগ্নি সংযোগে পোড়াইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু দগ্ধ মৃত্তিকার সূক্ষ্ম চূর্ণ ব্যতীত সারের কার্য্য হইতে পারে না। ইষ্টকের ন্যায় যোগাকর্ষণ শক্তি প্রবল থাকিলে, তাহাতে কোন উপকারই দর্শে না।

১০। চূর্ণ। চূণ সারের মধ্যে পরিগণিত বটে। কিন্তু অন্যান্য সার যেরূপে ব্যবহার করা যায়, ইহা সে আকারে ব্যবহৃত হইতে পারে না।

আগাছ বিনষ্ট করিবার জন্য, ক্ষেত্রে চূর্ণ প্রদত্ত হইয়া থাকে; এবং "নোণা ফোটা" মাটীতে চূর্ণ দিলে, নোণা ফোটা ভালো হইয়া যায়। কিন্তু ক্ষেত্রে কোন শস্য বর্ত্তমান থাকিতে, চূর্ণ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। উহার ঝাঁজে সমুদয় শস্য নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

১১। লবণ ও সোরা। (১) এই দুই পদার্থ অন্যান্য সারের সহিত যোগ করিয়া ক্ষেত্রে দিতে হয়। আধুনিক রসায়ন মতে গমের জমিতে সোরা ও তামাকের জমিতে লবণ দিলে যথেষ্ট উপকার দর্শে। কিন্তু লবণ ও সোরা কৃষি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ ভারতের প্রকৃতি অনুসারে উহার ভবিষ্যৎ ফল বড়ই অনিষ্টকর। বিশেষতঃ যে ভারতবর্ষের পরিমাণ-ফল তিনশত সাইত্রিশ কোটী বিরেনব্বই লক্ষ বিঘা ভূমি, সে দেশের কৃষি ক্ষেত্রে লবণ, সোরা, ও অস্থিচূর্ণ দেওয়াও বড় সহজ কথা নহে।

উপরে যে কয়েক জাতীয় সারের উল্লেখ করা হইল, তাহার মধ্যে পলি মাটি, ভরাট মাটি, ও বোদমাটী আপনাপনিই প্রস্তুত হইয়া থাকে। উহার জন্য কৃষককে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয় না। কৃষি ক্ষেত্রের নিমিত্ত অপ-রাপর সার সকল পৃথক পৃথক প্রস্তুত করিবার আবশ্যক নাই, একত্রেই সমস্ত সমাধা হইতে পারে। কিন্তু অস্থি সকল স্বতন্ত্র রূপে চূর্ণ না করিলে, সার তৈয়ারি হয় না। এবং খৈলের গুড়া কোন কোন সময়ে পৃথক রূপে দেও-য়ার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

সার প্রস্তুতের প্রক্রিয়া অতি সহজ। গো-শালার অনতিদূরে একটী অল্প গভীর গর্ত্ত খনন করিয়া তন্মধ্যে গোবর, চোনা, খিচ, ওচলা, ভস্ম, ভুষি পোয়াল কুচি, কালচুনা খড়, বৃক্ষপত্র, গবাদি পশুর আহারাবশিষ্ট তৃণ, জাব, ইত্যাদি বিবিধ পদার্থ একত্রে সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হয়। ঐ সমস্ত পদার্থ বর্ষার জল-সংযোগে ক্রমশঃ বিকৃত মৃত্তিকাবৎ হইলেই সার প্রস্তুত হয়। উহার সহিত অশ্ব-বিষ্ঠা, ছাগল ও ভেড়ার নাদী, চর্ম্মচটিকার নাদী, পক্ষিমল, খৈল, পুটীমাছ, পলুর চরকি, ইত্যাদি বস্তু সকল যোগ করিয়া দিলে, সার উৎকৃষ্ট হইতে পারে।

---

(১) এদেশের যে মাটিতে অধিক পরিমাণে "যবক্ষারজান" মিশ্রিত থাকে, তাহাকে 'লোণা সোয়ারা" মাটি বলে। দেখা গিয়াছে, লোণা সোয়ারা মাটিতে ধান্যখন্দ, হরিদ্রা, ইক্ষু প্রভৃতি কোন শস্যই উৎকৃষ্টরূপ জন্মে না। অধিক কাল ব্যাপিয়া ক্ষেত্রে লবণ সোরা দিলে, যদি লবণত্বের পরিমাণ বেশী হইয়া যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে ক্ষেত্র অনুর্ব্বরা হইয়া উঠিবে, তাহার সন্দেহ নাই। একথা মৃত্তিকা-তত্ত্ব প্রকরণে বলা হইয়াছে।

রাঢ়দেশে প্রত্যেক কৃষকের বাটীর নিকটে এক একটী সার-গর্ত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় বিবিধ পদার্থ সংযোগে সম্বৎসরে যে সার প্রস্তুত হইয়া থাকে, ফাল্গুন চৈত্র মাসে তাহা উঠাইয়া ক্ষেত্রে প্রদত্ত হয়। কৃষকদিগের পক্ষে মাঘ হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত ক্ষেত্রে সার দেওয়ার প্রশস্ত সময় বলিতে হইবে।

তক্তা অথবা টীনের চাদরের দ্বারা সার-গর্ত্তের উপরে সর্ব্বদা আবরণ দিয়া রাখা কর্ত্তব্য। নতুবা সারের পূতিগন্ধময় বাষ্প উঠিয়া গ্রাম্য বায়ু দূষিত হইতে পারে। এবং সারের সহিত এলবুমেন, অঙ্গার অম্ল, ফস্ফরিক অম্ল, অম্লজান, উদজান, যবক্ষার জান, ম্যাগ্নেশিয়া, অ্যামোনিয়া, ও পটাসাদি বহুবিধ উদ্ভিদ-পোষক পদার্থ সকলের সংযোগ আছে; সারগর্ত্ত সর্ব্বদা অনাবৃত থাকিলে, ঐ সকল বায়বীয় পদার্থ উড়িয়া গিয়া, সারের গুণের অনেকটা হানি হওয়া সম্ভব।

পূর্ব্বোক্ত কারণ বশতই কৃষিপরাশরে সার পুতিয়া রাখিবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সার-গর্ত্ত মাটী দিয়া ঢাকিয়া রাখিলে, দৈনিক সার সংগ্রহের ব্যাঘাত ঘটে। তক্তা বা টীনের চাদর দেওয়া থাকিলে, উহার এক দিক উঠাইয়া দৈনিক-সার গর্ত্তের ভিতরে রাখা যাইতে পারে। তাহাতে কোন রূপ অসুবিধা হয় না।

সুবর্ণজারা যেরূপ মানব-দেহের উপকারী ও পুষ্টিকর, বৃক্ষাদির পক্ষে সার অবিকল সেইরূপ। এবং প্রতিবৎসর শস্যোৎপাদনের নিমিত্ত ভূমির যে শক্তি হানি হয়, সারে সেই শক্তির পূরণ করিয়া থাকে। অতএব কৃষি-ক্ষেত্রে প্রতি বৎসর কিয়ৎ পরিমাণে সার প্রদান করা কৃষকের একান্ত কর্ত্তব্য। নতুবা ক্ষেত্র সকলের উৎপাদিকা শক্তি নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া যায়।

যে সকল বিলান ক্ষেত্রে ও চর ভূমিতে সম্বৎসর বন্যার অথবা বর্ষার জল সহকারে পলি পড়িয়া থাকে, ঐ সকল ক্ষেত্রে সার দিবার আবশ্যক করে না।

উচিত পতিত নিয়মে যে সকল ভূমি আবাদ করা হয়, তাহাতে সার দেওয়া উত্তম কল্প বটে। কিন্তু না দিলেও এক রকম চলিতে পারে।

ক্রমান্বয়ে তিন সন উঠিত থাকিয়া ভূমির যেমন উৎপাদিকা শক্তির কতকটা অভাব হয়, আবার উপর্য্যুপরি তিন সন পতিত থাকিলেই সে অভাব পূরণ হইয়া যায়। ভূমি পতিত থাকিলে কি আকারে উৎপাদিকা শক্তির অভাব পূরণ হয়, সারের গুণ প্রকরণে তাহা বিস্তারিত রূপে লিখিত হইবে।

বিলান ভিন্ন অন্য ক্ষেত্র চতুষ্টয় চির দিনের জন্য উঠিত রাখিতে হইলে, তাহাতে বৎসরান্তে কিয়ৎ পরিমাণে সার প্রদান করা একান্ত আবশ্যক। চিরোঠিত ক্ষেত্রে সার প্রদান না করিলে, ক্রমশঃ উৎপাদিকা শক্তির অভাব হইয়া কিছু দিন পরে সমুচিত শস্য লাভে কৃষককে বঞ্চিত হইতে হয়।

কৃষিক্ষেত্রে সার দিয়া আবাদ করিতে হইলে, অগ্রে ক্ষেত্র সংস্কার করা কর্ত্তব্য। নতুবা সমতল ও কুড়ি ভিন্ন, অসংস্কৃত শিষে টান ও ক্রমনিম্ন ক্ষেত্রে সার দেওয়ায় বিশেষ কোন উপকার দর্শে না। উক্ত ক্ষেত্রদ্বয়ের পৃষ্ঠদেশ বৃষ্টিজলে ধৌত হইয়া সমুদয় সারাংশ পলিরূপে নিম্ন ক্ষেত্রে গিয়া পতিত হইয়া থাকে।

পশ্চিম ভারতের ভূমি (রাঢ়দেশ প্রভৃতি) কিঞ্চিৎ কঠিন ও অপেক্ষাকৃত অনুর্ব্বরা বলিয়া তত্রত্য কৃষকেরা অতি প্রাচীন কাল হইতে ক্ষেত্রে সার প্রদান করিয়া আসিতেছে। তৎপ্রদেশের আবাদি ভূমি মাত্রই প্রায় সংস্কার করা দেখিতে পাওয়া যায়। তথাকার ক্ষেত্র সকল প্রত্যেকাংশে সমতল, এবং সমতলাংশের শেষ ভাগে উচ্চ করিয়া আইল বান্ধা থাকে। অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া আইল না ছাপাইলে এক ক্ষেত্রের জল অন্য ক্ষেত্রে যাইবার উপায় নাই। সুতরাং যে ক্ষেত্রের সার, সেই ক্ষেত্রেই থাকিয়া যায়, তাহা নিঃসারিত হইয়া অন্যত্র যাইতে পারে না।

পূর্ব্ব ভারতের ভূমির অবস্থা সেরূপ নহে। তথাকার ভূমি অতিশয় কোমল ও সমধিক উর্ব্বরা বলিয়া তথায় সার প্রদান করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল না। কিন্তু বহু কাল ধরিয়া শস্য উৎপাদনের নিমিত্ত একণে অধিকাংশ ক্ষেত্রই অনুর্ব্বরা হইয়া উঠিয়াছে। বোধ হয় অতি অল্প দিনের মধ্যেই পূর্ব্ব ভারতের উচ্চ ভূমি সকলে সার দেওয়ার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইবে। ইহার মধ্যেই কোন কোন কৃষক দুই একখানি ক্ষেত্রে সার প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু ক্ষেত্র সংস্কারের কথা এখনও কোন কৃষকের মনে উদিত হয় নাই।

যদিও অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতের কোন কোন প্রদেশের কৃষক সম্প্রদায় ক্ষেত্রে সারের ব্যবহার করিয়া আসিতেছে, তথাপি তাহাদের দ্বারা সারের কোন রূপ উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই। ইহা ভারতীয় কৃষক সম্প্রদায়ের দোষ নহে। ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি গুণেই এই অবস্থা ঘটিয়াছে। অভাব না থাকিলে কদাচই পূরণের চেষ্টা হইতে পারে না।

ভারতের সহিত তুলনা করিলে ইংলণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশ সকলের মৃত্তিকা অনেকাংশে নিকৃষ্ট বলিতে হয়। সুতরাং তত্রস্থ কৃষি ক্ষেত্র সকলে প্রচুর পরিমাণে সার প্রদান না করিলে শস্যাদি উৎকৃষ্ট রূপ জন্মে না। এক্ষণে তথাকার কৃষিবিদ্ পণ্ডিতদিগের প্রযত্নে সারের যতদূর উৎকর্ষ সাধন হইতে পারে, তাহা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা, অলবুমেন, অঙ্গার অম্ল, ফস্ফরিক, প্রভৃতি যে কোন পদার্থেরই আবিষ্কার করুন, সে সমস্তই এক মূলশক্তির অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া বোধ হয়। সেই শক্তির গুণ সম্বন্ধে যাহা কিছু অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহাই এস্থলে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

সারের গুণ।

ভূগর্ভে একটী আন্তরিক শক্তি আছে। মৃত্তিকা, জল, তেজ, বায়ু, এই চতুর্ব্বিধ পদার্থ সংযোগে তাহা প্রকাশ পায়। পদার্থবিদ্যায় জড় ও জড়ের গুণ সম্বন্ধে আকর্ষণ, বিয়োজন, উৎক্ষেপন, প্রভৃতি যে যে শক্তির বর্ণনা করা হইয়াছে, তৎসমুদয়ই ঐ ভূগর্ভস্থ আন্তরিক শক্তির কার্য্য। ঐ শক্তি চক্ষুর দৃষ্টিগোচর হয় না ও কোনরূপ যন্ত্র দ্বারা মৃত্তিকাদি পদার্থ চতুষ্টয় হইতে পৃথক্ করিতে পারা যায় না। উহা যে কি আশ্চর্য্য পদার্থ, তাহা ধারণা করা সহজ নহে। বাস্তবিক ঐ শক্তি মানব-বুদ্ধির অগোচর। উহার গতি প্রকৃতি কিরূপ, কিছুই স্থির হইয়া উঠে না।

পৃথিবীর আন্তরিক শক্তি যে কোন পদার্থে প্রকাশ পায়, এবং বস্তু বিশেষে তাহার পৃথক পৃথক নামকরণ হইয়া থাকে। উহা উদ্ভিদ্ পদার্থে প্রকাশিত হইলে "উৎপাদিকাশক্তি" বা "তেজ" শব্দে কথিত হয়।

এই উৎপাদিকা শক্তি ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র সমানভাবে বল প্রকাশ করিতে পারে না। তাহার কারণ এই যে, ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র স্বভাবতঃ ঠিক একরূপ বৃক্ষ লতাদি জন্মে না। দেশীয় প্রাকৃত ধর্ম্ম ভেদে ও মৃত্তিকার অবান্তর ভেদে, বৃক্ষ লতাদির অবয়বের বিভিন্নতা ঘটিয়াছে। কোন বৃক্ষ বৃহদাকৃতি, কোন বৃক্ষ মধ্যমাকৃতি, কেহ বা ক্ষুদ্রাকৃতি। কোন জাতীয় বৃক্ষ বহু দিন স্থায়ী, কেহ বা অচিরস্থায়ী, কেহ বা সারবান্, কেহ বা নিতান্ত অসার। একটী শালবৃক্ষ বহুদিন-স্থায়ী ও সারবান্। তাহাতে উৎপাদিকা শক্তি যে পরিমাণে বল প্রকাশ করিতে পারে, একটি অসার ও অচিরস্থায়ী কদলী বৃক্ষে, তাহার বহুলাংশের একাংশ শক্তি মাত্র প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা নাই।

এ বিষয়ে আর অধিক বলিবার আবশ্যক হইতেছে না। এই পর্য্যন্ত বলিলেই হইতে পারে যে, পৃথিবীর আন্তরিক শক্তি উদ্ভিজ্জ পদার্থে প্রকাশিত হইলে, তাহাকে উৎপাদিকা শক্তি বা তেজ শব্দে কহা যায়। আর বৃক্ষ লতাদির অবস্থানুসারে ঐ তেজ অল্প বা অধিক পরিমাণে বৃক্ষ লতাদির মূল কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া সমস্ত মূলদেশ, এবং কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্প, ফল, সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া থাকে।

প্রাণী সকল জাতি বিশেষে, উদ্ভিজ্জ পদার্থের কোন না কোন অংশ ভক্ষণ করিয়া, ঐ শক্তি প্রভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও জীবিত থাকে। সুতরাং এ শক্তিকে সমস্ত জগতের জীবন বলিলে বলা যাইতে পারে। শত পরিবর্ত্তনেও তাহার ধ্বংশ নাই। কিন্তু ঐ বিশ্ব-ব্যাপিনী জৈবনিক শক্তি কিছুতেই সুস্থির নহে। কখন চেতন, কখন অচেতন, কখন উদ্ভিজ্জ পদার্থ সকলে বিচরণ করিয়া থাকে। প্রথম ভূগর্ত্তে, ভূগর্ভ হইতে উদ্ভিজ্জ পদার্থে, উদ্ভিদ্ হইতে নিরামিষ-ভোজী জীব দেহে, তদনন্তর শ্বাপদ জীবগণ কর্ত্তৃক জীব দেহান্তরে প্রবিষ্ট হয়।

ভূগর্ত্তস্থ মৃত্তিকায় বহু স্থান ব্যাপিয়া যে পরিমাণ শক্তি অবস্থিতি করে, ক্রম পরিবর্ত্তনে ঘনীভূত হইয়া উদ্ভিজ্জ পদার্থে ও জীব দেহ মধ্যে ক্রমে ক্রমে তাহা অত্যল্প স্থানে সঞ্চিত হইয়া থাকে। এই জন্য এক সের সাধারণ মৃত্তিকা অপেক্ষা এক সের গলিত উদ্ভিজ্জাবশেষ সার মাটিতে উৎপাদিকা শক্তির অস্তিত্ব অধিক সম্ভবে।

উদ্ভিজ্জ পদার্থ কর্তৃক ভূগর্ভ হইতে যে তেজ আকৃষ্ট হয়, তাহার ঊর্দ্ধতন সীমা বীজপুর। সুতরাং ঐ শক্তি ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া, গতির সীমান্ত প্রদেশ বীজপুরে গিয়া অচলভাবে অবস্থিতি করে। তৎ প্রযুক্ত বৃক্ষাদির অন্যান্য অংশ অপেক্ষা বীজ গুলিতে অধিক পরিমাণে শক্তি সঞ্চয় হইয়া থাকে। ধান, গম, ছোলা, মটর, মসীনা, সরিষা, রেড়ী, প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত-স্থল। পোয়াল ভুবির শক্তি হইতে ঐ সকল পদার্থের শক্তি যে অনেকাংশে বেশী, ইহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু মসিনা, সরিষা, রেড়ী হইতেই খৈলের উৎপত্তি। তাহা যে উদ্ভিদের অপরাংশ বিকৃত সার মাটি অপেক্ষা অনেক তেজস্বী, তাহার সন্দেহ নাই।

উদ্ভিদ পদার্থের কোন না কোন অংশ (জাতি বিশেষে) জীবগণ কর্তৃক ভক্ষিত হইলে, তাহার কতকাংশ মল মূত্র এবং কতকাংশ রক্ত মাংস ও অস্থি মজ্জারূপে পরিণত হয়। দৈনিক আহারীয় পদার্থ হইতে মল মূত্রের উৎপত্তি। তাহাতে যে পরিমাণ শক্তির অবস্থিতি সম্ভবে, তাহা অপেক্ষা মাংসাস্থিতে অনেক অধিক থাকা সম্ভব। তাহার কারণ এই যে আজীবনের আহারীয় বস্তুর সঞ্চিত শক্তি (ক্ষয় বাদে) উত্তরোত্তর ঘনীভূত হইয়া মাংসাস্থিতে বিরাজ করে।

আবার প্রভূতশক্তিসম্পন্ন জীব-দেহ শ্বাপদ জীবগণ কর্তৃক গ্রাসিত হইলে, ঐ শক্তি গাঢ় হইতে আরও গাঢ়তরত্ব প্রাপ্ত হয়। সেই কারণে নিরামিষ-ভোজী প্রাণী সকলের মল মূত্র হইতে মনুষ্যের, এবং মনুষ্য হইতে ব্যাঘ্রাদি মাংসাদ পশু পক্ষীগণের, বিষ্ঠাদি পলাস্থি পর্য্যন্ত সমুদয় পদার্থ সমধিক শক্তিবিশিষ্ট বলিয়া অনুমিত হয়।

এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া নিঃসন্দেহ প্রতীতি হইতেছে যে, কোন উদ্ভিদাদি পদার্থ বা প্রাণী হইতে যে কোন প্রণালীতে সার প্রস্তুত হউক না কেন, উহা ঘনীভূত উৎপাদিকা-শক্তিযুক্ত উদ্ভিদের পরিণামাবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। বস্তুতঃ সারের আদ্যোপান্ত সমুদয় অংশ, উদ্ভিদ পদার্থের রূপান্তরিত পরমাণুপুঞ্জে ও ঘনীভূত উৎপাদিকা শক্তিতে পরিপূর্ণ। তাহা কোন ক্ষেত্রে প্রদত্ত হইলে স্বজাতীয় পরমাণু ও উৎপাদিকা শক্তি সংযোগে তত্রত্য বৃক্ষ লতাদি বিলক্ষণ তেজস্বী হইয়া উঠে। শত শত

পরিবর্ত্তনে এবং যুগ যুগান্তর গত হইলেও ঐ শক্তির গুণের কোন অন্যথা হয় না।

পরিবর্ত্তনের চরম কাণ্ড ভস্মরাশি ; তাহাতেও ঐ গুণের অভাব নাই। কতকাল গত হইয়াছে, ভূগর্ভস্থ মৃত্তিকাস্তরে থাকিয়া বোদমাটি আপন স্বভাব বিস্মৃত হইতে পারে নাই। তাহাকে উঠাইয়া বৃক্ষতলে বা কৃষিক্ষেত্রে প্রদান করিলে, অভিনব সারের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে।

নদীর স্রোতোজলে আনীত সূক্ষ্ম মৃত্তিকারাশি, পলিরূপে পরিণত হইয়া, ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করে। পলির শক্তি সার অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। কিন্তু ঐ পলি মাটিকে উদ্ভিজ্জের শেষ বলিয়া কদাচই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না। তবে তাহাতে অত্যল্প পরিমাণে পূত উদ্ভিজ্জ ও মল মূত্রের যোগ থাকিতে পারে। কিন্তু সেই অত্যল্প পূত উদ্ভিদ্ ও মল মূত্রের দ্বারা রাশীকৃত পলি মাটি তাদৃশ তেজস্বী হওয়া কথনই সম্ভব নহে।

বস্তুতঃ পলি মাটি সাধারণ মৃত্তিকারই অংশ মাত্র। রসায়নমতে, স্বাভাবিক মৃত্তিকায় উদ্ভিদ্-পোষণোপযোগী পদার্থ সকল যে পরিমাণে বর্ত্তমান আছে, পলিতে তাহাপেক্ষা কোন পদার্থ অধিক আছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয় নাই। তবে পলি মাটিতে সারের ন্যায় উৎপাদিকা-শক্তি-বৃদ্ধিকারিত্ব গুণ থাকিবার কারণ কি ?

যে সকল কৃষিবিদ্ পণ্ডিতদিগের মতে জল সর্ব্বোৎকৃষ্ট সার বলিয়া পরিগণিত, তাঁহারা এ স্থলে বলিতে পারেন যে, জল-সংযোগেই পলির শক্তি ঐরূপ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কিন্তু জল যে সার বলিয়া পরিগণিত নহে, তাহা এই প্রস্তাবের শেষ ভাগে প্রমাণীকৃত হইবে। এস্থলে পলির তাদৃশ শক্তিশালিতার অন্যবিধ কারণ প্রদর্শিত হইতেছে।

এই প্রস্তাবের প্রথমেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে, ভূগর্ভে একটি আন্তরিক শক্তি আছে, মৃত্তিকা, জল, তাপ, বায়ু, এই চতুর্ব্বিধ পদার্থ-সংযোগে তাহা প্রকাশ পায়।

যেরূপ তরল পদার্থের ধর্ম্ম সমোচ্চতা রক্ষা করা, ঐ শক্তিতেও সেইরূপ সমোচ্চতা রক্ষা করা গুণ বর্ত্তমান আছে। তবে তরল বস্তু মাত্রেই প্রায়

আকার বিশিষ্ট এবং সামান্য কারণেই তাহা শীঘ্র শীঘ্র স্থানচ্যুত হইয়া পড়ে ও চতুর্দ্দিকস্থ স্বজাতীয় পদার্থ সকল সত্বরে আন্দোলিত হইয়া তৎস্থান পূরণ করিয়া থাকে। কিন্তু এই শক্তির সমোচ্চতা রক্ষা করিবার নিয়ম তাহা হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন।

এই শক্তি আকার-বিহীন, এবং এক মাত্র উদ্ভিজ্জ পদার্থ ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ দ্বারা মৃত্তিকাদি পদার্থ চতুষ্টয় হইতে পরিচালিত হয় না। কিন্তু উদ্ভিদ্ পদার্থ মাত্রেই ঐ শক্তিকে এককালে প্রবল বেগে আকর্ষণ করে না। প্রথমে যখন মৃত্তিকা-সংযোগে বীজ সকল অঙ্কুরিত হইয়া তাহার একাংশ মূলরূপে ভূগর্ভে প্রবেশ করে, ও অপরাংশ উর্দ্ধভেদ করিয়া উঠিতে থাকে, তখন বৃক্ষ লতাদি যেভাবে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ভূগর্ভস্থ মূলাংশ কর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্ত শক্তিও মৃত্তিকা হইতে ঠিক সেই প্রকারে ক্রমশঃ ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইয়া কাণ্ড দেশে উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকে, এবং তথা হইতে শাখা, প্রশাখাদি সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে। মূলের দ্বারা ভূগর্ভস্থ শক্তি আকৃষ্ট হইতে যত সময় গত হয়, সমোচ্চতা রক্ষার নিমিত্ত, চতুর্দ্দিকস্থিত ও অধোভাগস্থ মৃত্তিকার শক্তি আসিয়া, তৎ স্থান পূরণ করিতে ঠিক তত সময়ই লাগিয়া থাকে।

কোন ভূমির শক্তি কতক দিন পর্য্যন্ত উদ্ভিদ্ পদার্থ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া, পরে আবার কিছু দিনের জন্য যদি তাহা রহিত হয়, তবে জল, তাপ, ও বায়ু সংযোগে অধোভাগস্থ ও চতুর্দ্দিকস্থ মৃত্তিকার শক্তি আসিয়া তৎস্থান পূরণ করত ক্রমে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ভূপৃষ্ঠে বিস্তৃত হইয়া থাকে। কিন্তু হ্রাস বৃদ্ধি ব্যতীত, কোন স্থানে ঐ বিশ্বব্যাপিনী জৈবনিক শক্তির একেবারে অত্যন্ত অভাব হয় না, এবং কৃষি ক্ষেত্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেবল মাত্র পুস্তক পাঠে এই বৃত্তান্ত হৃদয়ঙ্গম করা তত সহজ নহে।

অনাকৃষ্ট ক্ষেত্র হলতলে নীত হইলে, প্রথম প্রথম দুই তিন সন পর্য্যন্ত তত্রত্য উদ্ভিজ্জ শ্রেণী যেমন তেজস্বী হয় ও প্রচুর পরিমাণে শস্য প্রসব করিয়া থাকে, ঐ ভূমি বহু দিন পর্য্যন্ত উঠিত থাকিলে বিবিধ শস্যের আকর্ষণে ক্রমশঃ তাহার শক্তি হ্রাস হইয়া যায়। সুতরাং তথাকার উদ্ভিজ্জ শ্রেণী

পূর্ব্ববৎ তেজ-বিশিষ্ট হয় না ও তাদৃশ শস্য প্রসবও করে না। এই দোষ পরিহারার্থ কৃষকেরা বৎসর বৎসর ক্ষেত্রে সার প্রদান করিয়া থাকে। যে সকল ক্ষেত্রের জল সহসা অন্যত্র নিঃসারিত হয় না, সেই সকল ক্ষেত্রে সার প্রদান করিলে সেই সার ক্ষেত্র মধ্যে থাকিয়া ভূশক্তির সমতা রক্ষা করে। এই কারণে, সমতল, কুড়ি, এবং পলি-প্রাপ্ত বিলান ক্ষেত্র সকল প্রায় পতিতাবস্থায় থাকিতে দেখা যায় না। তাহারা চিরদিনই উঠিত থাকিয়া প্রতিবৎসর সমভাবে শস্যোৎপাদন করিয়া থাকে।

আবার কূর্ম্মপৃষ্ঠ ও ক্রমনিম্ন ক্ষেত্রদ্বয়ে জল দাঁড়ায় না; তাহাতে সার প্রদত্ত হইলে পতিত বৃষ্টিজলে সমুদয় ধৌত হইয়া নিম্ন ক্ষেত্রে গিয়া পতিত হয়। সুতরাং কূর্ম্মপৃষ্ঠ ও ক্রমনিম্ন ক্ষেত্রে সার প্রদান করিলে, তাহাতে কোন উপকারই দর্শে না। ভারতীয় কৃষি বিজ্ঞানমতে অগত্যা ঐ ক্ষেত্রদ্বয় উঠিত পতিত নিয়মানুসারে আবাদ করিবার প্রথা প্রচলিত আছে। ক্রমান্বয়ে তিন চারি সন পর্য্যন্ত উঠিত থাকিয়া ক্ষেত্রের শক্তি হ্রাস হইলে কৃষকেরা ঐ ক্ষেত্রদ্বয় পতিত রাখে। ইতর ভাষায় এইরূপ ভূমিকে "চেটোপড়া" অথবা "লালচিটা" ভূমি বলে।

চেটোপড়া ভূমি উপর্য্যুপরি তিন চারি সন পতিত থাকিলেই,ভূগর্ভের নিম্নতল ও চতুর্দ্দিক হইতে তেজ সঞ্চালিত হইয়া সমুদয় ক্ষেত্রকে পূর্ব্ববৎ শক্তিবিশিষ্ট করিয়া তুলে। তখন আবার রীতিমত আবাদ করিয়া বীজাদি বপন করিলে ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় অপর্য্যাপ্ত শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রাচীন বগুড়ী ও বরেন্দ্র ভূমির উচ্চ ক্ষেত্র মাত্রেই প্রায় এই প্রথা প্রচলিত আছে।

নদীয়া ও নাটোর প্রভৃতি জেলা সকলের প্রান্তর মধ্যে যাঁহারা ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা ঐ বৃত্তান্ত কতকটা অবগত থাকিলেও থাকিতে পারেন। তত্তদ্দেশের কৃষকেরা উচ্চ ভূমি সকল উঠিত-পতিত-নিয়মানুসারে আবাদ করিয়া থাকে। এই কারণে তাহারা কৃষি-ক্ষেত্রে সার প্রদান করে না। কিন্তু অন্যত্রের কৃষকেরা ক্ষেত্রে প্রতি বৎসর রাশি রাশি সার দিয়া যে ফল প্রাপ্ত হয়, বগুড়ী ও বরেন্দ্র ভূমির কৃষকেরা বিনা সারে উঠিত-পতিত-নিয়মানুসারে আবাদ করিয়া, এক মাত্র উৎপাদিকা শক্তির সমতা রক্ষা করা দ্বারা সেইরূপ ফল লাভ করিয়া থাকে।

উৎপাদিকা শক্তিতে যদি সমতা রক্ষা করা গুণ না থাকিত, তবে কোন ক্ষেত্র শস্য প্রসব করিয়া এক বার শক্তিহীন হইলে, ঐ শক্তি পুনরায় বৃদ্ধি করিবার আর উপায় থাকিত না। সার প্রদান করিলেই বা তাহাতে কি ফলোদয় হইত। শক্তি অচলা হইলে সারের অভ্যন্তরস্থ শক্তি সারের মধ্যেই থাকিয়া যাইত। ক্ষেত্রস্থ শক্তি-বিহীন মৃত্তিকা তাহা গ্রহণ করিতে কদাচই সক্ষম হইত না।

যখন দেখা যাইতেছে সারের আভ্যন্তরিক শক্তি-পুঞ্জ, হীনবল মৃত্তিকা ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাহাদিগকে তেজস্বী করিয়া তুলে, তখন সপ্রমাণ হইতেছে যে, ঐ শক্তি সচলা এবং সমতা রক্ষা করা তাহার স্বভাবসিদ্ধ গুণ। তবে জল, বায়ু, তাড়িত প্রভৃতি পদার্থ সকল যেমন মুখ্য কল্পে সমোচ্চতা রক্ষা করে, উৎপাদিকা শক্তি তাদৃশ বেগবতী নহে। অতি মন্দ মন্দ গতিতে (গৌণ কল্পে) সমোচ্চতা রক্ষা করিয়া থাকে। এই জন্য কিছু দিন পূর্ব্বে ক্ষেত্রে সার প্রদান না করিলে ও মৃত্তিকার সহিত তাহা উত্তমরূপে সংযোগ করিয়া না দিলে, সারের পুষ্ট শক্তি, ক্ষীণশক্তি মৃত্তিকায় সংক্রামিত হইতে পারে না। এবং ভূমি পতিত ফেলাইয়া শক্তি সঞ্চয় করিতে হইলেও, বহু দিন ধরিয়া জমি পতিত না রাখিলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না।

লালচিটা জমিতে সত্বরে কিয়ৎপরিমাণে শক্তি সংযোগ করিবার আর একটি সহজ উপায় আছে; তাহাতেও ঐ শক্তির সমতা রক্ষা করা গুণের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ক্ষেত্র হইতে রবি খন্দ উঠিয়া গেলে, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে তাহাতে কোন শস্য বীজ বপন না করিয়া, জমি পতিত রাখিতে হয়। ইহাকে 'ইম-পতিত' বলে। আষাঢ় মাসে বর্ষা সমাগম হইলে, পুনঃ পুনঃ ঐ ক্ষেত্র জলে কাদায় চষিয়া দিতে হয়। তাহা হইলে মাটিতে ক্রমশঃ পচান ধরিয়া উঠে। কৃষকেরা ইহাকে পচান চাষই বলিয়া থাকে।

চাষে চাষে মাটি খুব পচিয়া উঠিলে, ঐ পচা মাটির ভিতরে তাপ ও বায়ু প্রবেশ করিয়া, তাহার রসাংশকে বাষ্পাকারে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিতে থাকে। এদিকে অধোভাগস্থ ও চতুর্দ্দিকস্থ আনাড় মৃত্তিকার রস আসিয়া তাহাকে যেমন পুনর্ব্বার আর্দ্র করিবার চেষ্টা করে, তেমনই তাপ ও বায়ুর

সংযোগে বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া উর্দ্ধগামী হয়। এইরূপে কিছু দিন ধরিয়া তাপ ও বায়ু সহকারে পচান মাটিতে রসের আকর্ষণ বিয়োজন প্রক্রিয়া ক্রমান্বয়ে চলিতে থাকে। ঐ রসাকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিকস্থ ও অধোভাগস্থ মৃত্তিকা হইতে কিয়ৎপরিমাণে উৎপাদিকা শক্তির সমাগম হয়, এবং বায়ু হইতেও নাইটারজান প্রভৃতি পদার্থ সকল তাহার সহিত যোগ হইয়া, পচান মাটি অপেক্ষাকৃত উর্ব্বরা হইয়া উঠে। তাহার পর কার্ত্তিক মাসে ঐ ক্ষেত্রে কোন রবি খন্দ বপন করিলে, পূর্ব্ববৎ ফলোৎপন্ন হইতে দেখা যায়। আর যদি রবি খন্দ বুনানি না করিয়া সমস্ত শীতকাল তাহাতে বারোমেসে চাস দেওয়া যায়, তাহা হইলে ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা হইয়া থাকে। উৎপাদিকা শক্তিতে সমতা রক্ষা করা গুণ বর্ত্তমান না থাকিলে কদাচই এরূপ হওয়া সম্ভব নহে।

এ পর্য্যন্ত উৎপাদিকা শক্তির সমতা রক্ষা করা গুণ সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইল; কিন্তু উদ্ভিদ্ পদার্থের উৎপত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এককালে সকল সন্দেহ দূরীভূত হইয়া যায়। উদ্ভিদ্ পদার্থ সকল, তাপ ও বায়ু সংস্পর্শে, আকর্ষণ বিয়োজনের দ্বারা রসের পরিপাক করিয়া, ভূশক্তি সহযোগে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এক দিকে যেমন উদ্ভিজ্জ পদার্থ কর্ত্তৃক ভূশক্তি আকৃষ্ট হইয়া মৃত্তিকা শক্তিহীন হইয়া পড়ে, অন্য দিকে উদ্ভিজ্জ ও প্রাণী সকল, জীবনান্তে সঞ্চিত শক্তি সমুদয় বসুমতীকে প্রতিদান করিয়া, ভূশক্তির সমতা রক্ষা করে। তবে একথা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা গিয়াছে যে, সেই আদান প্রদান মুখ্য কল্পে না হইয়া গৌণ কল্পে হইয়া থাকে।

ঐ সমোচ্চতা রক্ষা করা গুণ প্রভাবে, ভূগর্ভস্থ উৎপাদিকা শক্তি, পৃথিবীর জলে স্থলে সর্ব্বত্র, সমভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। গভীর সমুদ্রতলস্থ মৃত্তিকা হইতে অত্যুচ্চ পর্ব্বত শেখরাগ্রস্থিত মৃত্তিকা এবং জমাট প্রস্তর (১) ও মরুভূমি (২), পর্য্যন্ত কুত্রাপি ঐ শক্তির অভাব নাই। কিন্তু পর্ব্বতারণ্য, নায়ক,

১। জমাট প্রস্তর অতি সূক্ষ্মভাবে চূর্ণ করিয়া ভূমিতে প্রদান করিলে সারের ন্যায় কার্য্য করে। হিমালয়ের অধিকাংশ প্রস্তরই সার প্রস্তুতের উপযোগী।

২। মরুভূমি বালুকাময় তাহার যোগাকর্ষণ শক্তি নাই এবং তথায় অত্যন্ত জলাভাব; এই উভয় কারণে মরুভূমিতে কোন উদ্ভিদাদি জন্মে না। তবে বালুকার যে উৎপাদিকা শক্তি

সর-মায়ক, উঠিত, পতিত, কোন ক্ষেত্রেরই পৃষ্ঠ দেশস্থ দুই ইঞ্চ মৃত্তিকার শক্তি কোন উদ্ভিদ্মূল কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হয় না। ঐ শক্তি অস্পৃশ্য ভাবে ভূ-পৃষ্ঠেই অবস্থিতি করে।

বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, ও ওষধি মধ্যে ছোট বড় সকলেই ভূগর্ভস্থ শক্তি আকর্ষণ করিয়া লয়। অতি ক্ষুদ্রমূল দূর্ব্বা ঘাস পর্য্যন্ত ভূপৃষ্ঠের শক্তি গ্রহণ করিয়া থাকে না। অথচ সমতা রক্ষার নিমিত্ত ভূগর্ভস্থ উৎপাদিকা শক্তি সতত উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ভূপৃষ্ঠে বিস্তৃত হইয়া থাকে। পতিত বৃষ্টিজলে ভূপৃষ্ঠ ধৌত হইয়া পলিমাটির উৎপত্তি করে। উৎপাদিকা-শক্তি-পরিপূর্ণ ঐ পলিমাটি-নামধেয় সূক্ষ্ম মৃত্তিকা রাশি স্রোতোজলসহকারে নদীগর্ভে গিয়া পতিত হয়। পরিণামে নদীগর্ভস্থ স্রোত জল স্ফীত হইয়া, সমভূমিতে প্লাবিত হইলে, তাহার বেগের লাঘর হইয়া থাকে। তেজপূর্ণ সূক্ষ্ম মৃত্তিকা-রাশি পলিরূপে পরিণত হইয়া, সারের ন্যায় ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করে। সার ও পলি মাটি উৎপত্তি বিষয়ে পৃথক পদার্থ বটে, কিন্তু শক্তি সম্বন্ধে ঠিক একরূপ, তাহাতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।

আর কোন কোন স্থানের পলিমাটির সহিত অতি অল্প পরিমাণে উদ্ভিদ্ ও মল মূত্রের যোগ থাকিলেও থাকিতে পারে। অরণ্য মধ্যে উদ্ভিদ্ পদার্থের পত্র পুষ্পাদি পতিত ও পূত হইয়া তদ্দ্বারা, এবং গ্রাম সীমান্তের পড়িয়াণ ভূমিতে প্রাণী বর্গের পরিত্যক্ত মল মূত্র দ্বারা, ভূপৃষ্ঠস্থ মৃত্তিকার কিয়ৎপরিমাণে শক্তি বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। পরে তাহা পলিমাটির সহিত সংযোগ হইয়া, পলি মাটিকে অপেক্ষাকৃত শক্তি বিশিষ্ট করিয়া তুলে। কিন্তু পলি মাটির প্রধান

নাই, এরূপ নহে। কেবল এক মাত্র জল-ধারণা শক্তি না থাকাতেই, পঞ্চ ভূতের সামঞ্জস্য হয় না। সুতরাং অতিরিক্ত বালুকাময় ক্ষেত্রে পঞ্চীকরণের অভাব প্রযুক্ত, উদ্ভিদ্ পদার্থের উৎপত্তির ব্যাঘাত ঘটে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের উষর ভূমিতে উদ্ভিদ্-পোষণোপযোগী পদার্থ সকল বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও, জলধারণাশক্তি বিরহে তাহার উৎপাদিকা শক্তির অস্তিত্ব অনুভব হয় না। রসায়ন মতে গলনশীল পদার্থের আধিক্যই তাহার কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। কিন্তু এই গ্রন্থের মতে, যে ক্ষেত্রে পঞ্চভূতের সামঞ্জস্যের অভাব হয়, সেই ক্ষেত্রই অনুর্ব্বরা বলিয়া পরিগণিত। মেটেল মাটিতে শিকি ভাগের অধিক গলনশীল পদার্থ মিশ্রিত করিলেও তাহা অনুর্ব্বরা হয় না।

আকর স্থান বৃহৎ বৃহৎ প্রান্তর সকলে উদ্ভিদাদি ও মল মূত্রের অধিক যোগ নাই। সুতরাং পলি মাটিতে উদ্ভিদাদিও মল মূত্রের যে যোগ থাকে, তাহার পরিমাণ অতি সামান্য বলিতে হইবে।

ভরাট মাটি, পলি মাটিরই রূপান্তর মাত্র। উভয়ের উৎপত্তি এবং উৎপাদিকা শক্তি বিষয়ে অধিক প্রভেদ লক্ষিত হয় না। প্রভেদের মধ্যে—পর্ব্বত, অরণ্য, ও প্রান্তর, ইত্যাদি বহুস্থান হইতে পলিমাটির উৎপত্তি এবং তাহার সহিত মল মূত্রের যোগ অতি সামান্য মাত্রায় থাকে; আর গ্রাম-সীমাবস্থিত বাস্তু ভূমির পৃষ্ঠ দেশ ধৌত হইয়া ভরাট মাটির উৎপত্তি করে, এবং তাহাতে মল মূত্রের যোগ অধিক পরিমাণে থাকিতে দেখা যায়; পলিমাটি প্রশস্ত ভাবে প্রশস্ত ক্ষেত্রে পতিত হইয়া থাকে; ভরাট মাটি কোন অল্পায়ত গভীর স্থানে রাশীকৃত ভাবে অবস্থিতি করে; পলি দেখিতে ধূসর বর্ণ ও অপেক্ষাকৃত সুচিকণ, সুকোমল মৃত্তিকা; ভরাট মাটি কৃষ্ণবর্ণ ও কর্দ্দমবৎ ঈষদাটাবিশিষ্ট ও দুর্গন্ধ যুক্ত, এবং শুখাইলে কিঞ্চিৎ কঠিন হইয়া থাকে। যাহা হউক, মল মূত্রের যোগ থাকা প্রযুক্ত, পলি হইতে ভরাট মাটি সমধিক শক্তি বিশিষ্ট ও উৎকৃষ্ট সার বলিয়া পরিগণিত।

অগ্নিদগ্ধ ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পাইবার কারণ এই যে, রসায়নবিদ্ পণ্ডিতদিগের মতে, গলন-শীল পদার্থ (১) ও বিষাক্ত (২) দ্রব্যের আধিক্য বশতঃ ভূমি অনুর্ব্বরা হইয়া থাকে। মৃত্তিকা অগ্নিদগ্ধ হইলে ঐ সকল বস্তু পুড়িয়া গিয়া, ভূমি উর্ব্বরা হইয়া উঠে, এবং দগ্ধ মৃত্তিকার যোগাকর্ষণ শক্তি অপেক্ষাকৃত শিথিল হইয়া যাওয়াতে, উদ্ভিদ পদার্থের মূল সকল বিস্তারের অনেকটা সুবিধা হইয়া থাকে। এবং আগাছা সকল সবীজ বিনষ্ট হইয়া, ভবিষ্যৎ উদ্ভিজ্জ শ্রেণীর উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া রাখে।

চূণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উদ্ভিদের কোন উপকার করিতে পারে না। কিন্তু অন্যান্য আকারে বিশেষ উপকার করিয়া থাকে। প্রথমতঃ, মৃত্তিকাকে শিথিল ও সচ্ছিদ্র করিয়া উদ্ভিদ-মূল প্রসারণের উপযোগী করে। দ্বিতীয়তঃ,

(১) লবণ চিনি ইত্যাদি যে সকল বস্তু জলস্পর্শে গলিয়া যায়, তাহাদিগকে গলন-শীল পদার্থ কহে।

(২) হিরাকশ ইত্যাদি বিষাক্ত দ্রব্য বলিয়া পরিগণিত।

মৃত্তিকাস্থ অম্ল সকল নষ্ট করিয়া, লৌহ ঘটিত পদার্থ সকলকে সুকোমল করিয়া তুলে। তৃতীয়তঃ, মৃত্তিকাস্থ রস পরিমাণের লাঘব করিয়া, পোষক পদার্থ সকলকে উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী করিয়া থাকে। চতুর্থতঃ, আগাছা ও খনিজ পদার্থ সকলের ক্ষয় সাধন করিয়া, ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে। (১)

যবক্ষারজান বৃক্ষাদির পক্ষে বিশেষ উপকারী বলিয়া ক্ষেত্রে লবণ সোরা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়া থাকে। রসায়নবিদ্ পণ্ডিতেরা নিরূপণ করিয়াছেন, ভূমণ্ডলে উদ্ভিদ-পোষণোপযোগী যে সমস্ত পদার্থ আছে, তাহাদের মধ্যে সোরাজান একটি প্রধান বস্তু। কোন মৃত্তিকায় উপযুক্ত রূপ সোরাজান না থাকিলে, তথায় উদ্ভিদ সকল সুচারুরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। এবং সোরাজানের অত্যন্ত অভাব হইলে, তত্রত্য উদ্ভিদ্ সকল এক কালীন শুখাইয়া যায়। অতএব সোরাজান বৃক্ষাদির পক্ষে কেন এত উপকারী, তাহা একবার ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

সৃষ্টিতত্ত্বে আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের সমান উপযোগিতা দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের মধ্যে জলই অপর পদার্থ চতুষ্টয়ের যোগ সামঞ্জস্য করিয়া থাকে। জলাভাবে জগতীস্থ কোন প্রাণী বা উদ্ভিদ্ ক্ষণকালের জন্য জীবন ধারণ করিতে সক্ষম হয় না। এই জন্য জল জগতের জীবন স্বরূপ বলিয়া কথিত হইয়াছে। জলাভাবে মরুভূমি কি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। অতএব সৃষ্টিতত্ত্বে জল যে কি মহান্ বস্তু, তাহা আর বিশেষ করিয়া বুঝাইবার আবশ্যক করে না।

জল জগতের জীবন স্বরূপ বটে, কিন্তু তাহা স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিয়া উদ্ভিদ ও জীবদেহ পোষণ করিয়া থাকে না। জল অপরাপর পদার্থের সংমিশ্রণে আপনি রসে পরিণত হইয়া এবং অপরাপর পদার্থ সকলকে রসে পরিণত করিয়া, উদ্ভিদ্-দেহ ও জীব-দেহ পরিপোষণ করিয়া থাকে। তন্নিমিত্ত পূজ্য প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ "জলের গুণ রস" বলিয়া নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন।

ঐ রস প্রধানতঃ ছয় ভাগে বিভক্ত; যথা, লবণ, মধুর, অম্ল, তিক্ত, কষায়, ও কটু। জগতীস্থ প্রত্যেক উদ্ভিদ্-দেহে ও জীবদেহে ঐ ষড় রসের সংযোগ

(১) চূণের বিবরণ বাবু কালীময় ঘটকের কৃষিশিক্ষা হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে।

আছে। তবে জাতি-বিশেষে কোথায় অধিক, কোথায় অল্প, এই মাত্র প্রভেদ। কিন্তু অল্প হউক, আর অধিকই হউক, ষড় রসের যোগ ব্যতীত উদ্ভিদ্-দেহের ও জীব-দেহের সম্যক প্রকারে স্বাস্থ্য সংরক্ষিত হয় না। সুতরাং ষড় রসের মধ্যে কোন একটী রসের অভাব হইলে, কি উদ্ভিদ্, কি প্রাণী, উভয় জাতিরই জীবন ধারণ করা কঠিন হইয়া উঠে।

তবেই দেখা যাইতেছে, কি উদ্ভিদ, কি প্রাণী দেহ ধারণ করিতে হইলেই, তাহাতে ষড় রসের যোগ থাকা চাই। কিন্তু ষড় রসের মধ্যে লবণ সর্ব্ব প্রধান রস বলিয়া পরিগণিত। প্রত্যহ আহারের সময়ে সকলেই লবণ রসের ঐ শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করিয়া থাকেন। লবণ রসের যোগ ব্যতীত কোন রসই সুমিষ্ট ও রুচিকর হয় না। ইহা জীবদিগের পক্ষে যেরূপ, উদ্ভিদ্ সকল সম্বন্ধেও সেই রূপ বলবৎ নিয়ম বলিতে হইবে।

বিনা লবণে আমরা যেমন অধিকাংশ বস্তুই ভক্ষণ করিতে পারি না, সেইরূপ বৃক্ষাদিও লবণ রসের যোগ ভিন্ন অন্য পদার্থ সকল গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় না। আমাদের যেমন ভাত, ডাল, তরকারি, অম্ল, দধি প্রভৃতি খাদ্য বস্তু সকলে লবণ রসের যোগ থাকা প্রয়োজন, সেইরূপ বৃক্ষাদির খাদ্য মৃত্তিকাদি পদার্থ সকলেও কিয়ৎ পরিমাণে লবণ রসের যোগ থাকা আবশ্যক করে। বোধ হয়, প্রাচীন মতে যাহার নাম লবণ রস, আধুনিক মতে তাহাকেই "সোরাজান" বলে। তবেই বুঝা যাইতেছে, বৃক্ষাদির পক্ষে সোরাজান কেন এত উপকারী।

লবণ আমাদের বিশেষ প্রিয়বস্তু বটে, কিন্তু অন্য কোন বস্তুর সহিত যোগ না করিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লবণ ভক্ষণ করিতে আমাদের সাধ্য নাই। আর কোন বস্তুর সহিত সংযোগ সময়ে এক ছটাক পরিমাণ স্থলে আধ পোয়া লবণ দেওয়া গেলে, লুণে বিষ বলিয়া সে বস্তু আর মুখে করিতে পারা যায় না। সেইরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অথবা মৃত্তিকায় লবণ রসের পরিমাণ অধিক থাকিলে, উদ্ভিদ সকল কদাচই তাহা গ্রহণ করিতে পারে না।

এক তরকারি লুণে বিষ হইলে, আমাদের যেমন আহারের ব্যাঘাত ঘটে, বৃক্ষাদির পক্ষেও তাহাই ঘটিয়া থাকে। তবে আমাদের এক তরকারি

ভিন্ন আহারের অনাবিধ উপায় আছে; বৃক্ষাদির সে উপায় নাই। বৃক্ষাদির মূল সকল ভুগর্ভের যতদূর অবধি ব্যাপ্ত হয়, ততদূর পর্য্যন্ত মৃত্তিকা হইতেই তাহাদের আহার সংস্থান হইয়া থাকে। সুতরাং মূলাধিকৃত মৃত্তিকা টুকু যদি লুণে বিষ হইয়া উঠে, তবেই বৃক্ষাদির পক্ষে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। লবণাংশের আধিক্যবশতঃ প্রয়োজন সত্বেও বৃক্ষাদি আপনাদের খাদ্য পদার্থ সকল গ্রহণ করিতে পারে না। সুতরাং বৃক্ষাদির পক্ষে লবণাংশের স্বল্পতা ও অত্যন্ত অভাব যেমন ক্ষতিজনক, তাহার আধিক্যও তেমনি অনিষ্টকর, তাহার সন্দেহ নাই।

এই নিমিত্তই অস্মদ্দেশীয় লোণা সেয়ারা মাটিতে কোন বৃক্ষাদি জন্মে না। এই নিমিত্তই লবণ ক্ষেত্র সকল মরুভূমির ন্যায় উদ্ভিদ্‌-শূন্য হইয়া রহিয়াছে। এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশের উষর ভূমিতে যে কোন উদ্ভিদাদি উৎপন্ন হয় না, তাহার কারণ গলনশীল পদার্থের আধিক্য অর্থাৎ লবণাংশের আধিক্য বলিয়াই নিরূপিত হইয়াছে।

যাহা হউক, এক্ষণে ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লবণ সোরা দেওয়া কর্ত্তব্য কি না, ইহার উত্তর দেওয়া বড়ই কঠিন সমস্যা হইতেছে। বোধ হয়, ভারত ক্ষেত্রে সোবাজান প্রভৃতি পদার্থ সকলের অভাব নাই। যদি তাহা থাকিত, তবে ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র নানা জাতীয় বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, ওষধিসমাকীর্ণ অরণ্যানী ও শ্যামল শস্য পরিপূর্ণ ক্ষেত্র সকল নয়নগোচর হইত না! স্বর্ণভূমি, পুণ্যভূমি, ও অখিল জগন্মণ্ডলের শস্য ভাণ্ডার বলিয়া পুরাকালে ভারত সর্ব্বত্রে খ্যাতি লাভ করিতে পারিত না।

ভারতের ভূপৃষ্ঠে ও বায়ু মণ্ডলে সোরাজানের যে অভাব নাই, ভারতীয় বিবিধ উদ্ভিজ্জ শ্রেণীই তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। এবং কূপোদক লইয়া পরীক্ষা করিলে ভুগর্ভেরও বিষয় অবগত হওয়া যাইতে পারে। কোন কোন কূপের লবণাম্বু মুখে দিলে, মুখ বিকৃত হইয়া উঠে। তবেই দেখা যাইতেছে, ভারতের ভূপৃষ্ঠে ও বায়ু মণ্ডলে কুত্রাপি সোরাজানের অভাব নাই। বরং কোন কোন স্থানে অতিরিক্ত পরিমাণেই আছে। তাহার উপর আবার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রে লবণ সোরা প্রদান করা বড়ই অসম সাহসিকতার কার্য্য বলিতে হইবে।

আপাততঃ ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রে লবণ সোরা দেওয়ার ফল উৎকৃষ্ট হইলেও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাহাতে যথেষ্ট আশঙ্কার কারণ আছে। ক্ষেত্রে লবণ সোঁরা প্রদান করিলে, তাহার সমুদয় অংশই যে নিঃশেষিত রূপে উদ্ভিদ পদার্থে গ্রহণ করিতে পারিবে, এরূপ বোধ হয় না। শস্য সকল লবণ সোরার অংশ ক্রমে ক্রমে গ্রহণ করিতে থাকিবে। ইতিমধ্যে বৃষ্টিপাত হইলে, তাহার কতকাংশ জল সংযোগে মৃত্তিকার তলদেশে গিয়া যে সঞ্চিত হইবে না, ইহা কিরূপে বিশ্বাস করা যাইতে পারে। এইরূপে প্রতি বৎসর কিছু কিছু করিয়া সঞ্চিত হইয়া কালক্রমে যখন লবণাংশের পরিমাণ অধিক হইয়া উঠিবে, তখন ভূমি সকল লোণা সোয়ারা হইয়া নিশ্চয়ই অনুর্ব্বরা হইয়া যাইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

এস্থলে অনেকেই বলিতে পারেন যে, বহির্ব্বাণিজ্যের বাহুল্য প্রযুক্ত বৎসর বৎসর প্রচুর পরিমাণে বিবিধ শস্যের রপ্তানিতে ভারত ভূমির শক্তিক্ষয় হইতেছে। তৎসঙ্গে সোরাজানেরও কিয়ৎ পরিমাণে অভাব হইয়া যাইতেছে। সুতরাং এক্ষণে সেই পরিমাণে লবণ সোরা প্রদান ভিন্ন শস্য ক্ষেত্র সকলের সেই ক্ষতি পূরণের আর উপায় নাই। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে এ যুক্তি নিতান্ত দুর্ব্বল বলিয়া বোধ হইবে।

বিবিধ শস্যের রপ্তানিতে সোরাজানের কিছু অভাব হয় সত্য বটে, কিন্তু অন্যান্য দেশ ও সমুদ্রোপকূল হইতে প্রচুর পরিমাণে লবণ আমদানি হইয়া সে ক্ষতি পূরণ হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে যে লবণ আমদানি হয়, তৎ সমুদয় ভারতবর্ষস্থ জীবগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া ভারতের জলে স্থলে ও বায়ু মণ্ডলের সর্ব্বত্রে ছড়াইয়া পড়ে। অতএব ভারতে সোরাজানের অভাব হইয়াছে, একথা স্বীকার্য্য নহে। সমষ্টিভাবে দেখিতে গেলে, ভারতে লবণাংশের ভাগ বরং দিন দিন বৃদ্ধিই হইতেছে। সুতরাং শস্য ক্ষেত্রের জন্য আবার পৃথক্‌রূপে লবণ আমদানি করা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয় না। তবে দুই পাঁচ বৎসর অন্তর কৃষিক্ষেত্রে কখন দুইসের পাঁচসের লবণ প্রদান করিলে, তত অনিষ্ট না হইতে পারে। কিন্তু প্রতিবৎসরই যে ধান্য-খন্দের জমিতে এক মণ করিয়া লবণ বা সোরা দিতে হইবে, এবড় ভয়ঙ্কর কথা। এরূপ করিলে

ভবিষ্যতে ভারত-ক্ষেত্রে যে দুর্ব্বা পর্য্যন্ত জন্মাইবে না, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কৃষিক্ষেত্রে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লবণ সোরা না দিয়া বিকৃত মল মুত্র, ভরাট মাটি বোদমাটি, পলিমাটি, খোল, অস্থিচূর্ণ ইত্যাদি দেওয়াই শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হয়। সার মাটিতে সোরজান প্রভৃতি কোন পদার্থের অভাব নাই এবং তাহাতে ভবিষ্যতেরও কোন আশঙ্কা নাই। তবে কৃষি ক্ষেত্রে সার মাটি দিতে হইলে, তাহা কি পরিমাণে দেওয়া কর্ত্তব্য, কৃষক আপনার ক্ষেত্রের অবস্থা বুঝিয়া তাহার ব্যবস্থা করিয়া লইবেন।

ইতিপূর্ব্বে যে পঞ্চ ক্ষেত্রের উল্লেখ করা গিয়াছে, ঐ সকল ক্ষেত্র প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। কতকগুলি ক্ষেত্রে কেবল ধান্য ভিন্ন আর কিছুই উৎপন্ন হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে কেবল খন্দই জন্মে। অপর কতকগুলি ক্ষেত্রে ধান্য খন্দ ও অন্যান্য বিবিধ শস্য সকল জন্মিয়া থাকে।

যে সকল ক্ষেত্রে কেবল মাত্র ধান্য জন্মে, তাহার ধান ও পোয়ালের ওজন পরিমাণ ১০।১২ দশ বার মণ; এবং যে সকল ক্ষেত্র এক মাত্র খন্দ ভিন্ন আর কিছুই উৎপন্ন হয় না, তাহার ভুমিসমেত খন্দের ওজন পরিমাণ ছয় মণ হইতে বার মণ পর্য্যন্ত হওয়া সম্ভব। আর যে সকল ক্ষেত্রে ধান্য-খন্দ ও অন্যান্য শস্যাদি জন্মিয়া থাকে, তাহাদের ওজন পরিমাণ বিশ মণ অথবা ষোল মণের কম নহে। এখন কৃষকের ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য, বিবিধ শস্যের আকর্ষণে প্রতি বৎসর বিবিধ পদার্থ সংযুক্ত সতেজ মৃত্তিকা কি পরিমাণে কৃষি-ক্ষেত্র হইতে উঠিয়া গিয়া থাকে। প্রতিবৎসর এইরূপ প্রভূত পরিমাণ সতেজ মৃত্তিকা ক্ষেত্র হইতে অন্তর্হিত হইলে সে ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি কিরূপে বজায় থাকিতে পারে। কেবল মাত্র চাষ দিয়া বা একটু লবণ সোরা দিয়া এ ক্ষতি পূরণ হওয়া কিছুতেই সম্ভব নহে।

ভবিষ্যতের জন্য যদি ক্ষেত্রের উপস্বত্ব ভোগ করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে প্রতি বৎসর বিবিধ শস্যের আকর্ষণে ক্ষেত্রের কি পরিমাণ ক্ষতি হইতেছে, তাহা নিশ্চয় করিয়া সার মাটির দ্বারায় ঐ ক্ষতি পূরণ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। যে কৃষক এবিষয়ে দৃষ্টি না রাখিবেন এবং ক্ষেত্রের ক্ষতি পূরণ করিয়া না দিবেন, তাঁহাকে কিছুদিন পরে কৃষিকার্য্যের ফল ভোগে বঞ্চিত হইতে হইবে।

তবে উঠিত পতিত নিয়মে আবাদ করা অথবা পলি পড়া ক্ষেত্র সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কথা।

উঠিত পতিত নিয়মে যে সকল ক্ষেত্র আবাদ করা হয়, তাহাতে সার দেওয়ার নিষেধ নাই। পলিপড়া জমিতে শস্যের আকর্ষণে যে ক্ষতি হইয়া থাকে, পলির দ্বারা তাহার সমুদয় অংশ পূরণ হইয়াছে কি না, ঐ বিষয়ের তদন্ত ও ক্ষতি পূরণ করিয়া দেওয়া প্রত্যেক কৃষকেরই একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়। প্রতি বৎসর সার মাটির দ্বারায় ক্ষেত্রের ক্ষতি পূরণ করিয়া দিলে, ভারতের ভূমি কখন অনুর্ব্বরা হইবে বলিয়া আশঙ্কা থাকিবে না।

এক্ষণে রসায়নবিদ্ পণ্ডিতেরা নিরূপণ করিয়াছেন যে, গমের চারা অৰ্দ্ধ হস্ত পরিমিত বাড়িয়া উঠিলে, তাহাতে বিঘা প্রতি ১/০ এক মণ হারে সোরা দিয়া দুই চারি দিনের মধ্যে জল সেচন করিয়া দিলে গম অতি উৎকৃষ্ট রূপ জন্মাইতে পারে। এবং ধান্যের গাছ উর্দ্ধে তিন পোয়া বা এক হাত আন্দাজ হইয়া উঠিলে প্রতি বিঘায় ১/০ এক মণ হিসাবে লবণ গুড়া ছড়াইয়া দিলে ধান লুড়াইয়া যায় না।

রসায়ন-বিদ্ পণ্ডিতেরা যাহাই বলুন, লবণ সোরা ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রের উপযোগী সার নহে। কারণ সেই রসায়ন-বিদ্ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃকই স্থিরী-কৃত হইয়াছে যে, লবণাদি গলনশীল পদার্থের আধিক্য হইলে ভূমি অনুর্ব্বরা হইয়া থাকে। বাস্তবিক ইহা মিথ্যা নহে। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, এ দেশের যে মাটিতে অধিক পরিমাণে যবক্ষার জান মিশ্রিত থাকে, তাহাতে ধান্য, খন্দ, হরিদ্রা, ইক্ষু প্রভৃতি কোন শস্যই উৎকৃষ্ট রূপ জন্মে না। অধিক কাল ব্যাপিয়া ক্ষেত্রে লবণ সোরা দিতে হইলে, যদি লবণত্বের পরিমাণ বেশী হইয়া যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে ক্ষেত্র অনুর্ব্বরা হইয়া উঠিবে তাহার সন্দেহ নাই। তবে কখন কখন অল্প মাত্রায় ক্ষেত্রে লবণ সোরা দিলে, তাহাতে তত অনিষ্ট না হইতে পারে। কিন্তু অন্যান্য পুস্তক সকলে পাঠ করা গিয়াছে যে, অতিশয় লবণময় প্রদেশে বা লবণ ক্ষেত্রে কোন উদ্ভিদাদি জন্মে না।

অপর কোন কোন কৃষি-বিদ্ পণ্ডিতের মতে জল সর্ব্বোৎকৃষ্ট সার বলিয়া প্রশংসিত। কিন্তু জলে মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়

না। জল ঐ শক্তির প্রকাশক মাত্র। জলাভাবে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি একেবারে নিরোধ হইয়া থাকে। দেখা গিয়াছে একাদিক্রমে বহুদিন পর্য্যন্ত বিবিধ শস্য প্রসব করিয়া যে সকল ক্ষেত্র নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে, তাহাতে অন্যবিধ সার প্রদান করিলে পুনশ্চ যেমন উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়, পলিমাটি প্রভৃতি কোন বিশেষ বিশেষ পদার্থের সংযোগ ব্যতিরেকে কেবল মাত্র বিশুদ্ধ জলে কদাচই সেরূপ হয় না। লালচিটা জমিতে পুনঃ পুনঃ জল পূর্ণ করিয়া ঐ জল মাসাবধি বদ্ধ করিয়া রাখিলেও তাহার উৎপাদিকা শক্তি কিছু মাত্র উন্নতি লাভ করে না। জল পরিশুষ্ক হইলেই আবার ঐ ক্ষেত্রের পূর্ব্ববৎ শক্তিহীনতা প্রতীয়মান হয়। এমন কি, যে বৃষ্টি বারিতে নানাবিধ পদার্থ মিশ্রিত থাকে ও যে কূপোদক যবক্ষার জান প্রভৃতির আকর স্থান, তাহাতেও লালচিটা মারা জমির শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারে না। সুতরাং এতদ্ গ্রন্থের মতে জল সার বলিয়া পরিগণিত নহে।

পলিমিশ্রিত বন্যার জল ভিন্ন যদি অন্য কোন জল দ্বারা ভূমির শক্তি বৃদ্ধি হইত, তাহা হইলে কোন কৃষিক্ষেত্রে সার দিবার আবশ্যক করিত না। পশ্চিম প্রদেশে ইন্দারার জলে কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, বঙ্গদেশে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি বারি পতিত হইয়া থাকে, কৈ তদ্বারাত ভূশক্তির কিছু মাত্র ক্ষতি পূরণ হইতে দেখা যায় না। বিশেষত পরীক্ষার দ্বারা নিশ্চয় হইয়াছে যে, অনবরত খালের জল সেচনের দ্বারা কৃষিকার্য্য করিতে হইলে, ভূমি অনুর্ব্বরা হইয়া যায়। যাঁহাদের মতে নয় ভাগ জলে এক ভাগ উদজান ও আটভাগ অম্লজান আছে বলিয়া জল সর্ব্বোৎকৃষ্ট সার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, তাঁহাদের মত নিতান্ত অভ্রান্ত বলিয়া বোধ হয় না।

যাহা হউক, জলের সহিত উদ্ভিদ্ পদার্থের যে সম্বন্ধ, সারের সহিত সে সম্বন্ধ নহে। যেমন তেমন জমিতে সার ব্যতীত বৃক্ষ সকল, সবল হউক, আর দুর্ব্বল হউক, উৎপন্ন হইতে পারে এবং অধিক বা অল্প পরিমাণে শস্য প্রসব করিতেও সক্ষম হয়। জলাভাবে উদ্ভিদ্ পদার্থের উৎপত্তিই সম্ভবে না। মৃত্তিকা সহস্র উর্ব্বরা হইলেও, জলাভাবে সে উর্ব্বরত্ব কোন কার্য্যে আইসে না।

এবং সারের মধ্যে প্রভূত পরিমাণে যে উৎপাদিকা শক্তির অবস্থিতির কথা বর্ণনা করা হইয়াছে, বিনাজলে সে শক্তির স্ফুরণ হইতে পারে না। এস্থলে বসুমতী মাতা, জল পিতা, তাপ পরিবর্দ্ধক, ও বায়ু জীবন স্বরূপ বলিতে হইবে। এই চতুর্ব্বিধ পদার্থের যোগ সামঞ্জস্য প্রযুক্ত যে প্রক্রিয়া হইয়া থাকে, তাহারই নাম উৎপাদিকা শক্তি। ঐ শক্তির যাহাতে অধিক পরিমাণে অবস্থিতি, তাহাকেই সার বলে। বস্তুতঃ জল সার বলিয়া পরিগণিত নহে।

সৃষ্টিতত্ত্বে, আকাশ, বায়ু, তাপ, জল, ও মৃত্তিকা, ইহাদের সকলেরই সমান উপযোগিতা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পৃথিবীর সর্ব্বত্র মৃত্তিকা, তাপ, বায়ু ইহাদের পরস্পর যেমন সংযোগ রহিয়াছে, (পৃথিবীর এক ভাগ মাত্র স্থল ও তিন ভাগ জল হইলেও) সেরূপ সর্ব্বত্রে জলের যোগ বর্ত্তমান নাই। কিন্তু উদ্ভিদ্ পদার্থের উৎপত্তি ও তাহার সম্পূর্ণ অবয়ব প্রাপ্তি সম্বন্ধে যেমন অংশমত মৃত্তিকা, তাপ, ও বায়ুর প্রয়োজন, সেইরূপ সর্ব্বদা উপযুক্তরূপ জলেরও আবশ্যক হয়। জলাংশের অভাব অথবা ন্যূনতা ঘটিলে, কোন বস্তুর উৎপত্তি ও পুষ্টিসাধন হইতে পারে না। এবং জলের অভাবে কি উদ্ভিজ্জ, কি প্রাণী, কেহই জীবিত থাকা সম্ভব নহে।

জলের অভাব প্রযুক্ত পৃথিবীর কোন কোন অংশ মরুভূমি হইয়া রহিয়াছে, আর কোন অংশে নদীর দ্বারা ও কোন অংশে বৃষ্টির দ্বারায় জল সংস্থান হইয়া ফুল ফলে সুশোভিত বিবিধ উদ্ভিজ্জ শ্রেণীর উৎপত্তি করিয়াছে। যে দেশে নদী জলের সাহায্যে শস্যোৎপাদন হয়, তাহাকে "নদীমাতৃক" দেশ বলে। আর যে দেশের শস্য সকল বৃষ্টির জলে উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই দেশ "দেবমাতৃক" শব্দে কথিত হয়। দেবমাতৃক দেশে প্রকৃতি দেবী সানুকূল হইয়া জল সংযোগের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া থাকেন। যদি কখন প্রয়োজন সত্বে তিনি তৎকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন, তবে কৃষককে সেচনের দ্বারায় জল সংযোগ করিয়া দিতে হইবে। জলের অল্পতা বা অভাব হইলে, কৃষিকার্য্যে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা নাই। জল সেচনের বিষয় কৃষি অনুষ্ঠানে লিখিত হইবে।

কৃষি—অনুষ্ঠান।

ভূমণ্ডলে স্বভাবতঃ নানা জাতীয় উদ্ভিজ্জ পদার্থ জন্মিয়া থাকে। আমরা প্রত্যহ অন্ন, রুটি, দাইল, চিনি, এবং যে সমস্ত ফল, মূল, শাক, শবজি, ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করি, সমুদয়ই ঐ উদ্ভিদ্ পদার্থের সম্পত্তি। এবং সুতার কাপড় ও পট্ট বস্ত্র যাহা ব্যবহার করি, তাহাও কোন উদ্ভিদ্ বিশেষ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। নয়ন-প্রীতিপ্রদ নীল, পীত, লোহিতাদি বর্ণ সকলও বিবিধ উদ্ভিদ্ পদার্থ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু স্বভাবোৎপন্ন উদ্ভিদ্ হইতে অর্থাৎ আপনাআপনি ভূমণ্ডলে যে পরিমাণ উদ্ভিদ্ পদার্থ জন্মে, তাহাতে সভ্য সমাজের সাংসারিক ব্যয় সঙ্কুলান হইয়া উঠে না সুতরাং তাহাদের বাহুল্যরূপে বিস্তার ও উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত, মনুষ্যসকলকে শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক কৃষি-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। কৃষি-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া যে সকল কার্য্য করা যায়, তাহাকে কৃষি অনুষ্ঠান বলে। সংক্ষেপে ক্রমশঃ কৃষি অনুষ্ঠান প্রদর্শিত হইতেছে।

কৃষি কার্য্যের প্রধান সাধন হল প্রবাহ। এদেশে গবাদি পশুর দ্বারা হল প্রচালন হইয়া থাকে। ফলতঃ গবাদি পশু এদেশীয় কৃষকদিগের সর্ব্বস্ব ধন এবং আমাদের জীবন-রক্ষক ও অন্নদাতা বলিলেও অত্যুক্তি না হইয়া বরং সুসঙ্গতই হয়। বোধ হয়, প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ সেই জন্যই গো-জাতিকে দেবতা বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, এবং তাহার অপালনের নিমিত্ত নরকের ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে এ দেশের সর্ব্বত্র যে প্রণালীতে কৃষি কার্য্য চলিতেছে, তাহা দেখিয়া আমুক্ত কণ্ঠে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, গবাদি পশুই উহার মূলাধার। অতএব অতি যত্নের সহিত গবাদি পশুর রক্ষণাবেক্ষণ করা একান্ত কর্ত্তব্য এবং গো-বংশের উন্নতির প্রতি সকলেরই দৃষ্টি রাখা নিতান্ত আবশ্যক। মনুষ্যের এরূপ মহদুপকারী পশু জগতে আর দ্বিতীয় নাই। পুং গোরুর শ্রমার্জ্জিত শস্যাদি ভক্ষণ করিয়া মানব-দেহ পরিবর্দ্ধিত ও রক্ষিত হইতেছে। এবং জন্মের পর দুই বৎসর কাল মাত্র আমরা জননীর স্তনপান করিয়া থাকি; কিন্তু গাভীর দুগ্ধ যাবজ্জীবনের জন্য পান করিতে বিরত নহি। যিনি ঐ পিতৃমাতৃতুল্য

পশুর প্রতি নির্দ্দয় হইয়া, কোনরূপ অত্যাচার করেন বা তাহাদের জীবনের উপর আঘাত করিতে পারেন, তাঁহার হৃদয় পাষাণ হইতেও পাষাণতর (১)।

গোপালন।

গবাদি পশু সকল তৃণ মাত্র ভক্ষণ করিয়া মনুষ্যের উপকার করে। অতএব তাহারা যাহাতে সুখসচ্ছন্দতার সহিত আহার করিয়া জীবন যাত্রা অতিবাহিত করিতে পারে, তদ্বিষয়ে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা ও একান্ত যত্নশীল হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। গো সকল বিচরণ করিয়া আসিলে, সন্ধ্যাকালে এবং অতি

(১) মুসলমান ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায় গোহত্যাকে তাদৃশ দোষাবহ জ্ঞান করেন না। তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র কোরাণ ও বাইবেলে গোমাংস ভক্ষণের নিষেধ নাই। তজ্জন্য তাঁহারা ইচ্ছানুসারে গোহত্যা ও গোমাংস ভক্ষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু একবার বিবেচনা করিয়া দেখেন না যে, যে শাস্ত্রে গোমাংস ভক্ষণের নিষেধ নাই, তাহা ভারতবর্ষের ধর্ম্মশাস্ত্র নহে।

আরব ও সিরিয়া প্রদেশে ঐ শাস্ত্রদ্বয়ের প্রথম প্রচার হয়। তদ্দেশের গাভী সকল অল্প দুগ্ধবতী, এবং পূর্ব্বকালে ঐ প্রদেশদ্বয়ে কৃষি কার্য্যের প্রচার না থাকায় (এখনই কোন্ বেশী আছে) বলীবর্দ্দেরও তাদৃশ সমাদরের প্রয়োজন হয় নাই। সুতরাং কোরাণ ও বাইবেলের মতে, গো-পশু আদরের ধন বলিয়া পরিগণিত নহে। কিন্তু এক্ষণে ভারতবর্ষে সে বিধি খাটিতে পারে না। গোধন না থাকিলে ভারতবাসী জনগণের জীবন রক্ষা পায় না। ইদানীং মুসলমান ও খৃষ্টানেরা ভারতবর্ষের অধিবাসী হইয়াছেন। হিন্দুদিগের অনুকরণে গোহত্যা হইতে বিরত থাকা তাঁহাদের একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, মুসলমান ও খ্রীষ্টান মহোদয়েরা তাহার বিপরীত কাণ্ড করিয়া থাকেন। তাঁহারা মহানন্দে গো পশুর দুগ্ধপান ও শ্রমার্জ্জিত শস্য ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিবেন এবং পরিণামে তাহার মাংস ভক্ষণ না করিয়া ক্ষান্ত হইবেন না। অধুনা ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু ইহা আমুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে, ভারতবর্ষবাসী হইয়া গোহত্যা করা ন্যায়পরতা বৃত্তির কার্য্য নহে। ভারতবাসী হইয়া যিনি গোহত্যা ও গোমাংস ভক্ষণ করিয়া থাকেন, তাঁহার যে অত্যন্ত কৃতঘ্নতা প্রকাশ পায়, ইহা বোধ হয় সর্ব্ববাদী-সম্মত।

এক্ষণে মহানগরী কলিকাতা প্রভৃতি অন্যান্য নগর সমূহে বৎসর বৎসর যে পরিমাণে গোহত্যা হইতেছে, তাহাতে আর ভারতবর্ষের মঙ্গল নাই। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ,

প্রত্যহে পোয়াল, বিচালি, ও ভুষি ইত্যাদি, খৈল ও জল সংযোগে ছানি (জাব) প্রস্তুত করিয়া খাইতে দিতে হয়। প্রত্যহ যথেষ্ট পরিমাণে কাঁচা ঘাস ও মধ্যে মধ্যে ছোলা, মটর, যব প্রভৃতি শস্য সকল সিদ্ধ করিয়া খাওয়ান কর্ত্তব্য। ভাতের মাড় ও চেলুনী জল গোরুর পক্ষে বিশেষ উপকারী। যত্ন করিয়া তাহা প্রত্যহ দেওয়া যাইতে পারে। এইরূপ সেবা যদি প্রত্যহ করা যায়, তাহা হইলে গোরু সকল হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া উঠে ও বলবান হয়।

গবাদি পশু সকলকে রাত্রে আহার দিলে বেশী উপকার সম্ভবে। কৃষকেরা কহে "রাতের আলা, দিনের পালা"। আলা শব্দের অর্থ অল্প, আর পালা শব্দের অর্থ অধিক। দিবসে অধিক পরিমাণে আহার দিলে যে ফল হয়, রাত্রিতে অল্প আহার দিলেই সেই ফল ফলিয়া থাকে। এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, গবাদি পশু দিবসে যতই কেন আহার করুক না, রাত্রে তাহাদিগকে কিছু খাইতে দেওয়া আবশ্যক। রাত্রিতে উপবাসে গবাদি পশু সকল অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া যায়। অতএব তাহাদিগকে রাত্রোপ-

---

গোরক্তে প্লাবিত হইয়া যাইতেছে। অহরহঃ কষাইটোলায় যে হত্যাকাণ্ড ঘটিতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। আমাদের গভর্ণমেণ্ট ও দেশ-হিতৈষী মহাত্মাগণ স্বচক্ষে দেখিয়া শুনিয়াও তন্নিবারণ পক্ষে কি জন্য মনোযোগ করেন না বুঝিতে পারা যায় না।

সম্প্রতি এই দেবতুল্য মহদুপকারী পশুর জীবনের উপর নানা প্রকার বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। বিনা চিকিৎসায় বসন্ত ও পশ্চিমা প্রভৃতি রোগে অনেক গোরুর মৃত্যু হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন কষাইদারদিগের হস্তে বার্ষিক বিস্তর গোরুর অপমৃত্যু হইতে দেখা যায়। আবার মধ্যে মধ্যে চর্ম্মকারেরা বিষ খাওয়াইয়া অনেক গোরু মারিয়া ফেলে। এ দেশে গোরু মরিলে তাহার চামড়া চর্ম্মকার জাতিতে খুলিয়া লয়। যে সময় গো-জীবনের উপর কোন আপদ না থাকে, সেই সময় তাহাদের ব্যবসা মন্দীভূত হইয়া পড়ে। তখন চর্ম্মকারেরা খটিদার-দিগের নিকট হইতে এক প্রকার বিষ ক্রয় করিয়া লইয়া আইসে এবং তাহা কদলী পত্রে মাখা-ইয়া রাস্তায় রাখিয়া দেয়। মধ্যে কদলীপত্র লইয়া অনেক ধরাধর হওয়াতে শুনা যায় যে, বিষ খাওয়ান পূর্ব্ব হইতে এক্ষণে কিছু কম পড়িয়াছে। আর এক প্রকার বিষ চুল জড়াইয়া গুটি প্রস্তুত করিয়া রাখে। ক্ষুদ্র পাচনীর (বাঁশের বাকারি) দ্বারা গোরুর গুহ্যদেশে তাহা প্রবেশ করাইয়া দেয়। গুটিবিষ দেওয়ার ক্ষণকাল পরেই গোরুর মৃত্যু হয়। চামড়া খুলিবার সময় চর্ম্মকারেরা পুনর্ব্বার বিষের গুটি হস্তগত করিয়া লয়। মেহেরপুর সবডিবিজানের এলাকাধীন তারা নগর গ্রামে নেপাল মণ্ডল নামক জনৈক কৃষকের চেষ্টা ও অনুসন্ধানের

খাদী রাখা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। আর বসন্ত ঋতুর সময়ে এক প্রহর রাত্রি থাকিতে গবাদি পশু সকলকে মাঠে চরাইয়া নীহারযুক্ত ঘাস খাওয়াইলে, তাহাদের পক্ষে বড়ই স্বাস্থ্যকর হয়। চাষারা ইহাকে "ওয়ার" খাওয়ান বলে।

আর চাষারা কহে, "যা করে না ঘাসে, তা করে পাশে"। বাস্তবিক গবাদি পশু সকল বিচরণ করিয়া আসার পর, বিশ্রামের স্থান কদর্য্য হইলে, তাহাদের কষ্টের একশেষ হইয়া থাকে। সামান্য পশু জাতি বলিয়া তাচ্ছিল্য

দ্বারা একবার এই শুটিবিষ ধরা পড়িয়াছিল। গোরুর পেটে বিষ প্রবেশ করিলে পশ্চিমা রোগের ন্যায় বাহ্য লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়।

একদিকে বিবিধ পীড়া, অন্যদিকে কসাইদার, মধ্যস্থলে চর্ম্মকারগণ—এক কালে গোবংশ ত্রিপুষ্করা প্রাপ্ত হইয়াছে। সত্বরে এ পুষ্করার শান্তি না হইলে, স্বর্ণভূমি ভারতবর্ষ হলচালনা-ভাবে কালক্রমে হয়ত অরণ্যময় হইয়া উঠিবে। এবং দধি, দুগ্ধ, ঘৃত ইত্যাদির অভাবে কচু ঘেচু, শাক, কুমড়া ইত্যাদি পদার্থ সকল হিন্দু সন্তানগণের প্রধান খাদ্য হইয়া দাঁড়াইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

চর্ম্মকার জাতি ভিন্ন হিন্দুবংশ মাত্রে গোরক্ষার্থ সর্ব্বদা যত্নশীল এবং তাহার প্রতিপালনে অতিশয় অনুরক্ত ও পারদর্শী। হিন্দু সন্তানেরা মনুষ্য জীবন অপেক্ষা গোজীবন অধিক সমাদরের ধন ও পূজনীয় বিবেচনা করেন। অধুনা মুসলমান ও খৃষ্টান সম্প্রদায়, হিন্দু জাতির ন্যায় গোজীবন রক্ষার্থে যত্নশীল হইলে, যারপরনাই ভারতবর্ষের হিত সাধন করা হয়, অথচ তাঁহাদের আহার বিহারের কিছু মাত্র হানি হয় না। এ দেশে নানা জাতীয় শস্য, ফল, মূল, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মাখম, এবং মৎস্য, ছাগ, মেষ ও কুক্কুট প্রভৃতি নানাবিধ মাংস, প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বে, গো হত্যা করিবার আবশ্যক কি বুঝা যায় না। আর এক কথা, গোমাংস অত্যন্ত গুরুপাক দ্রব্য; তাহা গ্রীষ্মপ্রধান ভারতবর্ষের উপযোগী আহার নহে। শাস্ত্রের দোহাই দিয়া অস্বাস্থ্যকর আহার বা কোন অবৈধ কার্য্য করা কখনই উচিত হয় না। প্রাচীন আর্য্য শাস্ত্রে দৃষ্টি করিয়া বোধ হয় যেন, কোন এক সময়ে আর্য্য সমাজেও গোমাংস ভক্ষণ প্রথা প্রচলিত ছিল। তাহার পর গো জাতির উপকারিতা দেখিয়া, পরবর্ত্তী শাস্ত্রে তাহা নিষেধ হইয়াছে। বাস্তবিক দেশ, কাল, পাত্র ভেদে শাস্ত্রোক্ত আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন আবশ্যক। ইহাকেই সমাজ সংস্কার কহে। কিন্তু এক মাত্র হিন্দু সমাজ ভিন্ন এরূপ সংস্কার আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। এক্ষণে মুসলমান ও খ্রীষ্টান মহোদয়েরা গোহত্যা ও গোমাংস ভক্ষণ প্রথাটা পরিবর্ত্তন করিলে ভাল হয় না কি? অসভ্যাবস্থায় মাংসই মনুষ্যের প্রধান আহার। আজ ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্য জগতেও সেইরূপ মাংসপ্প হাটা ভাল দেখায় কি?

করা উচিত নহে। তাহাদের বিশ্রাম স্থান সর্ব্বতোভাবে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত। গবাদি পশু সকল শয়ন করিলে যাহাতে পরস্পর গাত্র স্পর্শ না হয়, গোশালা এরূপ পরিসর হওয়া আবশ্যক করে। এ দেশে গোশালায় বাতায়ন রাখিবার রীতি নাই; ইহা বড়ই অবৈধ কর্ম্ম। বাতায়ন অভাবে, গো-গৃহের বায়ু পরিবর্ত্তন হইতে পায় না। পরস্পর নিশ্বাস প্রশ্বাসে ও বাষ্প মিশ্রিত দূষিত বায়ুর আঘ্রাণে, গোরু সকলের নানা প্রকার পীড়া জন্মাইবার সম্ভাবনা। অতএব গোশালার চতুর্দ্দিকে, সম সূত্রপাতে জানালা রাখা একান্ত কর্ত্তব্য।

গোময় ও গোমূত্র গোশালার নিতান্ত নিকটে রাখা উচিত নহে। এবং ঘুটে ভস্ম দ্বারা, গো গৃহ উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এ দেশের গোয়ালারা রাত্রিযোগে দুইবার গোয়াল পরিষ্কার করিয়া দেয়; এ রীতি অতীব প্রশংসনীয়। শীত নিবারণের জন্য গোশালার দ্বারে একটি অগ্নি-কুণ্ড করিয়া দিতে হয়, এবং একমাত্র গ্রীষ্ম কাল ভিন্ন, অন্যান্য ঋতুতেও মশক, দংশক, দূরীকরণের নিমিত্ত, ঘশির গুড়ার একটি সাঁজাল দেওয়া আবশ্যক হয়। কিন্তু তৎসঙ্গে কিঞ্চিৎ ধূনা মিশ্রিত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ধূনায় গোগাত্রের "এঁটুলি" (১) ও "কুকুর মাছি"। (২) সকল দূরীভূত হইয়া যায় এবং স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে বিশেষ উপকার করে।

শীতকালে গো-শৃঙ্গে তৈল ম্রক্ষণ করিয়া দিলে শীত খুব কম লাগে। কিন্তু বার মাস যদি গোরুর শৃঙ্গে সরিষার তৈল দেওয়া যায়, তবে তাহাদের শরীর বড় সুস্থ থাকে। বর্ষা ঋতু ভিন্ন অন্যান্য ঋতুতে অষ্টাহ অন্তর গবাদি পশুগণের গাত্র ধৌত করিয়া দিতে হয়। এবং প্রত্যহ গো গাত্রের এঁটুলি বাছিয়া দেওয়া উচিত। বর্ষাকালেও তাহাদের গা ধোয়াইয়া দিলে উপকার ভিন্ন অপকার নাই।

এ দেশে গোরু সকল পীড়িত হইলে, তাহাদিগকে পৃথক স্থানে রাখিবার ব্যবস্থা করা হয় না। ঐ সকল পীড়িত গোরু, পালের সঙ্গে একত্রেই রাখিয়া দেওয়া হয়। তজ্জন্য ছোয়াচে রোগ সকল সংক্রামক হইয়া মহামারী উপ-স্থিত করে। যে গ্রামে বসন্ত রোগের আবির্ভাব হয়, সে গ্রামের গোরু সকল

(১) এক প্রকার কীট বিশেষ। (২) প্রকার মক্ষিকা বিশেষ।

মরিয়া উজার হইয়া যায়। দৈবাৎ যদি কোন গোরুর পায়ের খুরে রোগ (বাদল খোঁড়া, ইহাকে হামজর বলিলে বলা যাইতে পারে) জন্মায়, তবে আর সে গ্রামের একটি গোরুও ঐ রোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় না। এইরূপ পশ্চিমা প্রভৃতি রোগ সকল সংক্রামক হইয়া গ্রামকে গ্রাম, কখন বা এক একটা প্রদেশ লইয়া, মহামারী উপস্থিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এ দেশের গোস্বামীরা ইহা নিবারণের কোনরূপ উপায় করিতে পারেন না। গবাদি পশু পীড়িত হইলে তাহার চিকিৎসা ত সুচারু মত হয়ই না, (১) আবার কোন নিয়মের অধীনেও রাখা হয় না; ইহা বড়ই অবৈধ কার্য্য।

রুগ্ন গোরু সকল, পালের সঙ্গে না রাখিয়া, ও মাঠে ঘাটে যাইতে না দিয়া, কোন নিভৃত স্থানে পৃথক করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। কিন্তু পীড়িত পশু সকল স্বতন্ত্ররূপে রাখিবার জন্য, এ দেশের কোথায়ও অদ্যাপি রুগ্নপশু-শালা প্রস্তুত করা হয় নাই। প্রত্যেক গ্রামের প্রান্তভাগে এক একটি রুগ্নপশু-শালা নির্ম্মাণ করিয়া রাখা গ্রামস্থ কৃষকদিগের কাজ কর্ত্তব্য। প্রত্যেক পশুশালার মধ্যে, প্রথমরোগাক্রান্ত পশুদিগের থাকিবার জন্য ও আরোগ্যোন্মুখ পশু-গণের বাসের নিমিত্ত, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা উচিত।

গ্রামস্থ কোন গৃহস্থের গবাদি পশু রুগ্ন হইবামাত্র, তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে ঐ রুগ্নপশুশালায় লইয়া গিয়া, তথায় রাখিয়া সেবা শুশ্রূষা ও চিকিৎসাদি করান উচিত। যে পর্য্যন্ত পীড়িত পশু সকল আরোগ্য লাভ না করে, তদবধি রুগ্নশালা হইতে তাহাদিগকে গৃহস্থের বাড়ী লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। কোন সুস্থ গোরু বা গোরুর পাল রুগ্নশালার নিকটে যাইতে দেওয়া না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ রূপে সকলেরই সতর্ক হওয়া বিধেয়।

সকল পীড়িত পশুই যে আরোগ্য লাভ করিবে, এরূপ ভরসা নাই। অতএব সংক্রামক রোগে মৃত পশুগণকে ভূগর্ভে নিহিত করা একান্ত আব-

(১) পূর্ব্বদেশে এক সম্প্রদায় গো-চিকিৎসক আছে। তাহারা বৎসরান্তর শীতকালে গো-চিকিৎসার জন্য নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। তাহাদের চিকিৎসা প্রণালী মন্দ নহে। তাহারা গোরু দেখিবামাত্র সমস্ত রোগের কথা বাচনিক বলিয়া পরে তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দেয়। তাহাদের ঔষধিতে গোরু সকল প্রায়ই রোগ হইতে আরোগ্যলাভ করে। দুঃখের বিষয় এই যে, তাহারা আমাদিগকে শিক্ষা দিতে চায় না।

শ্যক (১)। নতুবা যথা তথা নিক্ষেপ করিলে, রোগ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়া সম্ভব।

বলিবর্দ্দের বয়ঃক্রম তিন বৎসর পূর্ণ হইলেই, এ দেশের কৃষকেরা তাহাকে লাঙ্গলা করিয়া থাকে। যদিও প্রথম গোরুকে প্রথম বৎসরে পুরা পরিশ্রম করান হয় না বটে, কিন্তু তথাপিও ঐ নিয়মটী প্রশংসনীয় নহে। চতুর্থ বৎসর বয়সে গোরুকে লাঙ্গল বহন শিখাইয়া, পঞ্চম বৎসরে তাহাকে পুরা পরিশ্রম করাইলে, তত দোষের হয় না (২)।

মহিষকুল গো শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বিবেচনায়, অনেক স্থলে গবাদি পশু বলিয়া উল্লেখ করা গিয়াছে। বাস্তবিক মহিষ জাতিও গো সদৃশ, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু শাস্ত্রকারেরা তাহাদের মাহাত্ম্য কিছুই বর্ণনা করেন নাই, বরং অসুর বংশ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বোধ হয়, প্রাচীন কালে মহিষ জাতি আরণ্য জন্তুর মধ্যে পরিগণিত ছিল। তাহাদের দ্বারা মনুষ্য সমাজের কোন উপকারের প্রত্যাশা ছিল না। সুতরাং হিংস্রক

---

(১) এ দেশে মৃত গোরুর চর্ম্ম সকল চর্ম্মকার জাতিতে লইয়া থাকে। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কোন গৃহস্থই চর্ম্মকারের নিকট হইতে চর্ম্ম বা তাহার মূল্য স্বরূপ কিছুই গ্রহণ করেন না। সেস্থলে এরূপ নিয়ম করা অন্যায় হয় না যে, যে চর্ম্মকার গোচর্ম্ম লইবে, তাহাকেই সংক্রামক রোগে মৃত পশুর দেহ ভূগর্ভে পুতিয়া দিতে হইবে। ঐ সকল নিয়ম যাহাতে সুন্দররূপে প্রতিপালিত হয়, সে পক্ষে রাজ্যেশ্বরের ও সাধারণ প্রজামণ্ডলীর দৃষ্টি রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাতে তাচ্ছিল্য করিলে ক্রমে দেশের যে মহদনিষ্ট সংঘটন হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

(২) এদেশের গো জাতি অত্যন্ত থর্ব্বকায়। বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশের গোরু সকল এরূপ ক্ষুদ্রকলেবর ও দুর্ব্বল হইয়াছে যে, অন্য দেশের তুলনায় তাহাদিগকে গোরু বলিয়াই বোধ হয় না। আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি, বাঙ্গালা দেশজাত গোরু সকল এরূপ থর্ব্বকায় ছিল না। বিগত পঁচিশ ত্রিশ বৎসরের মধ্যে এরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে। একণে এ দেশের গোরু সকল এত ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাদের দ্বারা বিলাতি নূতন ধরণের লাঙ্গল বহন করাত দূরের কথা, কৃষি-পরাশরে ফাল ও লাঙ্গলের যেরূপ আকৃতির উল্লেখ আছে, সেরূপ লাঙ্গলও বহন করিতে তাহারা সক্ষম হয় না। অগত্যা এ দেশের ফাল ও লাঙ্গলের অবয়ব অত্যন্ত ক্ষুদ্র করা হইয়া থাকে। ইহাতে কৃষিকার্য্যের বিলক্ষণ অবনতি হইয়াছে। একণে গোবংশের যাহাতে উন্নতি হয়, তাহাতে সকলেরই বিশেষরূপে যত্নবান হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

জন্তু বিবেচনায় তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত শাস্ত্র প্রসঙ্গে কোন কথাই উত্থাপিত হয় নাই। অধুনা মহিষের দ্বারা গোসদৃশ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। সংপ্রতি আমরা মহিষের দ্বারা হল প্রচালন ও মহিষীর দুগ্ধপান

কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এ দেশের দুর্ব্বল গোবংশ হইতে হৃষ্ট পুষ্ট বৃহৎকায় বলবান্ গরু উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু এরূপ অনুমান নিতান্ত ভ্রমাত্মক বলিতে হইবে। ইহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন, শ্রাদ্ধকালে যে সকল বৃষ দাগিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহারা বাল্যকাল হইতে যথেচ্ছ আহার বিহার করিয়া তিন চারি বৎসরের মধ্যে ঠিক আরণ্য গরুর ন্যায় প্রকাণ্ড শরীর ও বলবান্ হইয়া উঠে। সুতরাং বিশেষ যত্ন করিলে, কেনই বা অন্যান্য গরু সকল সেরূপ উন্নত না হইবে। এক পুরুষে তিন চারি বৎসরের মধ্যে যখন এইরূপ কাণ্ড দেখা যাইতেছে, তখন ক্রমান্বয়ে যদি দুই তিন পুরুষ ধরিয়া বিশেষরূপে যত্ন করা যায়, তাহা হইলে এই দুর্ব্বল গোবংশ হইতেই প্রকাণ্ড-কায় বলবান্ গরু সকল উৎপন্ন হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

হিন্দু শাস্ত্র মতে শ্রাদ্ধকালে ষাঁড় দাগিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। আবার অনেক সময় গৃহস্থেরা ৺কালীর নামে ও মাণিক পীরের নামেও ষাঁড় ছাড়িয়া দিয়া থাকে। এরূপ ষাঁড় ছাড়িয়া দেওয়ায় কি উপকার সম্ভবে, তাহা প্রাচীন আর্য্যগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যাহা হউক, এ দেশে যে পর্য্যন্ত খ্রীষ্ট ধর্ম্মের ও ফারাজি ধর্ম্মের প্রচার হয় নাই, সে পর্য্যন্ত ষাঁড়ের প্রতি কেহ কোন রূপ অত্যাচার করে নাই। তখন ষাঁড় সকল স্বাধীনভাবে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া বেড়াইত এবং এরূপ হৃষ্ট পুষ্ট নধর-শরীর হইয়া উঠিত যে, গুজরাটী হাতীর সহিত তাহাদের অধিক প্রভেদ লক্ষিত হইত না। কিন্তু এক্ষণ এদেশে আর অধিক ষাঁড়ের সংখ্যা দেখিতে পাওয়া যায় না। অধিকাংশ ষাঁড়ই গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া মিউনিসি-প্যালিটীর ময়লার গাড়িতে নিয়োজিত হইয়া থাকে। কতক বা সুযোগ মত দেশীয় খ্রীষ্টান ও ফারাজিরা উদরসাৎ করিয়া ফেলে। ইহাতে যে গো-বংশের কিরূপ অনিষ্ট হইয়াছে, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। ষাঁড়ের অভাব প্রযুক্ত, গো জাতির বংশবৃদ্ধি অনেকাংশে কমিয়া গিয়াছে। এবং অধিকাংশ স্থলেই হল-বাহক দুর্ব্বল বৃষের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়া গো সকল এক প্রকার ছাগলের আকার ধারণ করিয়াছে।

এই সকল কারণে, ষাঁড়ের উপর যাহাতে কেহ হস্তক্ষেপ করিতে না পারে এবং ষাঁড় সকল যাহাতে সুখ সচ্ছন্দতার সহিত যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারে, তৎপক্ষে সকলেরই যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। অর্ণা ষাঁড় ব্যতীত হলচালক বৃষের ঔরসে গো বংশের উন্নতি হওয়া সম্ভব নহে।

কেবল মাত্র অর্ণা বৃষের ঔরস গুণেই যে গোবংশের উন্নতি হইবে, এমন নহে। তাহা-দিগকে উপযুক্ত রূপে আহার দেওয়া আবশ্যক। আমি জানি, এ দেশের গরু সকল বাটী

করিয়া থাকি। উহাদিগকেও গোরুর তুল্য যত্ন করা ও গো-নির্বিশেষে পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। (১)

গো-যোজনা।

মনুসংহিতার মতে অষ্টগবে ও ষড়্গবে বাহিত লাঙ্গল অতি প্রশংসনীয়। চতুর্গব ও দ্বিগব যুক্ত লাঙ্গল নিকৃষ্ট বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু অষ্টগবে ও ষড়্গবে একখানি লাঙ্গল বহন করা তাদৃশ সুবিধাকর নহে। কারণ সামান্য গৃহস্থদিগের এক খানি লাঙ্গলে এক জন মাত্র কৃষাণ নিযুক্ত থাকে। এক জন কৃষাণের দ্বারা অত অধিক গরুর সেবা শুশ্রূষা ভালরূপ চলে না, এবং লাঙ্গল পরিচালনার সময় পুনঃ পুনঃ গো-সংযোজনা করিলেও অনেক কামাই হইয়া যায়। অতএব অষ্টগব ও ষড়্গব যুক্ত লাঙ্গল

মাস সমান ভাবে পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, অথচ তাহাদিগকে যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিতে হয়। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। আর কালক্রমে ইহার ফলও বড় মন্দ হইয়া উঠিয়াছে। গরু সকল এমন দুর্ব্বল হইয়াছে যে, দিনান্তে এক লাঙ্গলে এক বিঘা জমিরও চাষ সমাপ্ত হইয়া উঠে না। অতএব গরু সকল যাহাতে পেট ভরিয়া আহার পায়, তাহার উপায় বিধান করা প্রত্যেক গৃহস্থেরই কর্ত্তব্য।

(১) মহিষ দুই জাতি, অর্ণা ও বাঁওর। অর্ণা মহিষের স্ত্রীজাতি মনুষ্যের অনেক বশে আসিয়াছে। তথাপি সময়ে সময়ে তাহারা পথিকদিগকে আক্রমণ করে এবং অনেক সময় পালের রাখালকে মারিয়া ফেলে। নাতারের উপর না চড়িয়া রাখালেরা এই মহিষ চরাইতে সক্ষম হয় না। বাচ্চা বেলায় নাক ফোঁড়াইয়া যে সকল মহিষের উপর রাখালেরা চড়া অভ্যাস করে, তাহাদিগকে 'নাতার' বলে। রাখাল নাতারের উপর থাকিলে অন্য মহিষ কর্ত্তৃক তাহার বিপদের আশঙ্কা থাকে না। যাহা হউক, অর্ণা মহিষের স্ত্রী জাতি হইতে বিস্তর দুগ্ধ পাওয়া যায়। কিন্তু পুংজাতি অদ্যাপি অনুমাত্রও মনুষ্যের বশীভূত হয় নাই। তাহারা লাঙ্গলের ত্রিসীমা দিয়াও যায় না। তাহাদিগকে প্রায়ই পূজার সময় বলিদান করা হইয়া থাকে। বাঁওর মহিষ অত্যন্ত নিরীহ। স্ত্রী জাতি গাভীর ন্যায় দুগ্ধ দেয় ও পুংজাতি বলীবর্দ্দের ন্যায় হলপ্রচালন করিয়া থাকে। ইহাদিগকে মনুষ্যের প্রতি কোনরূপ আক্রমণ করিতে দেখা যায় না।

ধর্ম্মহান হইলেও তাহা সামান্য কৃষকদিগের পক্ষে শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হয় না। প্রচলিত কৃষিকার্য্যের নিয়মানুসারে চতুর্গব ও দ্বিগব যুক্ত লাঙ্গলই প্রশস্ত। কিন্তু দ্বিগব যুক্ত লাঙ্গলের বলদ দুইটি খুব বলবান্ না হইলে চলে না। দুইটি সামান্য গরুর দ্বারা একখানি লাঙ্গল বহন করান যাইতে পারে না। চারিটী বলদ হইলেও তাহাদের মধ্যে দুইটি ভাল ও দুইটি মন্দ থাকিলেও কষ্টে সৃষ্টে একরূপ চলিতে পারে।

যে প্রদেশে কূড়ী ও বিলান ক্ষেত্রের বাহুল্য আছে, তথায় হৈমন্তিক ধান্যেরই অধিক আবাদ হয়। ঐ প্রদেশে তৃণের তাদৃশ প্রাদুর্ভাব নাই। সুতরাং ক্ষেত্রে অধিক চাষ দিতে হয় না বলিয়া, তত্রত্য কৃষকেরা দুইটি বলদের দ্বারা হল প্রচালন করিয়া থাকে। (১)

আর, যে প্রদেশে আশু ধান্যের আবাদ অধিক হইয়া থাকে, তথায় কূর্ম্মপৃষ্ঠ ক্রমনিম্ন ও সমতল ক্ষেত্রই বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল উচ্চ ক্ষেত্রে তৃণের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। তজ্জন্য ক্ষেত্রে এত অধিক চাষ লাগিয়া থাকে যে, কৃষকদিগের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠে। লাঙ্গলও প্রত্যুষ হইতে বেলা তৃতীয় প্রহর কখন বা ততোধিক কাল পর্য্যন্ত বাহিত হয়। তৎপ্রদেশে দুই বলদে চাষ করিতে হইলে গোরু মানুষ উভয়েরই কষ্টের একশেষ হইয়া থাকে। এক লাঙ্গলে চারিটি বলদ থাকিলে দেড় প্রহরান্তে জোত পায়। তাহাতে গরু মানুষ উভয়েরই কষ্টের অনেকটা লাঘব হইতে পারে। কিন্তু চারিটী বলদের স্থলে লাঙ্গল প্রতি দুইটী বলদ ও দুইটি মহিষ থাকিলেই উৎকৃষ্ট হয়।

---

(১) উক্ত প্রদেশ সকলে দুইটি বলদের দ্বারা লাঙ্গল বহন করিবার অপর কারণও দৃষ্ট হয়। উক্ত প্রদেশ সকলে একে ত তৃণের তাদৃশ প্রাদুর্ভাব নাই। তাহাতে আবার জমি প্রায় পতিত থাকিতে দেখা যায় না। তবে কোন কোন পতিত বিলান ক্ষেত্রে অধিক ঘাস জন্মিয়া থাকে। কিন্তু তথায় ছয় মাসের অধিক গবাদি পশু সকল বিচরণ করিতে পায় না। অপর ছয় মাস বর্ষা বা বন্যার জলে মাঠ ডুবিয়া থাকে। সুতরাং চরাণি মাঠের অভাব প্রযুক্ত অধিক পরিমাণে গবাদি পশু সকল প্রতিপালন করা কঠিন হইয়া উঠে। অগত্যা কূড়ী ও বিলান ক্ষেত্র বহুল প্রদেশে দুইটি বলদের দ্বারা লাঙ্গল বহন করান হইয়া থাকে। কিন্তু বলদ দুইটি বিশেষ বলবান্, দেখিয়া বাছিয়া লওয়া হয়।

গোরু অপেক্ষা মহিষ বলবান। মহিষের লাঙ্গলে ক্ষেত্রের মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত অধিক পরিচালিত হইয়া থাকে। কিন্তু মহিষ প্রখর রৌদ্রের সময় উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া অতিশয় কাতর হইয়া পড়ে। অতএব প্রথম জোত (১) প্রাতঃকাল হইতে বেলা দেড় প্রহর পর্য্যন্ত মহিষের দ্বারা লাঙ্গল বহন করাইয়া তাহার পর গো যোজনা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু এদেশের কোন কোন কৃষককে সমস্ত দিনমানই মহিষের দ্বারা লাঙ্গল বহন করাইতে দেখা যায়।
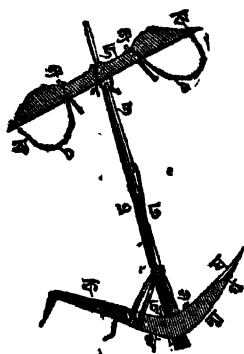
এই প্রস্তাবের শিরোভাগে যে চিত্রময় প্রতিরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, উহার নাম "লাঙ্গল"। কয়েকখণ্ড কাষ্ঠ ও লৌহ এবং রজ্জু একত্রে সংযোজিত হইয়া লাঙ্গলের অবয়ব সম্পন্ন করিয়াছে।

লাঙ্গল প্রধানতঃ দুই খণ্ডে বিভক্ত। উহার এক খণ্ডের নাম লাঙ্গল ও অপর খণ্ডের নাম "যোয়াল"। ঐ উভয় খণ্ডের অন্তর্গত প্রত্যেক খণ্ডের পৃথক পৃথক নাম আছে।

ক চিহ্নিত কাষ্ঠখণ্ডের নাম "নীজান"। খ চিহ্নিত কাষ্ঠ খণ্ডের নাম "গাদা"। গাদার যে স্থানে 'না' চিহ্ন দেওয়া গিয়াছে, তাহার নিম্নভাগের নাম "নাশ" বলে। ন্যাশের উর্দ্ধে গ চিহ্নিত স্থানে একটি বৃহৎ ছিদ্র আছে।

(১) দুইটি বলদে এক খানি লাঙ্গল বহন করা চলে। কিন্তু বলদকে বিশ্রাম দিবার জন্য অনেক কৃষকে চারিটি বলদ রাখিয়া থাকে। ঐ উদ্বৃত্ত বলদ দুইটীকে জোতের বলদ বলে। কেহবা দিনান্তে দুই বার কেহবা চারি বার লাঙ্গলের বলদ পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। ঐ পরিবর্ত্তনকে জোত দেওয়া বলে।

যে লম্বাকৃতি লৌহ খণ্ডের গাত্রে ঘ চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, তাহার নাম "ফাল।" ঙ চিহ্নিত লৌহ খণ্ডের নাম "পাশি"। চ চিহ্নিত কাষ্ঠখণ্ডের নাম "ইষ"। ছ চিহ্নিত কাষ্ঠখণ্ডকে "আড়জালি" বলে। ঐ কয়েকখণ্ড কাষ্ঠ ও লৌহ একত্রে সংযুক্ত হইয়া লাঙ্গলের গঠন সুসম্পন্ন হইয়াছে।

জ চিহ্নিত কাষ্ঠ খণ্ডের নাম "যোয়াল।" যোয়ালের উভয় পার্শ্বে ঝ ঝ চিহ্নিত স্থানের ছিদ্র মধ্য দিয়া যে রজ্জু দুই গাছি ঝুলিতেছে, তাহার নাম "কানজ্যোতি।" যোয়ালের ঞ ঞ চিহ্নিত স্থানে দুইটি ছিদ্র আছে, ঐ ছিদ্র মধ্যে যে দুই খণ্ড কাবারি সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের নাম "শোঁয়াজি"। শোঁয়াজির শিরোভাগে লম্বিত ঠ ঠ চিহ্নিত রজ্জু দুই গাছিকে "জোত" বলে।

ড চিহ্নিত বংশখণ্ডের নাম "আঁকুড়া"। আঁকুড়ার অধোভাগে স্থূল রজ্জু এক গাছি মধ্যস্থলে বন্ধনযুক্ত হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। উহার নাম "লাঙ্গলাদড়া"। লাঙ্গলা দড়ার ঢ ঢ চিহ্ন দেওয়া গিয়াছে। ণ চিহ্নিত চর্ম্ম নির্ম্মিত রজ্জু গাছটীকে "আঁয়োৎ" বলে। চর্ম্মের অভাবে কখন কখন কোষ্টী দ্বারাও আঁয়োৎ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত বস্তু সকল যে স্থানে যাহা সংযোজিত হইয়াছে, চিহ্নে চিহ্নে মিলন করিয়া দেখ। গাদা ও নিজামের সন্ধিস্থলে দুইটি লৌহ পেরেক নিবদ্ধ আছে। আড়জালির সাহায্যে ইষখানি গাদার মধ্যস্থলে সংযুক্ত হইয়াছে। (১)

যোয়ালের মধ্যস্থলে আঁয়োৎ পরিবেষ্টন করিয়া সরজ্জু আঁকুড়া তাহাতে লাগাইয়া দেওয়া হয়। লাঙ্গল, মৈ, বিদে, যখন যে যন্ত্র পরিচালনার আবশ্যক হয়, ঐ আঁকুড়ার দড়া তাহার গাত্রে বন্ধন করিয়া দেওয়া হয়।

১। লৌহ পেরেক দিয়া চিরস্থায়ীরূপে গাদার সহিত ইষ সংলগ্ন করিয়া দিলে চলে না। গাদা হইতে মধ্যে মধ্যে ইষ খুলিবার আবশ্যক হয়! ইষ একখানি অনেক দিন টিকিয়া থাকে। কিন্তু গাদা প্রতি বৎসরান্তে পরিবর্ত্তন করিতে হয়। সম্বৎসর মৃত্তিকার ঘর্ষণে ক্ষয় হইয়া নাশ ক্ষুদ্র আকার ধারণ করে। পর বৎসর তাহাতে লাঙ্গল বহন করা যায় না। আর ফালও মৃত্তিকার ঘর্ষণে সর্ব্বদা ক্ষয় হইয়া যায়। এজন্য মধ্যে মধ্যে ফালে লৌহা দিয়া বাড়াইয়া

কোন কোন প্রদেশের কৃষকেরা ইষের গায়ে দুই তিনটি খাঁজ কাটিয়া রাখে, লাঙ্গল বহিবার সময় ঐ খাঁজে আঁয়োৎ লাগাইয়া দেয়। এ আকারের লাঙ্গলে আঁকুড়া ও লাঙ্গলাদড়া লাগাইবার আবশ্যক হয় না। কিন্তু মৈ, বিদের সময়ে আঁকুড়া ও লাঙ্গলা দড়া ভিন্ন কিছুতেই চলে না।

গবাদি পশুর স্কন্ধদেশে যোয়াল দিয়া, শোঁয়াজির জোতের দ্বারা গলদেশ পরিবেষ্টন পূর্ব্বক, জোতদড়ি কানজ্যোতির মধ্য দিয়া পুনর্ব্বার শোঁয়াজির উপরে সংলগ্ন করিয়া দিতে হয়।

একখানি লাঙ্গলে জমি চষিতে হইলে গরু ভাল চলে না, হোড়নে (১) অস্থির হইয়া পড়ে। সুতরাং অধিক ভূমি চষা হয় না। এবং লাঙ্গলের সহিত অপর এক জন জোতালে মুনীষ না থাকিলে, লাঙ্গলা কৃষাণ ক্ষণকাল মাত্রও বিশ্রাম করিতে পায় না। অথচ এক লাঙ্গলের পশ্চাতে এক জন জোতালে মজুর নিযুক্ত রাখিলে অনেক ব্যয় বাহুল্য হইয়া পড়ে। এ দিকে জোতালে মজুর অভাবে কৃষক ক্ষণকাল মাত্রও বিশ্রাম করিতে গেলে লাঙ্গল কামাই হইয়া যায়। এই জন্য কৃষকেরা পরস্পর যোট হইয়া গাঁতা করে। গাঁতায় চারি খানি লাঙ্গল থাকিলেই উত্তম হয়। চারি খানি লাঙ্গলে একজন জোতালে মুনীষ খাটিতে পারে ও দুই খানি দোছেয়া মৈ চলে। কিন্তু এক গাঁতায় তিন খানি বা পাঁচ খানি লাঙ্গল থাকিলে মৈ দিবার সময় অসুবিধা হয়। দোছেয়া মৈ একখানি চারিটী বলদ ও দুইজন কৃষাণের দ্বারা চালিত হয়। গাঁতায় চারি খানি লাঙ্গল থাকিলে চারি জন কৃষাণের দুই খানি দোছেয়া মৈ দেওয়া হইতে পারে। কিন্তু তিন জন বা পাঁচজন লাঙ্গলা কৃষাণ হইলে মৈ দেওয়ার সময় ভাগে মিল হয় না।

লইতে হয়। এবং লাঙ্গল বহনের সময় প্রত্যহ ফাল পোড়াইয়া অগ্রভাগ সূচল করিয়া লওয়া আবশ্যক করে।

(১) মশক, মক্ষিকা, ও আর এক প্রকার দংশক আছে তাহাকে "ডাঁশ" বলে। অপর এক জাতির নাম 'কুঁজি'। ইহারা মাঠের মধ্যে গরু মহিষ দেখিলে পালে পাল আসিয়া তাহাদের গাত্রে পড়িয়া কামড়াইতে আরম্ভ করে। চাষারা তাহাকে "হোড়ন" বলে। বাস্তা গরুর সংখ্যা অল্প হইলে হোড়নে অস্থির করিয়া তুলে। অনেক গরু এক যোগে থাকিলে হোড়নে অধিক জ্বালাতন করিতে পারে না।

এক লাঙ্গলা কৃষকদিগের গাঁতায় চারি খানির অধিক লাঙ্গল থাকিলে আর এক অসুবিধা হয় এই যে, পরস্পর গাঁতা ফিরিতে ঘুরিতে জমির যো শুখাইয়া যাইতে পারে। অতএব গাঁতায় চারিখানি লাঙ্গল থাকাই এক লাঙ্গলা কৃষকদিগের পক্ষে শ্রেয়স্কর। আর যে কৃষকের তিন চারি খানি লাঙ্গল চলে, তাহার গাঁতা না করিলেও অনায়াসে চলিতে পারে, কিম্বা অন্য কোন সমান কৃষকের সহিত গাঁতা করিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই।

এ দেশে কোথায় বা অতি প্রত্যুষে, কোথায় বা চারিদণ্ড বেলার পর লাঙ্গল চালন করিতে যাইবার প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু অতি প্রত্যুষে চাষ আরম্ভ করাই শ্রেষ্ঠ কল্প। সকাল সকাল কায একটু ভাল হইতে পারে। এই জন্য কৃষকেরা বলে, "যেমন তেমন কায, সকাল করে সাজ।" যাহারা অতি প্রত্যুষে লাঙ্গল বহন করে, তাহারা পূর্ব্ব দিবস সন্ধ্যার সময় কাল পোড়াইয়া রাখে, এবং এক প্রহর রাত্রি থাকিতে গরুকে আহার দিয়া প্রত্যুষে মাঠে গিয়া লাঙ্গল জুড়িয়া দেয়।

কৃষকেরা বলে, "ক্ষেতি দেখি নিতি।" এইটি বড় কাযের কথা। কৃষককে প্রত্যহ বৈকালে আপনার ক্ষেত্র সকল পরিদর্শন করিতে হয়। তাহা হইলে কোন ক্ষেত্রে কি কার্য্য করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা অনায়াসে জানিতে পারা যায়। কার্য্য ক্ষেত্রে কর্ত্তব্য স্থির করা যত কঠিন ব্যাপার, কার্য্য সম্পাদন করা তত কঠিন নহে। বিশেষতঃ কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে, কৃষিক্ষেত্রে সকলের যো পরীক্ষা করিয়া অগ্রে কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিলে কার্য্যে বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। কিন্তু ক্ষেত্র সকল পরিদর্শন করিয়া পূর্ব্ব দিবস যদি কর্ত্তব্য স্থির করিয়া রাখা হয়, তবে পর দিবস কার্য্য করিতে আর কোন গোলমাল ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না। আর কার্য্যক্ষেত্রে সর্ব্বদা দৃষ্টি থাকিলে কোনরূপ সুযোগও এড়াইয়া যাইতে পারে না।

বিশেষতঃ কৃষি কার্য্যের যোগাযোগ বড় ভয়ঙ্কর কথা। কৃষি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিতে হয় সত্য বটে; কিন্তু কৃষি কার্য্য যোগাযোগের উপরেই অধিকতর নির্ভর করে। একবার উহার সুযোগ গত হইয়া গেলে, শেষে সহস্র পরিশ্রম করিলেও আর কোন ফল পাইবার প্রত্যাশা থাকে না। এই জন্য কৃষকেরা বলে, "যা করে না শতেক পোয়ে, তা করে

এক যোয়ে।" একথা অবাস্তবিক নহে। শিল্প প্রভৃতি অন্যান্য কার্য্যের উপর কৃতীর অনেকটা কর্ত্তৃত্ব করিবার অধিকার আছে; কিন্তু কৃষি কার্য্যের উপরে কৃষকের কিছু মাত্র কর্ত্তৃত্ব নাই। কৃষককে প্রত্যেক কার্য্যে প্রতি নিয়ত প্রকৃতির অনুগমন করিতে হয়। প্রকৃতি যে পথে লইয়া যাইবে, কৃষককে সেই দিকে যাইতে হইবে। প্রকৃতির গতি অনুসরণ না করিয়া কৃষকের এক পাও চলিবার সাধ্য নাই। সেই প্রকৃতির গতিকে ইতর ভাষায় যো বলে। কৃষককে সর্ব্বদা যোয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্যক্ষেত্রে নিযুক্ত থাকিতে হয়।

এক্ষণ আশ্বিন মাস, কলাই বুনিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, কৃষকের বলিবার সাধ্য নাই যে কার্ত্তিক মাসে বুনিব। (১) বৈশাখ মাসে ধান্য বুনিতে হইবে, অতএব চৈত্র মাসের মধ্যে জমি চষিয়া ঠিক করিয়া রাখা চাই, সে সময়ে কৃষকের এক দিনের জন্য বিশ্রাম করিবার উপায় নাই। আবার যথা তথা লাঙ্গল বহিলে চলিবে না। কোথায় কোন্ ক্ষেত্রে ভাল যো হইয়াছে, তাহা অগ্রে পরীক্ষা করিয়া পশ্চাৎ তথায় গিয়া লাঙ্গল চালন করিতে হইবে। এইরূপ বীজবুনা, মৈ দেওয়া, বিদে দেওয়া, কাড়ান দেওয়া, ভুমি রোয়া, নিড়ানী করা, খোড় দেওয়া, শস্য কাটাই মলাই করা, ইত্যাদি, যখন যে কার্য্যের সময় উপস্থিত হয়, অতি যত্ন ও সাবধানতার সহিত সেই কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়। কোন কার্য্যে অতি অল্প সময়ের জন্য আলস্য বা তাচ্ছল্য করিলে কৃষি-কার্য্যে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। অতএব লাঙ্গল চালন ইত্যাদি সকল কার্য্যেই পূর্ব্বদিবস যো পরীক্ষা করিয়া পর দিবস কার্য্যক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

---

(১) এ সম্বন্ধে একটি প্রাচীন গল্প আছে। একজন কৃষক শেষ রাত্রে নিদ্রা যাইতেছিল। সেই সময় পাড়ার অপরাপর কৃষকের পত্নীরা বোরো ধান্যের চিড়ে কুটিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ঢেঁকির শব্দে কৃষকের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন কৃষক আপনার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "ধাপুর ধুপুর কারা।" কৃষকের স্ত্রী উত্তর করিল, "বোরো বুনেছিলো যারা।" কৃষক চিড়ের লোভে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, "এখন বুনিলে হয়।" স্ত্রী বলিল, "মাথা মুড় খুড়িলেও নয়।" যথার্থিক কৃষিকার্য্যের সময় গত হইয়া গেলে, শেষে সহস্র পরিশ্রম করিলেও আর কোনও ফল পাইবার প্রত্যাশা থাকে না।

যাহারা স্বহস্তে কৃষিকার্য্য করে, তাহাদের কার্য্য অবশ্য সুচারুমতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু যাহারা স্বহস্তে কৃষিকার্য্য করিতে অক্ষম হইয়া অন্য কৃষাণের দ্বারা কৃষিকার্য্য করিতে বাধ্য হয়, নিম্নলিখিত প্রবাদ বাক্যটি তাহাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। "খেটে খাটায়, দুনো পায়, বসে খাটায়, আধা পায়; ঘরে থাকি পুছে বাত্, এবার যেমন তেমন আর বার হাভাত্।"

হল প্রবাহ।

লাঙ্গলসকল ক্ষেত্রে উপস্থিত হওনান্তর, লাঙ্গলে ফাঁন্দাল দেওয়ার পর, যোয়ালে গোরু জুড়িয়া, লাঙ্গল গুলি একবার পরীক্ষা করিয়া লইতে হয়। ছেও অথবা বাই হইলে চষিবার সুবিধা হয় না। যে দড়া গাছটির দ্বারা লাঙ্গলের সহিত যোয়াল সংযুক্ত করা হয়, ঐ দড়া অধিক কষিয়া খাট করিয়া বান্ধিলে, লাঙ্গলের ফাল মৃত্তিকায় প্রবেশ না করিয়া, উর্দ্ধমুখ হইয়া উঠে। তাহাকে "ছেও লাঙ্গল" বলে। আর দড়া অধিক ছাড়িয়া লম্বা করিয়া বান্ধিলে, লাঙ্গলের ফাল অধোমুখ হইয়া, অধিক মাটির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। তাহাকে "বাই লাঙ্গল" বলে। ছেও লাঙ্গলে মাটি ভালরূপ পরিচালিত হয় না এবং বাই লাঙ্গল গোরুতে টানিয়া তুলিতে পারে না। এই উভয়বিধ লাঙ্গলে ক্ষেত্রের চাষ ভাল হয় না। ছেও নহে, বাই নহে, মধ্যবিত্ত যে লাঙ্গলের ফাল, অতি সহজে মৃত্তিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়া উত্তমরূপে মৃত্তিকা পরিচালিত করিতে থাকে, তাহাকে "যুত লাঙ্গল" শব্দে কহে। যুত লাঙ্গলের মুট আঁটিয়া চাপিয়া ধরিলে, গবাদি পশুতে অনায়াসে টানিয়া থাকে এবং মৃত্তিকা উত্তমরূপে পরিচালিত হইতে থাকে। (১)

---

(১) আমাদের প্রাচীন লাঙ্গলের গালা ও ফাল বৎসরান্তে বৈশাখী চাষের সময়ে পরিবর্ত্তন করা হয়। সেই সময়ে কৃষকেরা আপন আপন গরুর বল বুঝিয়া, ছোট, বড়, মধ্যম, যাহার যেমন সাধ্য, সে তদুপযুক্ত লাঙ্গল প্রস্তুত করিয়া লয়। এই লাঙ্গল অতি নির্ধন হইতে ধনকুবের পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর কৃষকেরই উপযোগী। এক্ষণে অস্মদ্দেশীয় অনেক যুবকের ইচ্ছা যে, ঐ প্রাচীন ক্ষুদ্রকায় জঘন্য লাঙ্গলের পরিবর্ত্তে, এদেশে বিলাতি চক্রযুক্ত নূতন ধরণের লাঙ্গল প্রচলিত হওয়া উচিত। উহাতে একবারকার চাষেই অধিক মাটি কাটিয়া একদিকে উল্টাইয়া পড়ে, তাহাতে কায ভাল হয়। কিন্তু চক্রযুক্ত লাঙ্গল সমতল জমি ভিন্ন কস-

লাঙ্গলের পরীক্ষা সমাপ্তির পর, ক্ষেত্রের সমুদয় সীমানা বাম ভাগে ও সম্মুখে রাখিয়া, বাম হস্তে লাঙ্গল ও দক্ষিণ হস্তে পাঁচনি লইয়া কৃষাণদিগকে অগ্র পশ্চাৎ ভাবে ক্ষেত্রের এক কোণে গিয়া দাঁড়াইতে হয়। অগ্রের কৃষাণ দক্ষিণ আইলের গাত্রে লাঙ্গল সংলগ্ন করিয়া সম্মুখের দিকে ঠিক ঋজুভাবে অগ্রসর হইতে থাকে। যাইবার সময় সম্পূর্ণ বল প্রয়োগ দ্বারা বাম হস্তে কখন বা দক্ষিণ হস্তে লাঙ্গলের মুট নিম্ন ভাগে খুব চাপিয়া ধরিতে হয়। কোন স্থানে মৃত্তিকা কিছু কঠিন বোধ হইলে, সে স্থানে কৃষাণেরা ইষের উপর পা দিয়া চাপিয়া ধরে।

অগ্রের লাঙ্গল যে দিকে যে ভাবে যাইতে থাকে, পশ্চাতের লাঙ্গলও ঠিক সেই দিকে সেই ভাবে যাইতে হয়, এবং সতর্কতার সহিত অগ্রগামী লাঙ্গলের বাম ভাগের শিরালাটি (১) ভেদ করিয়া যাইতে হয়। লাঙ্গলের

মতল শিষেটান ও ক্রমনিম্ন ক্ষেত্রে চালান যায় না। এবং অধিক মূল্যের বলবান্ গরু ব্যতীত ক্ষুদ্র-কলেবর দুর্ব্বল গোরুতে উহা টানিয়া তুলিতে পারে না। এরূপ স্থলে চক্র-যুক্ত বৃহৎ লাঙ্গল সাধারণ দরিদ্র কৃষকদিগের উপযোগী কিরূপে হইতে পারে?

দরিদ্র কৃষকেরা কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত অধিক মূলধন কোথায় পাইবে। এদেশের যে সকল নিঃস্ব লোকে স্বহস্তে হল চালনা করিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে অনেকের মূলধন বিশ টাকা হইতে পঁচিশ টাকা মাত্র। ষোল টাকায় এক জোড়া বলদ ও বক্রী কয়েক টাকায় কৃষিযন্ত্র সকল প্রস্তুত করিয়া কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। এরূপ জঘন্য লাঙ্গলে আট দশ বিঘা পর্য্যন্ত জমি বুনানি করা চলে। ঐ আট দশ বিঘা জমির উৎপন্ন হইতে একটি নিঃস্ব পরিবারের অনায়াসে জীবিকা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। আবার এই লাঙ্গলে ভাল গরু যোজনা করিলে, এক লাঙ্গলে চব্বিশ বিঘা জমি আবাদ হইতে পারে। তবেই দেখা যাই-তেছে, প্রাচীন লাঙ্গল কি ধনী কি দরিদ্র সকলেরই উপযোগী। কিন্তু ইয়ুরোপীয় নূতন লাঙ্গল বা এঞ্জিন প্লাউ সেরূপ নহে। এ জন্য আমরা কৃষি যন্ত্র সকলের উৎকর্ষ সাধনের পক্ষপাতী নহি। আর পুনঃ পুনঃ চাষ না দিলে মাটি ভাল গোলালো হয় না। একবারকার চাষে মাটি অধিক পরিচালিত হইলেও, তাহাতে শস্য ভাল জন্মে না।

(১) লাঙ্গলে যে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া যায়, তাহাকে "ভাঁওর" বলে। সংস্কৃত ভাষায় ভাঁওরের নাম "সীতা"। ভাঁওরের মধ্য স্থলের মৃত্তিকা লাঙ্গলের ফালের দ্বারা চালিত হইয়া উভয় পার্শ্বে পতিত হয়। এ জন্য মধ্যস্থলে একটি নিম্ন রেখা ও উভয় পার্শ্বে দুইটি উচ্চ রেখা হইয়া থাকে। নিম্ন রেখার নাম "হাল" ও উভয় পার্শ্বে উচ্চ রেখা দুইটিকে "শিরালা" বলে।

কাল কদাচিৎ শিয়ালার ইতস্ততঃ যাহাতে সঞ্চালিত না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। শিয়ালা ছাড়া হইয়া কাল যদি দক্ষিণ ভাগে যায়, তবে তাহাকে "হালে পড়া" কহে। বাম ভাগে গেলে 'ডাইন এড়ান" বলে। কৃষাণ অশিক্ষিত হইলে, অধিকাংশ সময় লাঙ্গল প্রায় হালে পড়ে, নয় ডাইন এড়াইয়া যায়। লাঙ্গল হালে পড়িলে, কর্ষিত মৃত্তিকা পুনর্ব্বার কর্ষণ করা হয়, তাহাতে অধিক উপকার নাই। ডাইন এড়াইলে অগ্রগামী লাঙ্গলের শিয়ালার নিম্নস্থ ও পার্শ্বস্থ মৃত্তিকা সম্পূর্ণ ভাবে অপরিচালিত থাকিয়া যায়।

ভাল সুশিক্ষিত কৃষাণের হস্তেও মধ্যে মধ্যে ডাইন এড়াইয়া গিয়া থাকে। কিন্তু ঐ স্থানে চাষ দিবার জন্য তৎক্ষণাৎ "ডাইন এড়াইয়াছে" বলিয়া পশ্চাতের কৃষাণের প্রতি গোচর করিতে হয়। শ্রুতি মাত্রেই পশ্চাতের কৃষাণ দক্ষিণ ভাগে লাঙ্গল উঠাইয়া ঐ অকর্ষিত স্থান কর্ষণ করিয়া লয়। সর্ব্ব শেষের লাঙ্গলে যদি ডাইন এড়াইয়া যায়, তবে অগ্রের লাঙ্গল পাক ফিরিয়া পুনশ্চ তথায় আসিয়া পৌছিলে ঐ স্থান চষিয়া লওয়া হয়।

প্রথমতঃ লাঙ্গল হস্তে কৃষাণেরা যে দিক লক্ষ্য করিয়া যাইতে থাকে, সেই দিকের সীমান্তরালে যেখানে আলবাল দৃষ্ট হয়, তথায় গিয়া পৌছিলে, ক্রমে ক্রমে সমুদয় লাঙ্গল বামাবর্ত্তে ঘুরিয়া বিপরীতাভিমুখে গমন করিতে হয়। ঘুরিয়া যাইবার সময় পূর্ব্ব কর্ষিত মৃত্তিকার গাত্রে লগ্নীকৃত হইয়া হল চালনা করা দুষ্কর। অগত্যা মধ্যস্থানে দেড় হাত, সাত পোয়া, অথবা দুই হাত পরিমিত ভূমি ব্যবধান রাখিয়া আঁতর (১) ধরিতে হয়। ব্যবধান ভূমির কোন স্থানে বেশী কোন স্থানে কম হইলে চলে না। কৃষকের ইচ্ছানুসারে প্রথমে যদি দেড় হাত ভূমি ব্যবধান রাখা হয়, তবে আঁতরের আদ্যোপান্ত সমস্ত অংশে ঐ ব্যবধান ঠিক সমান থাকা চাই। অসাবধানতা বশতঃ আঁতরের কোন স্থান সঙ্কীর্ণ ও কোন স্থান প্রশস্ত হইলে, লাঙ্গল

---

(১) লাঙ্গলে চষিবার সময় মধ্যস্থলে যে ব্যবধান ভূমি অচষা থাকে তাহাকে 'আঁতর' বলে। এবং পূর্ব্ব কথিত মৃত্তিকার পার্শ্বদেশ কথকটা ভূমি ব্যবধান রাখিয়া নূতন যে চাষ দেওয়া হয়, তাহাকে 'আঁতরধরা" বলে।

পুনঃ পুনঃ নামিয়া যাইতে ও উঠিয়া আসিতে হয় (১)। অর্থাৎ এক সঙ্গে যদি চারি খানি লাঙ্গল বহে, তবে সঙ্কীর্ণ স্থলে চারি খানি লাঙ্গল খাটিতে পারে না। অগত্যা এক খানি বা দুই খানি লাঙ্গল, বামের আঁতরে নামিয়া যাইতে হয়। আবার প্রশস্ত স্থলে চাষ দিতে দুই খানি বা তিন খানি লাঙ্গলে সঙ্কুলান হইয়া উঠে না। তজ্জন্য বামের আঁতরের লাঙ্গলকে তথায় উঠিয়া আসিতে হয়। চারি খানি লাঙ্গলেও যদি প্রসস্ত স্থানের চাষ সমাপ্ত না হয়, তাহা হইলে আঁতরের কথকাংশ আচসা রাখিয়া যাওয়াই ব্যবস্থা। পুনর্ব্বার পাক ফিরিয়া বামের আঁতরের লাঙ্গল সকল ঐ আচষা স্থানের সমসূত্রে আসিয়া পৌছিলে, এক খান কি দুই খান লাঙ্গল উঠাইয়া ঐ আচষা স্থান চষিয়া লইতে হয়। নতুবা তথাকার মৃত্তিকা অপরিচালিত থাকিয়া যায়।

প্রথমতঃ যে আইল হইতে লাঙ্গল সকল চালিত হয়, পুনর্ব্বার সেই আইলে গিয়া উপনীত হইলে, বামাবর্ত্তে ঘুরিয়া অগ্রস্থিত লাঙ্গল পূর্ব্ব কর্ষিত আঁতরের শেষ শিরালা ভেদ করিয়া চলে। পশ্চাতের কৃষাণেরা পূর্ব্বের মত পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে থাকে। সম্মুখস্থিত আইলের নিকট পুনর্ব্বার পাক ফিরিবার সময় লাঙ্গলগুলি পূর্ব্ব আঁতরে না গিয়া নূতন আঁতর ধরিয়া লইতে হয়। ক্ষেত্র কর্ষণের সময় সর্ব্বদা প্রায় তিন আঁতরই বর্ত্তমান থাকে। এক আইলে পাক ফিরিবার সময় পূর্ব্বের একটি আঁতর যেমন চষা হইয়া যায়, আবার অন্য আইলে পাক ফিরিবার সময় তেমনি আর একটি নূতন আঁতর ধরিয়া লওয়া হয়। এইরূপ রীতি ক্রমে ক্ষেত্রের সমুদয় অংশে চাস দেওয়া সমাপ্ত হইলে, তাহাকে "একথা" চাষ বলে। ক্রমশঃ দোয়ার, তেওয়ার, চারি চাষ দিলে, মৃত্তিকা অনেকাংশে সুশাসিত হইয়া উঠে।

তদনন্তর এক চাষের পর যখন দোয়ার চাষ আরম্ভ করা যায়, তখন পূর্ব্বগতি অনুসরণ ক্রমে চাষ দেওয়া উচিত নহে। এক চাষের পর দোয়ার

(১) জমি চষিবার সময় এক আঁতরের লাঙ্গল, প্রয়োজন মত অন্য আঁতরে যাইতে ও আসিতে পারে। বামের আঁতরে গেলে নামিয়া যাওয়া বা নামা বলে, এবং দক্ষিণের আঁতরে গেলে উঠিয়া যাওয়া বা উঠা বলে। চষিবার সময় আঁতর ধরার বেশী কমি প্রযুক্ত লাঙ্গল প্রায় সর্ব্বদাই উঠা নামা করিতে হয়।

৩৯ পৃষ্ঠার ক্রোড়পত্র।
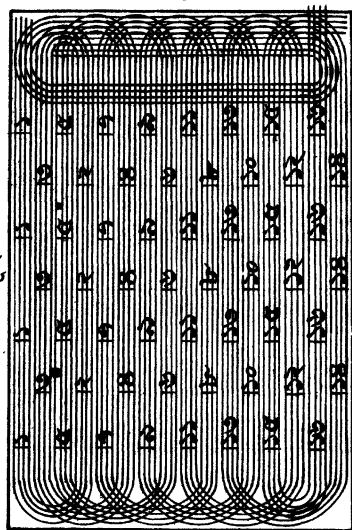
চাষ দিবার সময় যদি পূর্ব্বগতি অনুসারে চাষ দেওয়া যায়, তবে সমুদয় লাঙ্গল হালে পড়িতে থাকে। শিরালার মাটি অমনি অপরিচালিত থাকিয়া যায়। অতএব প্রথম চাষের বিপরীত ভাবে দোয়ার চাষ দেওয়া কর্ত্তব্য। সংযুক্ত ক্রোড় পৃষ্ঠার চিত্র-ক্ষেত্রে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। এইরূপ যত বার চাষ দেওয়া যায়, পর চাষ পূর্ব্ব চাষের বিপরীত ভাবে দিতে হয়।

প্রথম চাষের বিপরীত ভাবে দোয়ার, দোয়ারের বিপরীত ভাবে তেয়ার, এবং তেয়ারের বিপরীত ভাবে চতুর্থ চাষ দিতে হয়। সুতরাং তেয়ার চাষ প্রথম চাষের ও চতুর্থ চাষ দোয়ার চাষের গতি অনুসারে দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু প্রথম চাষ যদি ক্ষেত্রের পূর্ব্ব আইলে ও দ্বিতীয় চাষ দক্ষিণ আইলে ধরা হইয়া থাকে, তবে তেয়ার চাষ ক্ষেত্রের পশ্চিম সীমানায় ও চতুর্থ চাষ উত্তর সীমানায় আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। চিত্র-ক্ষেত্রে দৃষ্টি কর, চিত্র ক্ষেত্রে প্রথম চাষ পূর্ব্ব আইলে ও দ্বিতীয় চাষ দক্ষিণ আইলে আরম্ভ করা হইয়াছে। তজ্জন্য তেয়ার চাষ পশ্চিম আইলে ও চতুর্থ চাষ উত্তর আইলে ধরিতে হইবে। ক্ষেত্রে দশ বার ঘা পর্য্যন্ত চাষ দিতে হইলেও পূর্ব্বোক্ত নিয়ম বিস্মৃত হওয়া কর্ত্তব্য নহে।

চিত্র-ক্ষেত্রের চাষ মোট ষোল আঁতরে সমাপ্ত হইয়াছে। যে আঁতরের পর যে আঁতর চষা হইয়াছে, পর পর অঙ্কপাত করিয়া তাহার চিহ্ন দেওয়া গিয়াছে।

এই চিত্র-ক্ষেত্র ঠিক চতুষ্কোণ ভাবে অঙ্কিত করা হইয়াছে। কিন্তু প্রান্তরস্থিত সমুদয় ক্ষেত্র ঠিক এক আকারের নহে। কোন ক্ষেত্র চতুষ্কোণ, কোন ক্ষেত্র ত্রিকোণ, কোন ক্ষেত্র গোলাকার, কোন ক্ষেত্র ডম্বুরাকৃতি। অপর কোন ক্ষেত্র ভুজ বিশিষ্ট; ঐ ভুজ ভুমিকে ঘোনা বা কোন্দা বলে। আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেরই কোন স্থান প্রশস্ত ও কোন স্থান সঙ্কীর্ণ। যাহা হউক, ক্ষেত্রের আকৃতি ভেদে চাষ দিবার নিয়মাবলি পৃথক নহে। সকল ক্ষেত্রেই একরূপ প্রণালীতে চাষ দেওয়া হইয়া থাকে।

চাষের নাম।

১। নানা জাতীয় ধান্য, ইক্ষু, কোষ্টা প্রভৃতি শস্য সকলের আবাদের নিমিত্ত ফাল্‌গুণ মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত ক্ষেত্রে যে চাষ দেওয়া যায়, তাহাকে "বৈশাখী চাষ" বলে।

২। তিল ও রবিখন্দ প্রভৃতি শস্য সকল বুনানির নিমিত্ত বর্ষাকালে পতিত জমিতে যে চাষ দেওয়া যায়, তাহাকে "আষাঢ়ে চাষ" বলা যায়। আষাঢ়ে চাষ দুই ভাগে বিভক্ত। যথা, আষাঢ়ে চাষ খন্দ বুনানির নিমিত্ত হইলে তাহাকে "পচান চাষ" বলে। আর হৈমন্তিক রোয়া ধান্যের নিমিত্ত হইলে তাহা "কাদান চাষ" বলে। কাদান চাষ জলে কাদায় করিতে হয়।

৩। বুনানি হৈমন্তিক ধান্যের আবাদের নিমিত্ত এবং বার্ত্তাকু, কার্পাস, ও নীল প্রভৃতি শস্যের তেজ বৃদ্ধির জন্য, শস্য ক্ষেত্রের মধ্যে পাতলা করিয়া যে চাষ দেওয়া হয়, তাহার নাম "কাড়ান চাষ"। কাড়ান চাষের ভাঁওর প্রায় আধ হাত, আড়াই পোয়া অন্তরে দেওয়া হয়।

৪। রবিখন্দ ও নীল প্রভৃতি বুনানির নিমিত্ত শরৎ ও হেমন্ত কালে ক্ষেত্রে যে চাস দেওয়া হইয়া থাকে, তাহাকে "কার্ত্তিকে চাষ" বলে।

৫। ধান্যাদি বুনানির নিমিত্ত আষাঢ় ও আশ্বিন হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত, এবং খন্দাদি বুনানির নিমিত্ত ফাল্‌গুণ ও বৈশাখ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত, সময়ে সময়ে যোমত এক ক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ যে চাষ দেওয়া যায়, তাহাকে বার মেসে চাষ বলে। বার মেসে চাষের জমিতে যে কোন শস্য বুনানি করা হয়, তাহাই অতি উৎকৃষ্ট রূপ জন্মিয়া থাকে।

ক্ষেত্র কর্ষণের সুযোগ পরীক্ষা।

ক্ষেত্র সকল প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম পতিত, দ্বিতীয় হাঁশিল। হাঁশিল জমির অপর নাম "লাল"। পতিত ভূমি হলতলে নীত হইয়া যত দিন পর্য্যন্ত উঠিত থাকে, ততদিন তাহা "লাল জমি" শব্দে কথিত হয়। লাল ভূমিতে চাষ দিবার পূর্ব্বে সুযোগ পরীক্ষা করা আবশ্যক।

সংক্ষেপে বলিবার নিমিত্ত ঐ সুযোগ যো শব্দে উক্ত হইয়া থাকে। ঐ যো প্রধান তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—

১। জলসিক্ত মৃত্তিকায় পদ বিক্ষেপ করিলে যদি পায়ের তলায় কাদার দাগ লাগে, তবে তাহাকে নরম যো বা নরম বত্তর বলা যায়। লাল ভূমিতে নরম বত্তরে হল চালনা করা কর্ত্তব্য নহে। নরম মাটি হলাকর্ষণে উৎকৃষ্ট রূপ পরিচালিত হয় না এবং লাঙ্গলের গায়ে গোটা (১) লাগিয়া থাকে। বিশেষতঃ নরমে চষা মাটি শুখাইলে তাহার যোগাকর্ষণ শক্তি অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। কৃষকেরা তাহাকে "চেঙ্গটা ধরা" বলে। চেঙ্গটাধরা-মাটিতে কোন উদ্ভিদ্ পদার্থ মূল বিস্তার করিতে সক্ষম হয় না। এবং তাহাতে লাঙ্গল বহন করাও চলে না। ফলতঃ নরম বত্তরে লাল ভূমিতে চাষ দিলে বিশেষ কোন উপকার দর্শে না, কেবল ভূমি নষ্ট করা হয় এই মাত্র।

চেঙ্গটাধরা মাটি অধিকতর পরিশুষ্ক হইয়া পুনর্ব্বার যদি জলসিক্ত হয়, তাহা হইলে যোগাকর্ষণ শক্তির শিথিলতা প্রযুক্ত,উক্ত দোষ শুধরাইয়া যাইতে পারে। কিন্তু নরমে চষা মাটি সিক্তাবস্থায় জল প্রাপ্ত হইলে, চেঙ্গটা দোষ আরও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। বৈশাখী চাষের সময় অল্প নরমে চাষ দিলে তত হানি হয় না। কিন্তু কার্ত্তিক মাসে নরমে চষিলে মাটির অবস্থা বড় খারাপ হইয়া যায়। এবং রবি শস্যের গাছ তাহাতে তেজস্বী হইতে পারে না।

২। পূর্ণসিক্ত মৃত্তিকা বায়ু স্পর্শে ও রৌদ্রোত্তাপে স্থানে স্থানে ধবল বর্ণ হইয়া উঠিলে, তাহাকে "বগাধরা" বলে। বগাধরা মাটিতে পদ বিক্ষেপ করিলে পদতলে কাদার দাগ লাগে না এবং হস্তে এক মুষ্টি মৃত্তিকা লইয়া চাপিয়া ধরিলে হস্ত-তালু কর্দ্দম-কলঙ্কিত হয় না, অথচ সরস মৃত্তিকা অতি সুকোমল বলিয়া বোধ হয় এবং রেণু রেণু মৃত্তিকা হস্ত তলে লাগিয়া

---

(১) নরম মাটিতে চাষ দিতে হইলে মাটি ও তৃণ সকল লাঙ্গলের গায়ে জড়াইয়া যায়। ইতর ভাষায় তাহাকে 'গোটা লাগা" বলে। পূর্ণ যোয়ের মাটি চষিবার সময়েও ইষের নিম্নভাগে (ঠিক ফালের গোড়ায়) অল্প পরিমাণে গোটা লাগিয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে পায়ের আঘাত দিয়া ঐ গোটা ছাড়াইয়া দেওয়া হয়। পূর্ণ যোয়ের মাটির গোটা যেমন সহজে ছাড়িয়া যায়, নরম মাটির গোটা সেরূপ সহজে ছাড়ে না।

যায়। ইহাকে "ভরা বতর" বা ভরা যোয়ের (পূর্ণ যো)মাটি বলে। এই যোয়ে হল চালনা করিলে, মৃত্তিকা অতি সুন্দররূপে পরিচালিত হইতে থাকে ও ভঙ্গপ্রবণ পদার্থের ন্যায় মৃত্তিকা সকল ঝুরা হইয়া লাঙ্গলের উভয় পার্শ্বে পড়িতে থাকে। পূর্ণ যোয়ের মাটির মধ্যে লাঙ্গল এত অধিক প্রবেশ করে যে, ইষের গোড়া পর্যান্ত ডুবিয়া যায়; তজ্জন্য ভাঁওর বিলক্ষণ মোটা হইয়া থাকে। পূর্ণ যোয়ের মাটিতে এক ঘা চাষে যেরূপ কার্য্য হয়, ও দিনান্তে এক লাঙ্গলে যত পরিমাণ জমি চষিতে পারা যায়, অন্যরূপ যোয়ে দোয়ার তেয়ার চাষেও সেরূপ কার্য্য হয় না ও তাহার অর্দ্ধেক জমিও চষিতে পারা যায় না।

ভরা বতরে চাষ ও মৈ দিয়া রাখিলে, অনেক দিন পর্যান্ত ক্ষেত্রের যো থাকিতে পারে। এরূপ চাষ ও মৈ দেওয়াকে কৃষকেরা "যো বান্ধা" বলে। ক্ষেত্রের যো বান্ধা থাকিলে, মৃত্তিকা অনেক দিন পর্য্যন্ত সরস থাকে (১)। বৈশাখী চাষের সময় মধ্যে মধ্যে জল হইয়া থাকে এবং বর্ষা সমাগমেরও অধিক বিলম্ব থাকে না; এজন্য তখন আবোনা ক্ষেত্রে চাষের পর মৈ দিয়া যো বান্ধিবার আবশ্যক হয় না। কিন্তু কার্ত্তিকে চাষে রবিখন্দ বুনানির সময়

---

(১) তাপ ও বায়ু সংযোগে ভূপৃষ্ঠ পরিশুষ্ক হইয়া থাকে। অনাকর্ষিত মৃত্তিকার অণু সকল পরস্পর সংশ্লিপ্ত থাকা প্রযুক্ত, ভূগর্ভস্থ মৃত্তিকার রস আসিয়া ঐ ভূপৃষ্ঠস্থ পরিশুষ্ক মৃত্তিকাকে যেমন আর্দ্র করিবার চেষ্টা করে, অমনি তাপ ও বায়ু সংস্পর্শে বাষ্পাকারে পরিণত ও উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া যায়। অনাকর্ষিত ক্ষেত্রের মৃত্তিকার যোগাকর্ষণ শক্তি প্রভাবে ঐ রূপ ক্রিয়া ক্রমাগত চলিতে থাকে। তজ্জন্য অতি অল্প দিনের মধ্যেই আচষা ক্ষেত্রেই আতল পর্য্যন্ত নীরস হইয়া উঠে। কিন্তু কর্ষিত ক্ষেত্রে তাহা ঘটিতে পারে না। কারণ হলাকর্ষণে মৃত্তিকা সকল বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। মৃত্তিকার অণু সকলের পরস্পর যোগ না থাকায় যোগাকর্ষণের প্রভাব বিনষ্ট হইয়া যায়। ভূপৃষ্ঠস্থ মৃত্তিকা যতই কেন পরিশুষ্ক হউক না, ভূগর্ভস্থ মৃত্তিকার রস অতি সামান্য মাত্রায় ভিন্ন অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হয় না। এজন্য চাষ দেওয়া মাটি অনেক দিন পর্য্যন্ত সরস থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু চাষের পর মৈ দিয়া মাটি যদি উত্তমরূপে চাপিয়া দেওয়া না হয়, তাহা হইলে ঐ আল্‌গা মাটির মধ্যে তাপ ও বায়ু প্রবেশ করিয়া আচষা মাটি অপেক্ষাও চষা মাটিকে শীঘ্র পরিশুষ্ক করিয়া তুলে। এ যে শর একজন সামান্য কৃষকেও এ বিষয়ে অপরিজ্ঞাত নহে।

বৃষ্টি বড় দুর্লভ হইয়া পড়ে ; তজ্জন্য বঙ্গ দেশের উচ্চ ভূমিস্থ কৃষকেরা আপন আপন গাঁতির জমিতে দোয়ার চাষ ও দুই পালা মৈ দিয়া অগ্রে যো বাঁধিয়া লয়, এবং তাহার পর ক্রমে ক্রমে রবি খন্দ বুনানি করিতে থাকে।

৩। ক্ষেত্রের পৃষ্ঠ ভাগ পরিশুষ্ক হইলে, দুই চারি দিবস পর্য্যন্ত তল-দেশের মৃত্তিকা কিয়ৎ পরিমাণে রসযুক্ত থাকে। ঐ সময় লাঙ্গল বহন করিলে মৃত্তিকা সুন্দর পরিচালিত হইতে থাকে এবং বড় বড় মৃৎপিণ্ড সকল উৎপন্ন হয়। ইহাকে 'উখরাণ বতর" বা "উখরাণ যো" বলে। উখরাণ যোয়ে কেবল চাষ দেওয়া যাইতে পারে ; তাহাতে মৃত্তিকা উত্তমরূপ পরিচালিত হয়, কিন্তু বুনানি কার্য্য হয় না।

৪। মৃত্তিকা অত্যন্ত পরিশুষ্ক হইলে, তাহাকে "টানালো যো" বলে। টানালো যো, যো বলিয়া ধর্ত্তব্য নহে। টানালো যোয়ের মাটিতে লাঙ্গল লাগে না ; সুতরাং টানালো মাটি চষিতে পারা যায় না। তবে বহু কষ্টে সৃষ্টে এক ঘা চাষ দিয়া রাখিলে, পরে এক পশলা বৃষ্টি হওয়ার পর ঐ ক্ষেত্রে চষিবার বড় সুবিধা হয়। কিন্তু গরু মানুষ উভয়েরই কষ্ট হইবে বলিয়া কৃষকেরা টানালো যোয়ের মাটি লাঙ্গলে স্পর্শও করে না।

পচান চাষ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, জমি সকল প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম পতিত (১), দ্বিতীয় হাঁশিল। পতিত জমি লাল করিবার নিমিত্ত ক্ষেত্রে যে চাষ দেওয়া যায়, তাহাকে "পচান চাষ" বলে।

১। পতিত ভূমিকে আচোট্ এবং বাচরা বলে। পতিত ভূমি লাল করিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ ক্ষেত্রে যে চাষ দেওয়া যায়, এক্ষণে কোন কোন লেখক তাহাকে পড়া-ভাঙ্গা বলিয়া থাকেন। কিন্তু কৃষকেরা পড়াভাঙ্গা না বলিয়া জমি ভাঙ্গা বা জমি বাধান বলে। বাধান জমিতে পরে যে চাষ দেওয়া যায়, সেই চাষের নাম প্রদেশ ভেদে কোথাও পচান ও কোথাও খিচা। এই পচান ও খিচা চাষের নাম কখন কখন খিল ভাঙ্গাও বলা হয়।

ক্ষেত্র সকল তৃণ-সমাকীর্ণ পতিত অবস্থায় থাকিলে, প্রথমে বর্ষা ঋতু ভিন্ন অন্য কোন ঋতুতে চষিতে পারা যায় না। তবে কখন কখন অন্যান্য ঋতুতেও অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হইলে, পতিত ভূমি বাধাইবার প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু সে রীতি অতি বিরল।

ক্ষেত্রে পচান চাষ দিবার নিমিত্ত অন্য কোনরূপ যোয়ের পরীক্ষা করিতে হয় না। মৃত্তিকা নাকাচিকা জলসিক্ত বা সম্পূর্ণ ভাবে জলসিক্ত থাকিলেই তাহাতে চাষ দেওয়া যাইতে পারে। পচান ক্ষেত্রে প্রথম চাষ দেওয়ার পরে মৈ দিবার আবশ্যক হয় না। কিন্তু দোয়ার হইতে যত বার চাষ দেওয়া যায়, তত বারই চাষ সমাপ্তির পর মাটির অবস্থা ভেদে এক পালা বা দুই পালা মৈ দিতে হয়। পুনঃ পুনঃ চাষ এবং মৈ ঘর্ষণের দ্বারা মৃত্তিকা সকল উজল পাজল হইয়া তৃণ সকল মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত হইয়া যায়। ক্রমে ঐ সকল তৃণ মূলসহিত পচিয়া মৃত্তিকাবৎ হইয়া উঠে। যখন ক্ষেত্রের কোন স্থানে তৃণাদির চিহ্ন মাত্র থাকে না, তখন পচান চাষ সমাপ্ত হয়। চাষ সমাপ্তির কথা লেখা হইল বটে, কিন্তু যত বেশী চাষ দেওয়া যায়, ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি ততই বৃদ্ধি পায়।

পচান ক্ষেত্রে যো মত চাষ দিতে পারিলে, পলি ও দো-আঁশ মাটিতে আট ঘা চাষ এবং মোটেল মাটিতে দশ ঘা চাষ দিলেই মাটি লাল হইয়া উঠে। এক বিঘা পচান জমির আবাদ করিতে, আট খানি হইতে দশ খানি লাঙ্গলের প্রয়োজন হয়। দশ খানি লাঙ্গলের মূল্য স্থান ভেদে কোথাও ফি লাঙ্গল ৵১০ দশ পয়সা হিসাবে ১॥৴০ এক টাকা নয় আনা, কোথাও বা ৶০ তিন আনা হিসাবে ১৸৵০ এক টাকা চৌদ্দ আনা, কোথাও বা ।০ চারি আনা হিসাবে ২॥০ আড়াই টাকা। কেনা লাঙ্গলে এক বিঘা পতিত জমি লাল করিতে হইলে, এইরূপ খরচ হইয়া থাকে। কিন্তু লাঙ্গলের অবস্থানুসারে নিজের লাঙ্গলে প্রতি বৎসর পাঁচ বিঘা হইতে আট বিঘা পর্য্যন্ত জমি বাধান যাইতে পারে।

কূর্ম্মপৃষ্ঠ, ক্রমনিম্ন, ও সমতল, এই তিনটি ক্ষেত্র উচ্চ ভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই সকল ক্ষেত্রে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে অথবা আষাঢ় মাসের প্রথমে চাষ আরম্ভ করিয়া শ্রাবণ মাসের মধ্যে চাষ সমাপ্ত করা আবশ্যক। তাহার

পরে তিল বোনাই হউক, বা রবি খন্দ বুনানি করাই হউক, অথবা বার মেসে চাস দেওয়াই হউক, কৃষকের সুবিধানুসারে সকল কার্য্যই চলিতে পারে।

বিলান ক্ষেত্রে চাষ দিতে হইলে শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত বিলম্ব করা চলে না। কারণ বর্ষাকালে বিলান ক্ষেত্র মাত্রই প্রায় জলপূর্ণ হইয়া উঠে। সে সময় কোন রূপ আবাদ করা যাইতে পারে না। অতএব জলপূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাসে আরম্ভ করিয়া আষাঢ় মাসের মধ্যে বিলান ক্ষেত্রের চাষ আবাদ সমাপ্ত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। তদনন্তর বন্যা বা বৃষ্টির জলে কর্ষিত মৃত্তিকা সকল পূত হইয়া ভূমি বিলক্ষণ উর্ব্বরা হইয়া উঠে। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে জল নিঃসারিত হইয়া গেলে তথায় রবিখন্দ বুনানি করা যাইতে পারে। বিলান ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কোন কোন বিলান ক্ষেত্র অত্যন্ত নিম্নতল। বর্ষাকালে জলপূর্ণ হইয়া ঐ সকল ক্ষেত্র শরৎ ও হেমন্তকাল পর্য্যন্ত জলে নিমগ্ন থাকিতে দেখা যায়। সুতরাং অত্যন্ত নিম্নতল বিলান ক্ষেত্র সকলে এক মাত্র ধান্য ব্যতীত রবিখন্দ জন্মে না। তাহাদিগকে "এক ধানি" জমি বলে। ঐ সকল ক্ষেত্রে প্রায় শীত কালে জল শুষ্ক হইয়া যো ধরিতে আরম্ভ করে। একধানি জমি জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে ও শীত কালে চষিতে পারা যায়।

যে প্রণালীতে বিলান ক্ষেত্রের আবাদ করা যায়, সেই পদ্ধতিক্রমে কুড়ী ক্ষেত্রেরও আবাদ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা করিবার আবশ্যক হয় না। কুড়ী ক্ষেত্রে যে জল বদ্ধ হয়, তাহার গভীরতার পরিমাণ অতি সামান্য। অল্প গভীর জলে অনায়াসে লাঙ্গল বহন করা যাইতে পারে। জলযুক্ত ক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ চাষ ও মৈ ঘর্ষণ করিলে মৃত্তিকা কর্দ্দমময় হইয়া উঠে; এবং তৃণ সমুদায় আমূলাগ্র পূত হইয়া ভূমির শক্তি বৃদ্ধি করে। এই জন্য ইহার অন্যরূপ আবাদ করিবার প্রয়োজন করে না।

আষাঢ় শ্রাবণ মাসে কুড়ী ক্ষেত্রে কাদান চাষ দিয়া হৈমন্তিক ধান্য রোপণ করা হইয়া থাকে। কিন্তু যে সকল ক্ষেত্রে কাদান চাষ দিয়া হৈমন্তিক ধান্য রোপণ করা হয়, তাহাতে বর্ষার প্রারম্ভে দুই এক ঘা চাষ দিয়া রাখিলে শেষে দোয়ার চাষেই উত্তম কাদা হইয়া উঠে।

যে সকল কুড়ী ক্ষেত্র অত্যন্ত গভীর, সে সকল ক্ষেত্রে রোয়া মানায় না। বৎসর বিশেষে, হয় শাঁকি, না হয় পাঁকি রোগ লাগিয়া, ধান্যের গুছি সকল প্রায় নষ্ট হইয়া যায়। অগত্যা ঐ সকল ক্ষেত্রে রোয়ার আবাদ না করিয়া বুনানি করিতে হয়। অত্যন্ত গভীর কুড়ী ক্ষেত্রের আবাদ বিলান ক্ষেত্র হইতে অধিক বিভিন্ন নহে। অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে ঐ সকল ক্ষেত্রে দোয়ার তেয়ার চাষ দিয়া রাখিতে হয়। তাহার পর বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে তেয়ার চারি চাষেই ধান্য বুনানি করা যাইতে পারে।

বর্ষাকালে যে কোন ক্ষেত্রে পচান চাষ দেওয়া যায়, তাহাতে এক কালে অধিক চাষ না দিয়া ক্রমশঃ চষিতে হয়। প্রথমতঃ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে পচান ক্ষেত্রে সাজো যোড়া দোয়ার চাষ ও দুই পালা মৈ দিয়া রাখিতে হয়। তাহার পর পাঁচ সাত দিন অন্তর এক এক ঘা চাষ দিয়া মাটী উত্তম রূপে পচাইতে হয়। নতুবা তাহার কাঁচখিলে (১) দূর হয় না। কাঁচখিলে মাটীতে শস্য ভাল জন্মে না।

শীতকালে কি পচান কি লাল যে কোন ক্ষেত্রে অধিক চাষ দিয়া রাখা যায়, তাহার পরিচালিত মৃত্তিকা তাপ ও বায়ু সংযোগে অতিশয় নীরস হইয়া

---

(১) চষা মাটির যোগাকর্ষণ শক্তি অত্যন্ত প্রবল থাকিলে তাহাকে "কাঁচখিলে" মাটি বলে। অল্প চাষের মৃত্তিকাতে সচরাচর ঐ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। আর ক্রমে ক্রমে চাষ না দিয়া এক কালে উপর্য্যুপরি অধিক চাষ দিলেও মাটির কাঁচখিলে দোষ প্রবল রূপে বর্ত্তমান থাকিয়া যায়। এক কালীন অধিক চাষে মাটি পরিচালিত হইয়া কতক ঝুরা হইয়া যায় ও কতক গুটি বান্ধিয়া থাকে। প্রত্যেক গুটির যোগাকর্ষণ শক্তির কিছুমাত্র অভাব হয় না। সে মাটী হাতে লইয়া পরীক্ষা করিলে সুকোমল বলিয়া বোধ হয় না। এই উভয় কারণে কাঁচখিলের উৎপত্তি। কাঁচখিলে মাটিতে শস্য ভাল না জন্মাইবার কারণ এই যে, প্রবল যোগাকর্ষণ শক্তি সংযুক্ত মৃত্তিকার অণু সকল উদ্ভিদ্ মূল কর্ত্তৃক সহজে আকৃষ্ট হয় না, এবং উদ্ভিদ্ পদার্থের কোমল মূল কঠিন মৃত্তিকা ভেদ করিয়া বিস্তৃত হইতে পারে না। কিন্তু সাঁজ যোড়া অধিক চাষের মাটী দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাপ ও বায়ু সংযোগে বিলক্ষণ পরিশুষ্ক হইয়া তাহার পর জলসিক্ত হইলে অথবা অধিক দিন জলনিমগ্ন থাকিয়া পুনর্ব্বার চাষের যো ধরিয়া উঠিলে, তখন তাহাতে দোয়ার তেয়ার চাষ দিলেই কাঁচখিলে দোষ শুধরাইয়া যায়। কিন্তু অল্প চাষের মাটিতে ক্রমে ক্রমে অধিক চাষ না দিলে উপরোক্ত উভয় কারণে তাহার কাঁচখিলে দোষ দূর হয় না।

উঠে এবং মৃৎপিণ্ডস্থিত তৃণ সকল শুখাইয়া পরিণামে মাটি হইয়া যায়। তৃণ-শূন্য দীর্ঘকালের চষা মাটিকে "মরা মাটী" বলে। মরা মাটী উপযুক্ত জল প্রাপ্ত হইলে তাহার যোগাকর্ষণ শক্তি শিথিল হইয়া যায়, এবং ঐ মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত স্ফীত ও কোমল হইয়া উঠে। উক্ত মৃত্তিকায় ভরাবতরে দোয়ার তেয়ার চাষ দিলে ঐ চষা মাটী কোমল হইতেও কোমলতর হয়। এরূপ মৃত্তিকাকে কৃষকেরা "গোলালো" বা "মেড়েলো" বলে। মাটী চাষে চাষে উত্তম রূপ গোলালো না হইলে তাহাতে কি ধান্য কি খন্দ কোন শস্যই উৎকৃষ্ট রূপ জন্মে না। বিশেষতঃ আশু ধান্যের জমিতে কার্ত্তিকে চাষের সময়ে অথবা শীতকালে অধিক চাষ দেওয়া না থাকিলে বৈশাখী চাষে উচ্চ ভূমিস্থ মাটী কিছুতেই গোলালো হইয়া উঠে না। তবে কুড়ী ও বিলান ক্ষেত্রে কার্ত্তিকে চাষ না থাকিলেও জলপচা মাটি বৈশাখী চাষের সময় দোয়ার তেয়ার চাষেই দিব্য মেড়েলো হইয়া থাকে।

বিলাতি চক্রযুক্ত নূতন লাঙ্গলে এবং কলের লাঙ্গলে একবার মাত্র চাষ দিলেই সমুদয় মৃত্তিকা চষা হইয়া যায়। কিন্তু বহু দিনের পতিত ভূমিতে সাঁজ সুমার চাষ দিয়া ধান্য বা খন্দবীজ বপন করিলে তাহাতে গাছ উত্তম তেজস্বী হয় না ও শস্য ভাল জন্মে না (১)। এরূপ চাষের ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে সার

---

(১) ভূমি ক্রমশঃ না চষিয়া এককালে অধিক পরিমাণে চাষ দিয়া শস্যবীজ বপন করিলে তাহাতে যে শস্য ভাল হয় না, ইহা এদেশীয় কৃষকেরা বহু পরীক্ষার পর অবগত হইয়াছে এবং আমরাও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। এদেশের কৃষকেরা অল্প সার ব্যবহার করিয়া অথবা আদৌ ভূমিতে সার না দিয়া যে শস্য উৎপন্ন করিতে সক্ষম হয়, ভূমির উর্ব্বরতাই তাহার প্রধান কারণ বটে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে চাষ দেওয়াও তাহার অন্যতর কারণ বলিতে হইবে। লালচিটা জমিতেও যদি ক্রমশঃ বারোমেসে চাষ দিয়া বীজ বপন করা যায়, তাহাতেও যথেষ্ট শস্য জন্মিয়া থাকে। কিন্তু আকড়া চাষে ভাল জমিতেও ভাল শস্য জন্মে না। ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং শুনিয়াছি। খাল বোয়ালের নীলকুটীর সাহেব কলের লাঙ্গল আনিয়া যখন জমি চষিয়াছিলেন, তখন আমাদের দেশের নানা স্থানের কৃষকেরা তাহা দেখিবার জন্য তথায় গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। কলের লাঙ্গলের এক ঘা চাষে ক্ষেত্রের সমস্ত মাটি পরিচালিত হইয়া যেরূপ কায হইয়াছিল, এ দেশের প্রাচীন লাঙ্গলের দশ ঘা চাষে ও সেরূপ কায হয় না। কিন্তু কৃষকেরা সকলে এক বাক্যে বলিয়াছিল যে, মাটি যথেষ্ট পরিচালিত হইয়াছে সত্য, তবে আকড়া জমে

দিলেও বিশেষ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কারণ সাঁজ মোড়া চাষে ক্ষেত্রের মৃত্তিকা উত্তমরূপ পরিচালিত হইলেও সে মৃত্তিকা উত্তমরূপ গোলালো হয় না। তৃণ-মূল-সঙ্কুল কাঁচখিলে মাটিতে শস্যমূলের বিস্তারের প্রতিরোধ জন্মে। সংকীর্ণ শস্যমূল কর্তৃক সম্পূর্ণ ভাবে তেজাকর্ষণের ব্যতিক্রম ঘটিয়া উদ্ভিজ্জ সকল নিতান্ত নিস্তেজ ও ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে। হীনতেজ ক্ষুদ্রাবয়ব উদ্ভিজ্জে শস্য অধিক জন্মে না। যাহা কিছু জন্মে, তাহাতে লাভ হওয়া দূরে থাকুক, কৃষি কার্য্যের খরচই পোষায় না। অতএব কি খিচা কি লাল যে অবস্থারই জমি হউক, তাহাতে এক কালে অধিক চাষ না দিয়া প্রথমতঃ উর্দ্ধতম দোয়ার চাষ দিয়া তাহার পর যত দিন পর্য্যন্ত ক্ষেত্রের মাটি উত্তমরূপ গোলালো না হয়, তত দিন অবধি পাঁচ সাত আট দিন অন্তর ক্ষেত্রে এক এক ঘা চাষ দেওয়া কর্ত্তব্য।* কিন্তু চাষে চাষে ভূমি স্থলাল হইয়া উঠিলে পর তখন বৎসর বৎসর নিম্ন ভূমিতে দোয়ার তেয়ার আর উচ্চ ভূমিতে তেয়ার চারি চাষ দিলেই মাটি উত্তম গোলালো হইয়া উঠে। তথনও এককালীন অধিক চাষ না দিয়া ক্রমশঃ ক্রমশঃ চাষ দিতে হয়।

মৃত্তিকা ভেদে জমি বাধাইবার তত ইতর বিশেষ নাই। কেবল মোটেল মাটি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। পতিত মোটেল মাটির ক্ষেত্রে বর্ষা কালে জলে জলে "কাঁচল" (১) ধরিয়া যায়। বর্ষা হইতে হেমন্ত ঋতু পর্য্যন্ত

বুনানি করিলে নীল ভাল হইবে না; যেমন এক চাষে মাটি অধিক পরিচালিত হইয়াছে, এই মাটি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত রৌদ্রে শুখিয়া বা জলে পচিয়া পুনর্ব্বার যো ধরিলে এবং দোয়ার চাষ দিয়া বুনানি করিলে উত্তম ফসল জন্মিতে পারিবে। কিন্তু সে নিরক্ষর কৃষকদিগের কথা সাহেব গ্রাহ্য করেন নাই। আকড়া চাষে নীল বুনিয়া শেষে সেই সামান্য কৃষকদিগের কথাই ঠিক হইয়াছিল। যে সকল ক্ষুদ্রায়তন বন্ধে দেশীয় লাঙ্গলে পর্য্যায়ক্রমে চাষ দিয়া নীল বুনানি করা হইয়াছিল, সে সকল জমিতে উত্তম নীল জন্মিয়াছিল। আর যে বহুব্য়তন ক্ষেত্রে কলের লাঙ্গলের আকড়া চাষে নীল বুনানি করা গিয়াছিল, বহু যত্নেও সেখানে নীল অর্দ্ধ হস্তের অধিক বাড়ে নাই। তাঁহাকে এ দেশে আর অধিক দিন নীল বুনানি করিতে হয় নাই। সেই বৎসর অজন্মার দায়ে সাহেব ফেল হন, এবং কয়েক বৎসর পরে কুটী বিক্রয় করিয়া বিলাত গমন করেন।

(১) জলে জলে মৃত্তিকার যোগাকর্ষণ শক্তি অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিলে, মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত কঠিন হইয়া উঠে। ইতর ভাষায় তাহাকে "কাঁচল ধরা" বলে। আষাঢ়

ঐ কাঁচলতা বর্ত্তমান থাকে। তন্মধ্যে লাঙ্গলের ফাল সহজে প্রবেশ করে না। কিন্তু পরিশুষ্ক ম্যেটেল মাটি বর্ষার প্রারম্ভে একবার কি দুইবার পূর্ণসিক্ত হইলে তাহাতে চাষ দিবার বড় সুবিধা হয়। যো মত চাষ দিতে পারিলে আট ঘা চাষেই ম্যেটেল মাটির ক্ষেত্র সুলাল হইয়া উঠে।

বর্ষা কালে অন্যান্য মৃত্তিকাতেও কাঁচল ধরিয়া থাকে, তবে মোটেলের ন্যায় তত কঠিন হয় না। কাঁচল ধরা ম্যেটেল মাটির মধ্যে সহজে যেমন লাঙ্গলের ফাল প্রবেশ করে না, পলি প্রভৃতির মৃত্তিকার স্বভাব সেরূপ নহে। যে কোন সময়ে হউক, জলযুক্ত অথবা জলসিক্ত থাকিলেই তাহাদিগকে চষিতে পারা যায়। তবে মোটেল মাটি অধিক পরিশুষ্ক হয় বলিয়া তাহার তৃণ যত শীঘ্র লুপ্ত হইয়া যায়, পলি ও দোঁআশ মাটির তৃণ তত শীঘ্র শুখায় না।

কি খিচা কি লাল যে কোন প্রকারের ক্ষেত্র হউক, পুনঃ পুনঃ চাষ ও মৈ ঘর্ষণের দ্বারা সমুদয় মৃত্তিকা উত্তমরূপ পরিচালিত হইয়া ও গুঁড়াইয়া ধূলিবৎ হইবে, সমুদয় তৃণ উৎপাটিত, পরিশুষ্ক, ও পরিশেষে মাটি হইয়া মাটির সহিত মিশাইয়া যাইবে, কোন স্থানে বিন্দুমাত্র মৃত্তিকা অপরিচালিত থাকিবে না এবং একটীও তৃণ দৃষ্টিগোচর হইবে না। এইরূপে চাষের মাটি উৎকৃষ্ট রূপ গোলালো হইয়া উঠিলে তবে তাহাতে বীজ বুনানি করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কৃষকেরা কহে, মাটিতে চাষ আলে না। "যত পার দাও চাষ; চাষের ভিতর আছে শাস।" আবার শস্য বিশেষেও চাষ অধিক বা অল্প লাগিয়া থাকে। কৃষকেরা তাহার বচন কহে—

শতেক চাষে মূল। তার অর্দ্ধেক তুল।
তার অর্দ্ধেক ধান। বিনা চাষে পান॥

কোন কোন কৃষিবিদ্ উপরোক্ত বচনের অর্থ করিবার সময় বচন-মধ্যস্থ শব্দানুসারে চারিটি মাত্র ফশলের উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা ঠিক অর্থ নহে। ঐ চারিটি চরণ যুক্ত ক্ষুদ্র কবিতায় সমস্ত শস্যের কথাই এক প্রকার বলা হইয়াছে।

শ্রাবণ মাঁসেই মৃত্তিকায় কাঁচল ধরিয়া থাকে। কাঁচল ধরিলে মাটি এত কঠিন হয় যে, তাহার মধ্যে লাঙ্গলের ফাল সহজে প্রবেশ করান যায় না। কিন্তু অনাকর্ষিত মোটেল মাটিতে ইহার স্বরূপ প্রাদুর্ভাব, কর্ষিত মৃত্তিকায় তত নহে।

মূল বলিতে কেবল মাত্র মূলা নহে। হরিদ্রা, আদা, আলু, ওল, মান, প্রভৃতি সমস্ত মূলজাতীয় উদ্ভিজ্জ বুঝায়।

যাহা কিছু প্রাচীন কালে তুলা দণ্ডে ওজন হইয়া বিক্রয় হইত (এবং এখনও হয়), যথা কার্পাষ, কোষ্টা, তামাক, রেড়ী, তুত, ইক্ষু, পটল, বার্ত্তাকু, ইত্যাদি ফসল সকল তুল শব্দের অন্তর্নিবিষ্ট।

নানা জাতীয় ধান্য, খন্দ, গোধুম, ও ভুট্টা, গেমা প্রভৃতি শস্য সকল ধান্যবর্গে নির্ণীত হয়।

লতা জাতীয় উদ্ভিদ্ মাত্রই পান-পদ-বাচ্য। কিন্তু পান ব্যতীত কলাই, মুগ প্রভৃতি অন্যান্য লতা ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে চাষ লাগিয়া থাকে। তবে পলি পড়া মাটিতে ছিটাইলেই উত্তম হয়, তথায় চাষ দিবার আবশ্যক হয় না। পানের বরজে ও গৃহস্থ বাটীতে শশা, লাউ, কুমড়া ইত্যাদি যাহা লাগান হয়, তাহাতে লাঙ্গলের দ্বারা চাষ দেওয়া হয় না বটে; কিন্তু তাহার উচ্চ আবাদ দেখিলে অবাক হইতে হয়। এবং পটল, উচ্ছে প্রভৃতি লতা জাতীয় উদ্ভিদ্ সকল অল্প চাষের জমিতে লাগাইয়া শেষে অধিক পরিমাণে খুড়িয়া দেওয়া যায়। উদ্ভিদ্ প্রকরণে তাহা বিস্তারিতরূপে লিখিত হইবে।

লাঙ্গল বিনা, পতিত জমি অন্য দুই প্রকারে ভগ্ন করা যাইতে পারে। প্রথম দেঁড়ো বা ফাওড়ার দ্বারা কোপানী করা। দ্বিতীয় পাত কোদালে চাঁচাই করা। কিন্তু কোপানী বা চাঁচাই যে কোন প্রকারেই জমি ভাঙ্গা হউক, পরিশেষে তাহাতে লাঙ্গলের দ্বারা চাষ দেওয়া আবশ্যক করে। লাঙ্গল ভিন্ন বুনানি কার্য্য সম্পাদন হইয়া উঠে না।

বিল মাঠের কোপানী জমিতে কখন কখন লাঙ্গল না দিয়া আমন ধান্য বুনানি করা যায়; তাহাতে ধান্য নিতান্ত মন্দ হয় না। কিন্তু এ নিয়ম উচ্চ প্রদেশস্থ রাড়ি আমনের বা আশু ধান্যের জমিতে খাটে না। কেবল জল সংযোগে বৃদ্ধি পায় যে বাগ্‌ড়ো ও আমন ধান্য, তাহাতেই এরূপ ব্যবস্থা চলিতে পারে।

দেঁড়োর কোপানী।

১ চিত্র
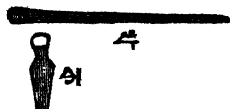
২ চিত্র
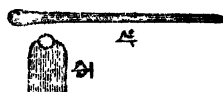
প্রথম চিত্রস্থ যন্ত্রের ক চিহ্নিত অংশ লৌহ দ্বারা নির্ম্মিত, উহাকে "দেঁড়ো" বা "ডেঁড়ো" বলে। কাষ্ঠ নির্ম্মিত খ চিহ্নিত অংশের নাম "বাঁট্" বা "আছার"।

দ্বিতীয় চিত্রের ক চিহ্নিত লৌহ নির্ম্মিত অংশের নাম "ফাওড়া বা "কোড়"। খ চিহ্নিত অপর অংশের নাম "বাঁট" বা "আছার"। দেঁড়ো ও ফাওড়া এই উভয় যন্ত্রের কার্য্য-ক্ষেত্র একরূপ।

অত্যন্ত পরিশুষ্ক ও কাঁচল মাটি কোপাইবার সুবিধা হয় না। পরিশুষ্ক মৃত্তিকা কিঞ্চিৎ সরস থাকিতে অর্থাৎ টানালো যোয়ে কোপানী করাই প্রশস্ত। অগ্রহায়ণ মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত ইহার মধ্যে যে কোন সময়ে হউক, পতিত জমি কোপানী করা যাইতে পারে। চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে পতিত জমি কোপাইলে বৈশাখী চাষের সময় সে জমি কোন উপকারে আইসে না। কিন্তু খন্দ বুনানির জন্য ঐ সময়ে জমি কোপাইলে ভাল হইতে পারে।

বৈশাখী চাষে যে সকল জমি বুনানি করা আবশ্যক, সে সকল জমি অগ্রহায়ণ মাস হইতে ফাল্গুণ মাসের মধ্যে কোপানী করা কর্ত্তব্য। ঐ কোপানী মাটি দীর্ঘকাল রৌদ্রে শুখাইয়া বৈশাখী চাষের সময় দোয়ার চাষেই উত্তম গোলালো হইয়া উঠে। কিন্তু চাষ দেওয়ার পূর্ব্বে অনেক স্থলে কোপানী মাটি দো-কোপানী করা হইয়া থাকে।

বিলান ক্ষেত্র মাত্রেই প্রায় হেড়মো মেটেল মাটি বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে দুই এক বার পূর্ণসিক্ত হইলেই ঐ সকল জমিতে পচান চাষ দিবার সুবিধা। কিন্তু সে সময়ে কৃষকদিগকে বুনানি কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হয়। তাহার পর আষাঢ় মাসে কৃষকেরা যখন পচানি চাষ

দিবার অবকাশ পায়, তখন বিলান ক্ষেত্র সকল প্রায় জলনিমগ্ন হইয়া যায়। আর জলনিমগ্ন না হইলেও তখন ঐ সকল ক্ষেত্রে কাঁচল ধরিয়া থাকে। সুতরাং লাঙ্গলে চষিবার সুবিধা হয় না। এজন্য অধিকাংশ বিলান ক্ষেত্র প্রায় শীতকালে কোপানী করা হয় এবং উচ্চ ভূমির মধ্যে যে সকল জমিতে হরিদ্রা প্রভৃতি মূলজ ফসল রোপণ করা যায়, সে সকল জমিও শীত কালে কোপানী করা হইয়া থাকে।

এ দেশের লাঙ্গলে দশ ঘা চাষ দিলে যে কার্য্য হয়, একবারের কোপানীতে সেইরূপ কার্য্য হইয়া থাকে। ভাল যোয়ের মাটি হইলে এক জন কুলীতে ম্যেটেল এক কাঠা দেড় কাঠা ও পলি দুই কাঠা আড়াই কাঠা জমি অনায়াসে কোপাইতে পারে। ঠিকাদার কুলীরা এক বিঘা ম্যেটেল মাটি কোপানীর মূল্য যো বিশেষে (৩।০, ৩৷৷০, ৩৸০) স-তিন টাকা হইতে পোনে চারি টাকা ও পালি দোআঁশ মাটির এক বিঘা জমি কোপানীর মূল্য (১৸০; ১৸৶০, ২৲) পোনে দুই টাকা হইতে দুই টাকা পর্য্যন্ত লইয়া থাকে। কিন্তু লাল জমি কোপাইতে এক বিঘা ম্যেটেল জমিতে ১৸০ সাত সিকা ও পলি দো-আঁশ হইলে ১।০ পাঁচ সিকার অধিক খরচ হয় না।

কোপানীর রীতি।

কোন প্রদেশে এক দেঁড়োয় কোন প্রদেশে দুই দেঁড়োয় ও কোন প্রদেশে ছয় দেঁড়োয় কোপানী করিতে দেখা যায়। ছয় দেঁড়োর কোপানীতে কায কিছু বেশী হয় এবং বৃহৎ বৃহৎ চেবা উঠিয়া থাকে।

ছয় জন কৃষাণকে দেঁড়ো হস্তে পার্শ্বাপার্শ্বি ভাবে দাড়াইতে হয়। তদনন্তর দুই হস্তে আছার ধরিয়া দেঁড়ো মস্তকোর্দ্ধে তুলিয়া সম্পূর্ণ বল প্রয়োগ পূর্ব্বক মৃত্তিকায় আঘাৎ করিলে দেঁড়ো ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। অগ্রে 'মধ্য-স্থলের দেঁড়ো চারি খানি অর্দ্ধ হস্ত অন্তরে পার্শ্বাপার্শ্বি ঠিক ঋজুভাবে পতিত হয়। পশ্চাতে উভয় পার্শ্বের দুই খানি দেঁড়ো দ্বারায় উভয় দিকের পাশ কাটিয়া দেওয়া হয়। ইহাকে "কানি কাটা" বলে। কানি কাটিয়া দিবার সময়ে উভয় পার্শ্বের মাটি ঈষৎ আড় ভাবে কাটিয়া দিতে হয়।

দেঁড়ো সকল একে একে না উঠাইয়া সমুদয় দেঁড়োর অগ্রভাগ (এক কোপে বা দুই কোপে হউক) ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইলে, প্রথমতঃ অল্প পরিমাণে দেঁড়োয় একটু চাড় দিতে হয়। ঐ চাড়ে মৃত্তিকা স্বস্থান-চ্যুত হইয়া চাপ ধরিয়া উঠে। তখন সজোরে দেঁড়ো সকল কোলের দিকে টানিয়া লইলেই মৃত্তিকা চেজড় ধরিয়া স্থূল ভাবে উল্টাইয়া পড়ে। তদনন্তর এক পদ অগ্রসর হইয়া সম্মুখের মাটি পূর্ব্ববৎ কাটিয়া তুলিতে হয়। প্রত্যেক বারে যে চেবা কাটিয়া তোলা হয়, তাহা দীর্ঘে যতই হউক প্রস্থে তিন পোয়ার অধিক নয়।

ক্ষেত্র কোপাইবার সময় ইচ্ছামত পাই (১) বান্ধিয়া লওয়া হয়। ক্রমে কতক দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া পাই উঠিলে পুনর্ব্বার কোপানী ভূমির বাম ভাগে গিয়া কোপাইতে হয়। ছয় জন কুলীর দ্বারা পতিত মেটেল মাটি ছয় কাঠা হইতে নয় কাঠা এবং পলি দোআঁশ বার কাঠা হইতে পোনের কাঠার অতিরিক্ত কোপানী হয় না। কিন্তু লাল ভূমি এক বিঘা পর্য্যন্ত কোপানী হইতে পারে।

কোদালে চাঁচাই।
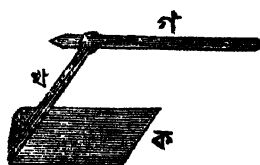
উপরে যে যন্ত্রের চিত্রময় প্রতিরূপ দৃষ্ট হইতেছে, উহার নাম "কোদাল।" কোদালের ক চিহ্নিত অংশের নাম "পাত" ও খ চিহ্নিত অংশকে "পাশি"

(১) কোপানী, নিড়ানী, শস্য কাটাই ইত্যাদি প্রত্যেক কার্য্যকালে কৃষাণেরা মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম করিয়া থাকে। কার্য্যে নিযুক্ত হওয়ার পর হইতে বিশ্রাম কাল পর্য্যন্ত ক্ষেত্রের যে নির্দ্দিষ্ট অংশের কার্য্য সমাধা হয়, তাহাকে পাই বলে। কৃষাণদিগের সংখ্যানুসারে পাই প্রশস্ত বা সংকীর্ণ হইয়া থাকে। কিন্তু পাইয়ের দৈর্ঘ্য পরিমাণ বিংশতি হস্তের অধিক নহে।

বলে। ঐ দুই অংশ লৌহ দ্বারা নির্ম্মিত। আর গ চিহ্নিত বাটটি কাষ্ঠ দণ্ড মাত্র।

কোদাল কৃষিকার্য্যে সর্ব্বদাই ব্যবহার হইয়া থাকে। শস্য ক্ষেত্রে খোঁড় দেওয়া, পগার কাটা, শস্য ক্ষেত্রের আইল ঝোড়া, বাগান ভিলান, জমি চাঁচাই, ইত্যাদি অনেক কার্য্য কোদাল দ্বারা সুসম্পন্ন হয়।

উচ্চ ক্ষেত্র চাঁচাই করিলে অধিক উপকার দর্শে না। কিন্তু জল-প্লাবিত পতিত বিলান ক্ষেত্র চাঁচাই করিলে যথেষ্ট ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ক্ষেত্র চাঁচাই করিতে হয়, উহা বেনা প্রভৃতি উচ্চশীর্ষ-তৃণ-সমাকীর্ণ থাকিলে তাহা অগ্রে কাটিয়া দূরস্থ করা কর্ত্তব্য।

ক্ষেত্র চাঁচাই করিবার সময়, যত জনই কুলী হউক, পাশাপাশি কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ ভাবে দাড়াইয়া, কোদালের দ্বারা ভূপৃষ্ঠের দুই তিন বুরুল মৃত্তিকা চাঁচিয়া লইয়া উল্টাইয়া ফেলিতে হয়। প্রথমতঃ চাপলার বাম দক্ষিণ উভয় পার্শ্বে কিঞ্চিৎ আড়ভাবে কাটিয়া তদনন্তর মধ্যস্থলের মৃত্তিকা একটু ঢলানে ভাবে কাটিতে হয়। তাহার পর মৃত্তিকা সহ কোদাল উর্দ্ধভাগে টানিয়া লইলেই চাপলাটি উঠিয়া আইসে। সতৃণ মৃত্তিকার চাপলা যে স্থান হইতে উঠিবে, পুনর্ব্বার সেই স্থানেই বিপরীত ভাবে পতিত হইবে, কদাচ ইতস্ততঃ হইয়া পড়িবে না। এইরূপে ক্রমশঃ সমস্ত ভূমি চাঁচাই করা যাইতে পারে।

বর্ষা ঋতুর প্রারম্ভেই ভূমি সকল চাঁচাই করা কর্ত্তব্য। যথা সময়ে বন্যা বা বৃষ্টির জলে ঐ জঙ্গলময় মাটির চাপলা পূত হইয়া পল্বল ময় হইয়া থাকে। পরে জল নিঃসারিত ও পরিশুষ্ক হইয়া আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে ভূমিতে চাষের উপযুক্ত যো হইলে, তখন দোয়ার তেয়ার চাষ ও মৈ দিলেই ভূমি প্রায় সুলাল হইয়া উঠে। অতঃপর ক্ষেত্রের অবস্থা বিশেষে যে কোন শস্যবীজ হউক বপন করা যাইতে পারে। চাঁচাই জমিতে প্রথম বৎসরে গোম তত উৎকৃষ্ট জন্মে না।

অত্যন্ত নিম্নতল কর্দ্দমময় বিলান ক্ষেত্র বোরো ও জলি ধান্যের আবাদের নিমিত্ত শীতকালে চাঁচাই করা হইয়া থাকে। এক বিঘা জমি চাঁচাই করিতে আট জন বা দশ জন কুলির আবশ্যক। তাহা হইলে এক বিঘা জমির চাঁচাই খরচ ১৷৹ হইতে ১৸৵ এক টাকা চৌদ্দ আনা পর্য্যন্ত হওয়া

সম্ভব। কিন্তু ঠিকাদার কুলীতে এক বিঘা জমি চাঁচাইয়ের মূল্য ১৸০ এক টাকা দশ আনা লইয়া থাকে।

লাঙ্গল প্রতি ভূমির পরিমাণ।

এ দেশের সমস্ত লাঙ্গল তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা, উত্তম, মধ্যম, ও অধম (১)।

উত্তম শ্রেণীর লাঙ্গলে বৈশাখ মাসে দৈনিক দুই বিঘা ও কার্ত্তিক মাসে দৈনিক দেড় বিঘা জমি চষিতে পারা যায়। এই উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লাঙ্গলে আশু ধান্যের জমি হইলে দেড় খাদা (২) এবং আমন ধান্যের জমি হইলে আড়াই খাদা পর্য্যন্ত বুনানি করিতে পারা যায়।

মধ্যম শ্রেণীর লাঙ্গলে বৈশাখ মাসে দৈনিক দেড় বিঘা ও কার্ত্তিক মাসে দৈনিক এক বিঘা চষিতে পারা যায়। মধ্যম শ্রেণীর লাঙ্গলে আশু ধান্যের জমি এক খাদা, আর যদি আমনের জমি হয়, তবে দেড় খাদা পর্য্যন্ত জমি বুনানি করিতে সক্ষম হওয়া যায়।

যে লাঙ্গলের গবাদি পশু দুর্ব্বল অথবা কুড়ে, মেটো (৩) বা গড়্যে (৪) হয়, তাহাকেই নিকৃষ্ট শ্রেণীর লাঙ্গল বলা যায়। নিকৃষ্ট লাঙ্গলে বৈশাখ মাসে দৈনিক পোনের কাঠার অধিক জমি চষিতে পারে না এবং সে চাষও উৎকৃষ্ট হয় না। উৎকৃষ্ট লাঙ্গলের চারি ঘা চাষে ক্ষেত্রের মৃত্তিকা যেরূপ পরিচালিত হয়, নিকৃষ্ট লাঙ্গলের আট ঘা চাষেও সেরূপ হওয়া সম্ভব নহে। এই জন্য এক আইলে কোন কৃষকের ক্ষেত্রে সুবর্ণ বর্ষণ

---

(১) লাঙ্গলের ভাল মন্দ গোরুর অবস্থার উপর নির্ভর করে। গোরু বলবান্ হইলে লাঙ্গল উৎকৃষ্ট হয়। দুর্ব্বল গোরুর লাঙ্গল নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত।

(২) ষোল বিঘায় এক খাদা হয়।

(৩) যে গোরু আপন বশে চলে, তাহাকে "মেটো" বলে। মেটো গোরু সহস্র তাকাইলেও খরতর বেগে যাইতে পারে না। তবে কুড়ে যেমন নড়িতে পারে না, মেটো সেরূপ নহে, তাহাপেক্ষা একটু ভাল চলে।

(৪) লাঙ্গল বহন করিতে করিতে যে গোরু শুইয়া পড়ে, তাহাকে "গড়্যে" বলে। শুইয়া তৎক্ষণাৎ যদি উঠে, তবে তাহাকে "খাবা গড়্যে" বলে।

হইয়া থাকে, আবার কোন কৃষকের বীজ বাহুড়িয়া আইসে না। সমান জমিতে কেবল চাষ আবাদের দোষেই এরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। যাহা হউক, নিকৃষ্ট লাঙ্গলেও আশু ধান্যের জমি হইলে দশ বার বিঘা এবং আমনীয়া জমি হইলে এক খাদা পর্য্যন্ত বুনানি করা চলে।

যে সকল উচ্চ প্রদেশে কূর্ম্মপৃষ্ঠ, ক্রমনিম্ন, ও সমতল ক্ষেত্রের সংখ্যা অধিক, সেই সকল প্রদেশে আশু ধান্যেরই আবাদ হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্র সকল কোন সময়েই প্রায় জলনিমগ্ন হইতে দেখা যায় না; বৎসরের ছয় মাস কাল পরিশুষ্কাবস্থায়, অপর ছয় মাস কেবল জলার্দ্রমাত্র হইয়া থাকে। এই অবস্থার ক্ষেত্র সকলে চৈত্র বৈশাখ মাস হইতে হেমন্ত ঋতু পর্য্যন্ত অহরহঃ নানা জাতীয় আগাছা ও তৃণ বীজ সকল অঙ্কুরিত হইয়া সমুদয় স্থান আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। তদ্ভিন্ন কেশে, কুশ, উলা, কস্তুরি, মুথা, দুর্ব্বা, প্রভৃতি চিরজীবী তৃণপুঞ্জের সহিত ঐ সকল ক্ষেত্রের একপ্রকার চিরস্থায়ী বন্দবস্ত আছে বলিলে বলা যায়; কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা, কি শীত, কোন ঋতুতেই তাহাদের বৃদ্ধির নিবৃত্তি নাই। ঐ সকল আগাছা ও বিবিধ তৃণপুঞ্জ দেঁড়ো, কোদাল, লাঙ্গল, নিড়ানী, ইত্যাদি যন্ত্র দ্বারা বিবিধ কৌশলক্রমে নিপাতিত করিয়াও একেবারে নিঃশেষ করিতে পারা যায় না। বৃহৎ বৃহৎ ক্ষেত্র সকলের এক দিক আবাদ করিয়া অন্য দিকে যাইতে যাইতে পশ্চাৎভাগ আবার তৃণাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। এতাদৃশ তৃণবহুল প্রদেশে প্রত্যূষ হইতে বেলা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত লাঙ্গল বহিয়াও অবস্থা বিশেষে এক লাঙ্গলে দশ বিঘা বা দেড় খাদার অধিক জমি আবাদ করা দুষ্কর হইয়া উঠে। আবার যেখানে পলি মাটির ক্ষেত্র অধিক আছে, তথায় এক লাঙ্গলে আট বিঘা হইতে ষোল বিঘা জমির আবাদ করিলেই বরং ভাল হয়।

আশু ধান্য বুনানির পর প্রস্তুত হইতে চারি মাস কাল গত হয়। ঐ চারি মাসের মধ্যে প্রথম দুই মাস মাত্র আবাদ করা চলে। ঐ দুই মাসের মধ্যে মৈ, বিদে, নিড়ানী, প্রভৃতি সমস্ত সমাপ্ত করিতে না পারিলে আশু ধান্যের অবস্থা উৎকৃষ্ট হয় না। সুতরাং অপর কৃষকের সাহায্য ব্যতীত অর্থাৎ অনেক ছুটা মজুর না হইলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে একজন কৃষাণের দ্বারা এক খাদা দেড় খাদা জমির নিড়ানী প্রভৃতি পারিপাট্য সাধন হইয়া উঠে না।

অতএব আশু ধান্যের কৃষককে এক লাঙ্গলে অধিক ভূমি করিতে হইলে আবাদের পক্ষে অনেক খিরকীচ হওয়া সম্ভব। তবে পলির চাষা হইতে মোটেলের চাষা দুই চারি বিঘা জমি বেশী করিতে সক্ষম হয়। পলি অপেক্ষা মোটেল মাটীতে ঘাষের সংখ্যা কিছু কম হইয়া থাকে। কিন্তু কার্ত্তিকে চাষের সময়ে পলির চাষা যে পরিমাণ জমিতে খন্দ বুনানি করিতে পারে, মোটেলের চাষা তাহা পারে না।

বৈশাখী চাষের সময় মোটেল মাটী যথেষ্ট পরিচালিত হয়। কিন্তু বর্ষা কালে জলে জলে মোটেল মাটিতে কাঁচল ধরিয়া কার্ত্তিকে চাষের সময় অপেক্ষাকৃত কঠিন হইয়া উঠে, এবং কার্ত্তিক মাসের টানে তাহা শীঘ্র শীঘ্র শুকাইয়া যায়। পলি এবং দোআঁশ মাটিতে বৈশাখী ও কার্ত্তিকে চাষ ভেদে কোন অবস্থান্তর ঘটে না, এবং পলি ও দোআঁশ মাটি দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত সরস থাকে।

এক জন কৃষাণ দ্বারা আশু ধান্যের জমি দশ বিঘা পর্য্যন্ত নিড়ানী ও কাটাই করা যাইতে পারে। এক লাঙ্গলে তদতিরিক্ত জমি আবাদ করিতে হইলে ছুটা মজুরের আবশ্যক হয়। তদ্বিস্তারিত বিবরণ ধান্য-প্রকরণে লিখিত হইবে।

যে প্রদেশে কেবল মাত্র হৈমন্তিক ধান্যের আবাদ হইয়া থাকে, তথায় বিলান, কুড়ী, ও কোল দোপ ক্ষেত্রই অধিক পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়। গ্রীষ্ম ঋতুর শেষ হইতে হেমন্ত ঋতু পর্য্যন্ত বৎসরের প্রায় পাঁচ ছয় মাস কাল ঐ সকল ক্ষেত্র জলনিমগ্ন হইয়া থাকিতে দেখা যায়। এরূপ জলনিমগ্ন ক্ষেত্রে স্থলজ তৃণের অধিক প্রাদুর্ভাব হইতে পারে না। তবে কয়েক প্রকারে তৃণ আছে, তাহাদের প্রকৃতি ঠিক আমন ধান্যের তুল্য। তাহারা স্থলে প্রথম জন্মিয়া, পরে জল সংযোগে বৃদ্ধি পায়। কুড়ী ও কোল কুড়ী ক্ষেত্রে ঐ সকল তৃণই অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। কিন্তু নিম্নতল বিলান ক্ষেত্র-সকলে নানা জাতীয় জলজ তৃণ জন্মাইতে দেখা যায়।

আমন ধান্যের আবাদের সময় ঐ সকল তৃণ একবার নিড়াইয়া দিলেই তাহাদের সংখ্যা কম হইয়া পড়ে। অবশিষ্ট যাহা থাকে, তাহা শীত ও গ্রীষ্ম সমাগমে শুকাইয়া যায়। ফলতঃ চৈত্র বৈশাখ মাসে আমনের ভূমি

প্রায় পরিষ্কার অবস্থায় থাকে। এই জন্য আমনের জমি অপেক্ষাকৃত অল্প চাষেই সুন্দর আবাদ হইয়া উঠে। তজ্জন্য আশু ধান্য অপেক্ষা আমনের জমি কিছু বেশী করিতে সক্ষম হওয়া যায়। আর আমনের জমির পারিপাট্য সাধনের জন্য কৃষককে তাদৃশ তাড়াতাড়ি করিতে হয় না। কারণ আমন ধান্য প্রস্তুত হইতে প্রায় আট মাস কাল গত হয়। তন্মধ্যে পাঁচ মাস কাল আবাদ করা চলে। এই পাঁচ মাসের মধ্যে এক জন কৃষকের দ্বারা এক খাদা বিশ বিঘা জমির আবাদ সুসম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু তদতিরিক্ত জমি করিতে হইলে ছুটা মজুরের সাহায্য লওয়া আবশ্যক হয়। ছুটা মজুরের সাহায্য বিনা দেড় খাদা বা আড়াই খাদা জমির আবাদ নিষ্পন্ন হইয়া উঠে না।

বৈশাখী চাষ।

শীত কালে এদেশে প্রায় বৃষ্টি হয় না। দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টির পর ফাল্গুণ চৈত্র মাসে খন্দ কাটিয়া সহসা ক্ষেত্রে চাষ দিতে পারা যায় না, বৃষ্টির প্রতীক্ষা করিতে হয়। তবে কোন কোন বৎসর মাঘ মাসের শেষে এক পসালা বৃষ্টি হইতে দেখা যায়। সে বৃষ্টিতে কৃষিকার্য্যের বিলক্ষণ উপকার দর্শে। এই জন্য কৃষকেরা বলে, "ধন্য রাজার পুণ্য দেশ, যদি বর্ষে মাঘের শেষ।" যাহা হউক, খন্দ কাটাইয়ের পর বৃষ্টি হইলেই বৈশাখী চাষ আরম্ভ হয়। বৈশাখী চাষে প্রতি চাষের পর মৈ দেওয়ার আবশ্যক করে না। ধান্যাদি বুনানীর পরে মৈ দিতে হয়।

বৈশাখী চাষের সময় ক্ষেত্রের হালি (১) কাটিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। আহারান্তে কৃষাণেরা বৈকালে লাঙ্গল বহন করে না। সে সময় তাহারা হালি কাটিয়া থাকে।

চাষে চাষে মাটি উত্তম গোলালো না হইলে ধান্য বীজ বপন করা কর্ত্তব্য নহে। তবে শস্য সকল যাহাতে নামলা না হইয়া একটু অগ্রসূচি বুনানি করা হয়, সে বিষয়ে কৃষকের বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

---

(১) কেশে, কুশ, দুর্ব্বা, ইত্যাদি যে সকল খড় লাঙ্গলের মুখে এড়াইয়া যায়, তাহাদিগকে হালি খড় বলে। কাওড়াতেই হালি কাটিবার সুবিধা হয়।

কুড়ী ও বিলান ক্ষেত্র সকল বর্ষার জলে নিমগ্ন হইলে বুনানি করা যায় না এবং নামলা বাতে ধান্য বীজ বপন করিলে নিম্ন ভূমি পশ্চাৎ জল নিমগ্ন হইবারও আশঙ্কা থাকে। অগত্যা গাঁতির মধ্যস্থিত কুড়ী ও বিলান ক্ষেত্র সকল অগ্রে বুনিয়া শেষে উচ্চ ক্ষেত্র সকল বুনানী করা কর্ত্তব্য।

পচান জমিতে ধান্য কিছু কম জন্মে, তাহাকে "খিল জলা" বলে। লাল জমি হইতে পচান জমিতে চাষ কিছু বেশী লাগে। সুলাল জমি হইলে চার পাঁচ ঘা চাষেই বুনানী করা চলে; কিন্তু খিচা জমি ছয় সাত ঘা চাষের কম বুনানী করা হয় না। উচ্চ ভূমি মাত্রেই প্রায় এইরূপ নিয়ম। কুড়ি ও বিলান ক্ষেত্রে অত অধিক চাষ দেওয়ার আবশ্যক হয় না। কুড়ী ও বিলান ক্ষেত্র সুলাল হইলে দোয়ার কোথাও বা তেয়ার চাষেই বুনানী করা যাইতে পারে। পচান হইলে চারি চাষ পর্য্যন্ত লাগিয়া থাকে। কিন্তু কোপানী জমিতে দোয়ারের অধিক চাষ লাগে না। তাহাতে মৈ কিছু বেশী দিতে হয়। রোয়ার জমিতে খরা শুখনার সময় দোয়ার দিয়া রাখিলে দোয়ারেই উত্তম কাদা হইতে পারে।

কার্ত্তিকে চাষ।

বৈশাখ মাসে যে লাঙ্গলে দেড় বিঘা জমি চষিতে সক্ষম হয়, কার্ত্তিক মাসের চাষের সময় সেই লাঙ্গলে দিনমানে এক বিঘার অধিক জমি চষিতে পারে না। তাহার কারণ এই যে, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ হইতে কার্ত্তিক মাসের দিন কিছু ছোট হইয়া যায়, এবং বর্ষার জলে মাটিতে কাঁচল ধরিয়া মাটি অপেক্ষাকৃত কঠিন হইয়া উঠে। বৈশাখি চাষের সময় পরিশুষ্ক মাটিতে জল পাইয়া চাষে চাষে মাটি যেমন গোলালো হইয়া যায়, কার্ত্তিক মাসের চাষে বর্ষা খাওয়া কাঁচল মাটি সেরূপ গোলালো হইয়া উঠে না। কার্ত্তিক মাসের প্রতি চাষের পর মৈ ঘর্ষণ করিয়া ঢেলা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়; তথাপি মাটি বেশ প্লেন হয় না, অনেক গুটি থাকিয়া যায়। বিশেষতঃ মেটেল মাটিতে অধিক ঢেলা হইয়া থাকে, তাহা কিছুতেই গুড়া হয় না। যাহা হউক, বৈশাখ মাসের চাষ হইতে কার্ত্তিক মাসের চাষে কৃষককে দ্বিগুণ পরিশ্রম

করিতে হয়, তথাপি বৈশাখ মাসে এক লাঙ্গলে যত জমি বুনানী করা হয়, কার্ত্তিক মাসে তত হয় না। তবে যেখানে সেচনের সুবিধা ও ছিটানের উপায় আছে, সেখানে হইতে পারে, কিন্তু অন্যত্র নহে। কিন্তু আমাদের দেশে সেচনের সুবিধা নাই; যে বৎসর কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে জল না হয়, সেবার উচ্চ ভূমি মাত্রেই পতিত থাকিয়া যায়। আশ্বিন মাসের মধ্যে যাহা বুনানী হয়, জলাভাবে তাহাতেও শস্য ভাল জন্মে না।

ধান্য বুনানীর নিমিত্ত ফাল্গুন, চৈত্র, ও বৈশাখ মাসে যে সকল ক্ষেত্রে চাষ দেওয়া যায়, শীত ও গ্রীষ্ম প্রভাবে ঐ সকল ক্ষেত্র প্রায় পরিশুষ্ক অবস্থায় থাকে। সুতরাং এই দেবমাতৃক দেশে শস্য কর্ত্তনের পর যোয়ের প্রতীক্ষা করিতে হয়। কিন্তু শস্য বুনানীর চাষের সময় সে প্রতীক্ষা নাই। যে সকল ক্ষেত্রে রবি শস্য বুনানী করা যায়, তাহার কোন জমিতে আশু ধান্য ও কোন জমিতে আমন ধান্য বুনানী করা থাকে। প্রদেশ বিশেষে কোথাও বা কিছু পরিমাণে পচান জমিও থাকা সম্ভব। আর যে প্রদেশে ধান্য বুনানী করা হয় না, তথাকার সমস্ত জমিতেই প্রায় বারমেসে চাষ দেওয়া থাকে।

বর্ষার পর ভাদ্র আশ্বিন মাসে কুড়ী ও বিলান ক্ষেত্র সকল জলনিমগ্ন হইয়া থাকে এবং উচ্চ ভূমি মাত্রেই বেশ সরস থাকিতে দেখা যায়। ঐ সময় পচান ও বারোমেসে চাষের জমিতে অধিক পরিমাণে চাষ দিয়া রাখা যাইতে পারে। আর আশু ধান্যের জমিতে এক দিকে যেমন ধান্য কর্ত্তন করিতে হয়, অন্যদিকে তেমন সাজ সুমার দোয়ার চাষ ও দুই পালা মৈ দিয়া রাখিতে হয়। ধান্য কর্ত্তনের পর ক্ষেত্রে এক দিবসের জন্য গোরুর পাল চরাইতে দেওয়া যাইতে পারে (১)। কিন্তু প্রত্যহ ঐ সকল ক্ষেত্রে গোরু বিচরণ করিতে দেওয়া উচিত নহে।

কাচল ধরা মৃত্তিকা গবাদি পশুর পদদলিত হইলে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠে। ইতর ভাষায় তাহাকে "চেঙ্গটা ধরা" বলে। চেঙ্গটা ধরা মাটি লাঙ্গলের ফালে কাটিয়া উঠে না ও ভাল পরিচালিত হয় না; এবং যে

(১) ধান্য কর্ত্তনের সময় জমি যদি শুষ্ক অবস্থায় থাকে, তবেই গোরু চরিতে দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু কর্দ্দময় ভূমিতে গোরু নামিতে দেওয়া উচিত নহে। কাদা জমি গোরুতে দলাইলে মাটি এরূপ পিলাইয়া যায় যে, তাহাতে লাঙ্গল বহিতে পারা যায় না।

অত্যন্ত মাটি পরিচালিত হয়, তাহা শিলাখণ্ডের ন্যায় কঠিন হইয়া থাকে, মৈ দিয়া ভাঙ্গা যায় না। চেঙ্গটা মাটিতে শস্য বীজ বপন করিলে গাছ অধিক তেজস্বী হয় না। অতএব কার্ত্তিকে চাষের মাটি পশুবর্গের পদদলিত হইয়া যাহাতে চেঙ্গটা না ধরে, তদ্বিষয়ে কৃষকদিগের দৃষ্টি রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য।

চেঙ্গটা ধরা মাটি উত্তমরূপ পরিশুষ্ক হইয়া পুনর্ব্বার জলসিক্ত হইলে চেঙ্গটা দোষ শুধরাইয়া যাইতে পারে। কিন্তু কার্ত্তিকে চাষের সময় এরূপ প্রতীক্ষা করা শুভকর নহে। বিশেষতঃ ধান্য কর্ত্তনের পর অনতিবিলম্বে ক্ষেত্রে দোয়ার চাষ দিলে মাটি যেমন "গুকড়" দেয়, গৌণকল্পে দশ ঘা চাষেও মাটি সেরূপ পরিচালিত ও পরিপাটি হয় না। ধান্য কর্ত্তনের পর ক্ষেত্রে যত শীঘ্র চাষ দেওয়া যায়, চাষের পক্ষে ততই সুবিধা হইয়া থাকে।

ধান্য বুনানীর সময় অগ্রে কুড়ী ও বিলান ক্ষেত্র বুনানী করিয়া পশ্চাৎ উচ্চ ভূমি সকল বুনানী করা হয়; কিন্তু প্রকৃতির গতিক্রমে খন্দের এয়ামে অগ্রে উচ্চ ক্ষেত্র সকল বুনিয়া পরে নিম্ন ভূমি সকল বুনানী হইয়া থাকে। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে বিলান ও কুড়ী ক্ষেত্র মাত্রেরই প্রায় জলমগ্ন থাকা সম্ভব, ঐ সময়ের মধ্যে উচ্চ ক্ষেত্রের বুনানী সমাপ্ত করিয়া রাখিতে হয়। তদনন্তর নিম্ন ক্ষেত্রের জল শুখাইয়া যেমন যেমন মৃত্তিকায় যো ধরিতে থাকে, অমনি দোয়ার তেয়ার চাষ দিয়া বুনানী করিতে সমর্থ হওয়া যায়। ঐ সময় যদি উচ্চ ক্ষেত্র বুনানী করিবার অপেক্ষা থাকে, তবে এক ক্ষেত্রের বুনানী করিতে করিতে অন্য ক্ষেত্রের যো উথরাইয়া যাইতে পারে। উথরাণ বা টানালো যোয়ে খন্দ বীজ বুনানী করিবার বিধি নাই। খন্দের বীজ ঠিক ভরাবতরে বুনানী করিতে হয়। কিন্তু জল সেচনের উপায় থাকিলে, তাহার যো, পর যো দেখিবার তত আবশ্যক হয় না। এদেশে জল সেচনের তত সুবিধা নাই এবং কার্ত্তিক মাসে বৃষ্টিরও বড় অভাব হইয়া পড়ে, সেই জন্য কার্ত্তিকে চাষে কৃষকদিগকে বিশেষ সতর্ক হইয়া কায করিতে হয়।

আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে ক্ষেত্রে যে চাষ দেওয়া যায়, তাহাতে যে কেবল মাত্র খন্দেরই উপকার হইয়া থাকে এমন নয়, উহাতে বৈশাখী চাষেরও বিস্তর আনুকূল্য হইয়া থাকে। হেমন্ত ও শীত ঋতুতে ক্ষেত্রে অধিক চাষ দেওয়া থাকিলে, বৈশাখ মাসে অতি অল্প চাষেই মাটি বিলক্ষণ গোলালো হইয়া উঠে।

বিশেষতঃ আশু ধান্যের ক্ষেত্র সকল হেমন্ত বা শীত কালে উত্তমরূপ চষা না থাকিলে, ধান্য ভাল জন্মে না। সুতরাং খন্দের এগ্রামে আশু ধান্যের ক্ষেত্র সকল পরিপাটি করিয়া চষিতে হয়; তাহাতে ধান্য ও খন্দ উভয়েরই উপকার দর্শে।

হৈমন্তিক ধান্য সুপক্ক হওয়া পর্য্যন্ত যে সকল বিলান ক্ষেত্রের যো উথরাইয়া যাওয়া সম্ভব, ঐ সকল ক্ষেত্রের জল নিঃসরণ সময়ে ধান্য বর্ত্তমান থাকিতে, পলির উপর খন্দ বীজ ছিটানী করা যাইতে পারে। পতিত মাত্রেই বীজ গুলি পলির মধ্যে অর্দ্ধ ভাগ বসিয়া যায়। এইরূপ যো পরীক্ষা করিয়া খন্দের বীজ ছিটান করা কর্ত্তব্য। ছিটানে যব, গোম, ও ছোলা তত প্রশস্ত নহে। কিন্তু যোমত ছিটাইতে পারিলে, মসিনা, রাই, মটর, তেওড়া, মশুর, কলাই প্রভৃতি অপর্য্যাপ্ত জন্মিয়া থাকে। বিলান ক্ষেত্র ও নূতন চরের মাঠ ভিন্ন অন্যত্রে ছিটান করিলে, বিশেষ ফলপ্রদ হয় না। সুকোমল মৃত্তিকা হইলে কোন কোন কুড়ী ক্ষেত্রেও ছিটান করা যাইতে পারে; কিন্তু চুণে মোটেলে নহে। আর যে সকল ক্ষেত্রের ধান্য পরিপক্ক হওয়া পর্য্যন্ত যো থাকা সম্ভব বলিয়া বোধ হয়, তথায় ছিটান না করিয়া চাষ বুনানী করা ই কর্ত্তব্য। নিম্ন ভূমিতে উৎকৃষ্ট গোম জন্মে।

আবাদের তাৎপর্য্য।

মৃত্তিকা, জল, তাপ, ও বায়ু সংযোগে বৃক্ষ লতাদির বীজ অঙ্কুরিত হইয়া একাংশ মূলরূপে ভূগর্ভে প্রবেশ করে, অপরাংশ ঊর্দ্ধ দেশ ভেদ করিয়া উঠিতে থাকে। তদনন্তর মূলাংশ দ্বারা ভুগর্ভস্থ শক্তি আকৃষ্ট হইয়া বৃক্ষ লতাদির কাণ্ড দেশে উৎক্ষিপ্ত হয়, এবং ক্রমে ঐ শক্তি শাখা প্রশাখা ও পত্রাদি সর্ব্বত্রে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু অল্প আবাদি বা অকৃষ্ট ক্ষেত্রে জাত উদ্ভিজ্জের মূল কঠিন মৃত্তিকা ভেদ করিয়া শীঘ্র ভূগর্ভে বিস্তৃত হইতে পারে না। তজ্জন্য সম্পূর্ণ অবয়বের উপযুক্ত মত তেজাকর্ষণের ব্যতিক্রম ঘটিয়া, উদ্ভিজ্জ শ্রেণী নিতান্ত ক্ষুদ্র অবয়ব ধারণ করে। সুতরাং শাখা প্রশাখা সকল প্রসারিত হয় না ও পুষ্প ফলেরও বিস্তর অন্যথা ঘটে। আর ভিন্ন জাতীয় উদ্ভিজ্জ সকল একস্থানে

বর্ত্তমান থাকিলে, পরস্পর তেজাকর্ষণের বিলক্ষণ বিরোধ উপস্থিত হয়। ঐ দোষ পরিহারার্থ ক্ষেত্রের উৎকৃষ্ট রূপ আবাদ করিয়া দিতে হয়।

আবাদের প্রধান অঙ্গ হল-প্রবাহ। পুনঃ পুনঃ হল-প্রবাহে মৃত্তিকার কঠিনত্ব দূর হইয়া মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত কোমল হইয়া উঠে এবং তৃণাদি আগাছা সকল বিলুপ্ত হইয়া যায়। তথায় শস্য বীজ বপন করিলে, সুকোমল মৃত্তিকা ভেদ করিয়া শস্যমূল বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে এবং বিজাতীয় উদ্ভিজ্জ শ্রেণীর অভাব প্রযুক্ত নির্ব্বিরোধে যথোপযুক্ত তেজাকর্ষণ করিয়া, আপনারা বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া উঠে ও সময়মত প্রচুর পরিমাণে শস্য প্রসব করিয়া থাকে। বীজ বপনের পর ক্ষেত্রে যে তৃণাদি বহির্গত হয়, তাহাও শস্যাদির পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকারী। ঐ সকল নিপাতের জন্য মৈ, বিদে, নিড়ানী ইত্যাদি যন্ত্র সকল ব্যবহার করা যায়।

এস্থলে অনেকে বলিতে পারেন যে, গ্রামে প্রান্তরে ও অরণ্যে যে সকল বৃক্ষ লতাদি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা প্রায়ই অনাবাদি ক্ষেত্রে জন্মিয়া থাকে, অথচ তাহাদের অবয়ব নিতান্ত নিস্তেজ নহে ও পুষ্প ফলেরও অত্যন্ত অভাব হয় না। কিন্তু কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলে এ আপত্তি অনায়াসে নিরাকৃত হইতে পারে। অনাবাদি ক্ষেত্রে যে সকল বৃক্ষ লতাদি জন্মে, তাহাদের মধ্যে অনেক জাতীয় উদ্ভিজ্জ দীর্ঘায়ু ও বৃহদাকার। তাহাদের সফলতার সময় তিন, চারি, বা ততোধিক বৎসর। ঐ কালের মধ্যে বৃক্ষ লতাদির মূলাগ্র প্রথমতঃ অতি সঙ্কোচভাবে ভূগর্ভের কঠিন মৃত্তিকা ভেদ করিয়া নিম্ন দেশে প্রবেশিতে থাকে। সূর্য্যোত্তাপে ভূপৃষ্ঠ যেরূপ পরিশুষ্ক ও কঠিন হয়, ভূগর্ভে সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিতে না পারায় সেরূপ হইবার সম্ভব নাই। সূর্য্য রশ্মির অভাবে তথাকার মৃত্তিকা সর্ব্বদা সরস ও কোমল থাকে। ঐ কোমল মৃত্তিকায় অবতীর্ণ হইলে, বৃক্ষমূল তাহা অনায়াসে ভেদ করিতে সক্ষম হয় ও বহুস্থান বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তখন সম্পূর্ণভাবে তেজাকর্ষণ করিয়া বৃক্ষ সকল বিলক্ষণ তেজস্বী হইয়া উঠে, এবং ক্রমে বৃক্ষের শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইয়া পূর্ণ অবয়ব প্রাপ্ত হয়।

বৃক্ষতলে তৃণ ও আগাছা যাহা জন্মে, তাহাদিগের মূল বৃক্ষমূলের সম-স্থান-ব্যাপী নহে। জাতি বিশেষে ভূপৃষ্ঠ হইতে পাঁচ সাত বা ততোধিক হস্ত

নিম্নতল পর্য্যন্ত বৃক্ষমূল অবতীর্ণ হইয়া থাকে। কিন্তু তৃণ ও আগাছার মূল ভূপৃষ্ঠের অর্দ্ধহস্ত হইতে দুই হস্তের অধিক নিম্নে আর গমন করে না। সুতরাং মূল দ্বারা তেজাকর্ষণের পরস্পর কোন বিরোধ উপস্থিত হয় না। এইজন্য গ্রামে প্রান্তরে ও অরণ্য মধ্যে আগাছা ও তৃণ সমাকীর্ণ অনাবাদি ক্ষেত্রে নানা জাতীয় দীর্ঘায়ু তরু লতাদি জন্মাইতেছে। ঐ বৃক্ষতলের মৃত্তিকা যদি উত্তমরূপ আবাদ করিয়া দেওয়া যায়, তবে বৃক্ষের তেজ অনেক বৃদ্ধি পায় সন্দেহ নাই। বৃক্ষতলের মৃত্তিকা সর্ব্বদা কঠিন ও সমপৃষ্ঠ হইয়া থাকে, তথায় বৃষ্টি বারি পতিত মাত্রেই মৃত্তিকার গাত্র ধৌত করিয়া স্থানান্তরে নিঃসৃত হইয়া যায়। ঐ বৃক্ষতল খনন করা থাকিলে, মৃত্তিকার কঠিনত্ব দূর হয়; তদুপরে পতিত বারি রাশি অনায়াসে কোমল মৃত্তিকা ভেদ করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করে এবং তৎসঙ্গে ভূপৃষ্ঠের কিয়দংশ তেজ অধোনিমগ্ন হইয়া বৃক্ষের তেজ বৃদ্ধি করিতে পারে।

আচট জমিতে যে সকল তৃণ ও আগাছা জন্মে, তাহাদিগকে আমরা আজন্মকাল সেই ভাবেই দেখিয়া আসিতেছি। আমরা তাহাদিগকে যে অবস্থায় অবলোকন করি, তাহাই তাহাদের পূর্ণ অবয়ব মনে করিয়া থাকি, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। ঐ সকল তৃণ ও আগাছা আবাদি জমিতে হইলে তাহারা দ্বিগুণেরও অধিক বর্দ্ধিত হইতে পারে। আমাদের কৃষি ক্ষেত্রে যে সকল তৃণ আগাছা জন্মে, তাহাদের প্রতি দৃষ্টি পাত করিলে, এবিষয় বেশ বুঝিতে পারা যায়।

তৃণ ও আগাছার মধ্যে ওষধি বাচক উদ্ভিজ্জ শ্রেণীর প্রকৃতি বৃক্ষ লতাদির তুল্য নহে। তাহাদিগের জাতি বিশেষে আয়ুঃ পরিমাণ তিন মাস হইতে এক বৎসর। কচিৎ কাহারও বা কিঞ্চিৎ অধিককাল দেখিতে পাওয়া যায়। এই অল্প কালের মধ্যে তাহাদিগের উৎপত্তি, বৃদ্ধি, ফল প্রসব, ও জীবনান্ত পর্য্যন্ত সমুদয় কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ওষধিবাচক অচিরস্থায়ী উদ্ভিজ্জ শ্রেণীর মূল সকল ভূগর্ভের যত দূর অধিকার করে, তাহার উদ্ধতম সীমা অর্দ্ধ হস্ত হইতে দেড় হস্ত মাত্র। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ভূপৃষ্ঠ সূর্য্যোত্তাপে সর্ব্বদাই পরিশুষ্ক ও কঠিন হইয়া থাকে। সুতরাং ওষধিবাচক উদ্ভিজ্জ শ্রেণীর মূলাধিকৃত মৃত্তিকা স্বভাবতঃ কোমল নহে বলিয়া, শিকড় গুলি আদৌ বিস্তৃত

হইতে পারে না। এই জন্য স্বভাবোৎপন্ন ওষধিবাচক উদ্ভিজ্জ সকল নিতান্ত অপূর্ণাবস্থায় অবস্থিতি করে। আর এই জাতীয় উদ্ভিজ্জ শ্রেণী অত্যুচ্চ পর্ব্বত শেখর হইতে সমুদ্রোপকূল পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া আছে।

কৃষি ক্ষেত্রে, ধান্য, গোধুম, তৈলশস্য, দাইল শস্য, কার্পাস, তামাকু, ইক্ষু, পাট প্রভৃতি যে সমস্ত শস্য উৎপন্ন হয়, তত্তাবতই প্রায় ওষধিবাচক। এবং তাহাদের আকৃতি প্রকৃতি সমুদয় তৃণ ও আগাছারই তুল্য। ঐ সকল উদ্ভিজ্জ শ্রেণীর মূলও সমস্থান-ব্যাপী। তাহারা একস্থানে থাকিলে তেজাকর্ষণ করিতে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয়, এবং কর্ষণের দ্বারা ভূপৃষ্ঠস্থ মৃত্তিকার কঠিনত্ব দূর করিয়া না দিলে, ধান্য, গোধুম ইত্যাদি কৃষি-জাত উদ্ভিজ্জ সকল, তৃণসমাকীর্ণ অনাবাদি ক্ষেত্রে মূল্য বিস্তার করিতে না পারিয়া, নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। গাছ দুর্ব্বল হইলে, ফলোৎপাদনের বিঘ্ন হইয়া যায়। কিন্তু কৃষি ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন না হইলে, কৃষকদিগের পরিশ্রমের পুরস্কার ও কৃষি কার্য্যের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। লাভের জন্যই কৃষিকার্য্য. কিন্তু ক্ষেত্রে ফসল না হইলে লাভ হওয়া ত দূরের কথা, বরং মূলধন পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া যায়।

যে কৃষক অনাবাদি ক্ষেত্রে শস্য-বীজ বপন বা রোপণ করে ও উপযুক্ত সময়ে শস্য ক্ষেত্রের পারিপাট্য সাধনে অসমর্থ হয়, সে আশানুরূপ ফল লাভে বঞ্চিত হয়, এবং লোকসানের দায়ে ও উৎসাহ ভঙ্গ যন্ত্রণানলে তাহার অন্তর্দাহ হইতে থাকে। সে অনল কিছুতেই নির্ব্বাপিত হয় না। এ সম্বন্ধে কৃষকেরা একটি বচন বলে; যথা, "ভগ্ন কৃষি, হৃদয় রোগ। কুলটা ভার্য্যা, পুত্র শোক। বিমাতার কারণে বৈরি বাপ। সহনে না যায়, এ পঞ্চতাপ।"

এই নিমিত্ত পূর্ব্বে' উক্ত হইয়াছে যে, ক্ষেত্রের উৎকৃষ্টরূপ পারিপাট্য সাধন করিতে হইলে যদি এক খাদা স্থলে বার বিঘার উর্দ্ধ বুনানী না হয়, সেও বরং শত গুণে ভাল, তথাপি কোন কৃষক যেন অনাবাদি বা অল্প কর্ষিত ক্ষেত্রে শস্য বীজ বপন বা রোপণ না করে।

ক্ষেত্র কর্ষণের স্থূল স্থূল বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইল। কিন্তু চাষের পরেই বীজ বপন করিতে হয়। অতএব এস্থলে বীজ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক হইতেছে।

বীজ সংস্থান।

কৃষি ক্ষেত্রে যে বীজ ব্যবহার করা যায়, ঐ বীজ কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয়, এবং সকল জাতীয় উদ্ভিজ্জ বীজ হইতে জন্মে কি না, সংক্ষেপে তদ্বৃত্তান্ত কথনে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

কতকগুলি উদ্ভিজ্জ আছে, বীজ হইতে তাহাদের উৎপত্তি হয় না। ঐ সকল উদ্ভিদের মূল দেশে চোখ্ থাকে, তাহা প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ স্ফীত হইয়া উঠে। তদনন্তর তথা হইতে বৃক্ষাঙ্কুররূপ একটি শাখা বহির্গত হয়; তাহাকে বোগ বা কোঁড়া বলে। তলদেশ খনন করিয়া ঐ বোগের মূল স্থান কাটিয়া তুলিতে হয়। অন্য স্থানে রোপণ করিলে তাহা হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর মধ্যে বাঁশ, মান, প্রভৃতি কতক গুলি উদ্ভিদের প্রায় সচরাচর পুষ্প ফল উৎপন্ন হয় না; কিন্তু ক্বচিৎ কখন পুষ্পোদ্গম ও ফলোৎপন্ন হইলে (১) এদেশের কৃষকেরা তাহা অমঙ্গলের চিহ্ন স্বরূপ বিবেচনা করে। এই শ্রেণীর উদ্ভিদ্ মধ্যে আবার কদলি প্রভৃতি কতকগুলি গাছের পুষ্প ফল উভয়ই উৎপন্ন হয়। কলার বীজে গাছ হইতে পারে (২)। কিন্তু সচরাচর বীজ হইতে গাছ প্রস্তুত করা অপেক্ষা চারা লাগানই সুবিধা। আদা, হরিদ্রা, গোল আলু, আরারুট, ওল, কচু (৩), প্রভৃতি অপর কতক গুলি উদ্ভিদ্ মূল হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের উৎপত্তির নিয়ম, বাঁশ বা

---

(১) হিমালয়ের জঙ্গলে বাঁশের বীজে বাঁশ জন্মাইতে দেখা গিয়াছে। গোমের সহিত বাঁশ বীজের অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে। সন ১২৮০ বঙ্গাব্দের দুর্ভিক্ষে রংপুর জেলার অনেক লোকে বাঁশের চাউলের ভাত খাইয়া জীবন ধারণ করিয়াছিল।

(২) হিমালয়ের জঙ্গলে যে সকল কলাগাছ আছে, তাহার কলা অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং কাপাসের [illegible] মত বীজে পরিপূর্ণ বলিয়া, মনুষ্য তাহা ভক্ষণ করিতে পারে না। ঐ বীজ হইতে গাছ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যশোহর জেলা হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্ব বঙ্গের কলার ভিতরেও বিস্তর বীজ দেখিতে পাওয়া যায়। নদীয়া প্রভৃতি অন্যান্য জেলারও কোন কোন বাগানের কদলীর মধ্যে কখন কখন দুই চারিটা বীজ জন্মিয়া থাকে।

(৩) কচুর কাণ্ডার গায়ে যে বীজ থাকে, তাহাতে গাছ জন্মাইতে দেখা গিয়াছে।

কদলীর মত নহে। একাল পর্য্যন্ত ঐ সকল গাছেরও বীজ উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না। কিন্তু উহাদের মধ্যে কোন কোন উদ্ভিদের পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। ঐ সকল উদ্ভিজ্জকে মূলজ উদ্ভিদ্ বলা যাইতে পারে।

ইক্ষু, সাকরকন্দ আলু, ও পান, প্রভৃতি কতকগুলি উদ্ভিজ্জ শাখা হইতে উৎপন্ন হয়। ইহাদিগকে শাখাজ উদ্ভিজ্জ বলা যায়। ইহাদেরও ফল ফুল হয় না। তবে কোন কোন জাতীয় ইক্ষুর ফুল ফুটিয়া থাকে।

ধান্য, গোধুম, আম্র, জাম, কাঠাল, খেজুর, তাল, নারিকেল, প্রভৃতি বহু জাতীয় উদ্ভিজ্জ, ফল ও ফলের মধ্যস্থিত কোন বিশেষ পদার্থ (বীজ) হইতে জন্মিয়া থাকে। ইহাদিগকে ফলজ উদ্ভিজ্জ বলে।

পেয়ারা, আমড়া প্রভৃতি এবং অন্যান্য স্থূল-বল্কল উদ্ভিজ্জ মাত্রই প্রায় শাখা হইতে উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু ইহাদের পুষ্প ফলেরও অভাব নাই। ফল হইতেও অতি উৎকৃষ্ট বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। এই উদ্ভিজ্জ শ্রেণীর নাম উভজ উদ্ভিজ্জ বলা যাইতে পারে।

পটল প্রভৃতি কোন কোন উদ্ভিদের মূল, শাখা, ও ফল, ত্রিবিধ পদার্থ হইতেই গাছ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। ইহাদিগকে ত্রিবিধজ উদ্ভিজ্জ বলা যাইতে পারে।

মূলজ ও শাখাজ উদ্ভিদের বীজ সংস্থান এই স্থলে লিখিত হইল না। তত্তৎ উদ্ভিদ বৃত্তান্তের প্রথম অংশেই তাহা প্রকাশিত হইবে। এক্ষণে ধান্য, গোধুম, রাই, মসিনা, ছোলা, অরহর, মাস, মসুর প্রভৃতি ফলজ উদ্ভিদেরই বীজ প্রস্তুতের প্রকরণ নিম্নে প্রকাশিত হইতেছে।

বৃক্ষ লতাদির ফল ও ফুলের অভ্যন্তরস্থ কোন বিশেষ পদার্থ (দানা বা আঁটী) সচরাচর বীজ শব্দে উক্ত হইয়া থাকে। বীজের উৎপাদিকা শক্তি শীঘ্র বিনষ্ট হয় না। শত শত বৎসরের পুরাতন বীজে গাছ বহির্গত হইতে পারে। কোন গ্রন্থকর্ত্তা লিখিয়াছেন যে, মিসর দেশের এক সমাধি মন্দিরে তিন হাজার বৎসরের একটা পলাণ্ডু প্রাপ্ত হওয়া যায়। মৃত্তিকা সংযোগে তাহাতে গাছ বহির্গত হইয়াছিল। মুলার পুরাতন বীজে গাছ জন্মিয়া থাকে। পঞ্চাশ বৎসরের পুরাতন ধান্য মৃত্তিকা সংযোগে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতে দেখা গিয়াছে। একবার একজন কৃষক নূতন বীজের অভাব

প্রযুক্ত দুই বৎসরের পুরাতন মসিনা ক্ষেত্রে বপন করে, তাহাতে অতি উৎকৃষ্ট মসিনা জন্মিয়াছিল।

যাহা হউক, বীজের উৎপাদিকা শক্তি যে শীঘ্র বিনষ্ট হয় না, যদিও এ বিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তথাপি পুরাতন দোষাশ্রিত বীজ কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। দোষশূন্য অভিনব বীজে যেরূপ বৃক্ষাদি জন্মে, শুমধরা পুরাতন বীজে কদাচই সেরূপ সম্ভবে না। এদেশের কৃষকেরা এবিষয়ে বিশেষ বিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহাদের অনুমোদিত নিম্নলিখিত মতানুসারে বীজ প্রস্তুত করা শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হয়।

বৃক্ষের ফল সুন্দর রূপ পরিপক্ক হইলে, আপনাপনি বৃন্তচ্যুত হইয়া ভূতলে নিপতিত হয়। তাহাকে "গলন" বলে। নারিকেল, সুপারি প্রভৃতি কতকগুলি বৃক্ষের গলনের ফল হইতে উৎকৃষ্ট গাছ জন্মিয়া থাকে। কিন্তু ধান্য, গোধূম, তিল, অরহর, প্রভৃতি শস্য সমূহের গলনের অপেক্ষা করিলে চলে না। ঐ সকল শস্য সুপক্ক হইলে সত্বরে কাটিয়া লইতে হয়। যে শস্যরাশির বীজ করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা কর্ত্তনের পর এক স্থানে স্তুপাকার করিয়া রাখা কর্ত্তব্য নহে। কাঁচনাড়ি গাছ সশস্য পালা দিয়া রাখিলে, উত্তাপ সমুদ্ভূত হইয়া অনেকাংশে বীজের উৎপাদিকা শক্তি খর্ব্ব করিয়া ফেলে। তদুৎপন্ন বৃক্ষের তেজের অনেক হানি হইতে পারে, এমন কি, তাহার অধিকাংশই মরিয়া গিয়া থাকে। অতএব বীজের নিমিত্ত, ধান্যাদি কর্ত্তন করিয়া খামারে বিছাইয়া দিতে হয়। রৌদ্রে কিঞ্চিৎ পরিশুষ্ক হইলে, মলাই করিয়া গাছ হইতে বীজগুলি পৃথক করিয়া লইতে হয়। পরে কুলায় করিয়া উড়াইলে উহার গরদা বাহির হইয়া যায়। অন্য কোন উদ্ভিদের বীজ তাহার সহিত মিশ্রিত থাকিলে, চালনে বা রাজিতে চালাই করা কর্ত্তব্য। রাজি-চালা বীজ অতি বিশুদ্ধ, তাহাতে অন্য দ্রব্য কিছু মাত্র মিশ্রিত থাকে না। ঐ বিশুদ্ধ বীজ পুনঃ পুনঃ রৌদ্রে শুখাইয়া নীরস হইলেই বীজ প্রস্তুত হইল।

ধান্য বীজের সামান্য এক প্রকার পরীক্ষা আছে। একটি পরিশুষ্ক ধান্য আড় ভাবে দুই অঙ্গুলিতে ধরিয়া কর্ণগোচরে চাপিলে খট্ খট্ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। এই রূপ দশ গোনেরটি ধান্য ক্রমান্বয়ে পরীক্ষা করিলে,

সকল গুলি হইতেই যদি মট্ মট্ শব্দ বাহির হয়, তবে আর তাহাতে কোন দোষ থাকে না, এবং সেই বীজই বিশুদ্ধ বীজ। খন্দ বীজের এরূপ কোন পরীক্ষা নাই, তাহা অত্যন্ত পরিশুষ্ক হইলেই বীজ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কি ধান্য কি খন্দ বীজ প্রস্তুত হইলে, যত্নাতিশয় সহকারে বিশুদ্ধ স্থানে এমন ভাবে রাখিতে হয়, যেন তাহাতে কোন ময়লাদি না জন্মে। গোলায় ধান্য বীজ থাকিলে, বেঁশে পোকায় তাহার দুই চারিটা ভক্ষণ করিয়া থাকে; তাহাতে অধিক অনিষ্ট হয় না। কিন্তু খন্দের বীজে কীট লাগিলে সমস্ত নষ্ট করিয়া ফেলে। কীট নিবারণের জন্য খন্দের ভুষি ও নিম নিসিন্দার পাতা খন্দ বীজের সহিত একত্রে মিশ্রিত করিয়া এবং তলায় ও উপরে আচ্ছাদন দিয়া রাখিতে হয়। বীজ অল্প হইলে কলস বা জালায় করিয়া রাখা যায়। তাহার মুখে ভস্ম বা বালি আচ্ছাদন দিয়া রাখিলে কীট প্রবেশ করিতে পারে না। খন্দের মধ্যে মাস কলাই ও মসিনায় একাল পর্য্যন্ত কীট লাগিতে দেখা যায় নাই।

কোন সেঁতা জায়গায় বীজ রাখিতে নাই। জলীয় বাষ্প বীজের গায়ে লাগিলে তাহার উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্য গোশালায়, সূতিকাগারে, ও রন্ধন গৃহে বীজ রাখিবার ব্যবস্থা কৃষি-পরাশরে নাই, এবং বন্ধ্যা, রজস্বলা, গর্ব্ভিণী, নবপ্রসূতি, ও অশুচি ব্যক্তিদিগকে বীজ স্পর্শ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। কিন্তু অতি যত্ন সহকারে রক্ষিত যে বীজ, তাহাও কখন কখন অবীজ হইতে দেখা গিয়াছে। বোধ হয়, পূর্ব্বোক্ত কোন না কোন কারণেই তাহা ঘটিয়া থাকে। বিশেষ গোমের বীজে কিছু মাত্র ছুৎ সয় না। অতি সামান্য কারণে তাহার উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। আর কোঁটা ঘরের নীচের তালায় বীজ রাখিলে সে বীজে প্রায়ই গাছ ভাল হয় না।

আম্র, কাঁঠাল, জাম প্রভৃতি কতকগুলি বীজের এরূপ পারিপাট্য সাধনের আবশ্যক করে না, এবং তাহা বৎসরান্তেও রোপিত হয় না। ফলের ভিতর হইতে বীজ বাহির করিয়া পুঁতিলে অনায়াসে বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। বরং বিলম্ব হইলে অনেকটা হানি হওয়া সম্ভব।

বীজ বপনের নিয়ম।

ক্ষেত্রের পরিমাণবিশেষে কোন ক্ষেত্রে অল্প, কোন ক্ষেত্রে বা অধিক বীজ পতিত হয়। বিঘা প্রতি সকল শস্য বীজ সমান হারে পতিত হয় না। শস্য বিশেষে বিস্তর ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে। উদ্ভিদ্ প্রকরণে প্রত্যেক শস্য প্রসঙ্গে তাহা প্রকাশিত হইবে।

বীজ অল্প হইলে মাথার মোটে, অধিক হইলে গাড়ি সংযোগে ক্ষেত্রে উপস্থিত করিতে পারা যায়। যে ক্ষেত্রে যে দিন বীজ বুনানী করা হয়, সে দিবস সেই ক্ষেত্রে লাঙ্গ মোড়া দোয়ার চাষ দেওয়া আবশ্যক, নতুবা অনেক স্থানের মৃত্তিকা অপরিচালিত থাকিয়া যায়। সেই অপরিচালিত মৃত্তিকায় যে বীজ পতিত হয়, তাহার গাছ সতেজ হয় না।

সকল শস্য বীজ এক নিয়মে পতিত হয় না। কোন শস্য বীজ দোয়ার চাষের নীচে, কোন শস্য বীজ এক চাষের নীচে, কোন শস্য বীজ চাষের উপরে পতিত হয়। বিঘার হারে শস্য বিশেষে ওজনের পরিমাণ যেমন এক নহে, তেমনি বুনানীর সময়ে "কচ্" ধারণের নিয়মও একরূপ নহে। উদ্ভিদ্ প্রকরণে তাহা বিস্তারিত রূপে লিখিত হইবে। তবে কি প্রণালীতে বীজ বপন করিতে হয়, এস্থলে কেবল তাহাই বলা যাইতেছে।

বীজ বপনের সময় অনায়াসে মুট ধরিয়া বীজ তুলিয়া লইতে পারা যায়, এমন একটি আধারে, অর্থাৎ ধামায় অথবা চেঙ্গারিতে বীজগুলি রাখিয়া, তদনন্তর আধারটি বাম হস্তের দ্বারা বাম পার্শ্বের কটীতটে ধারণ করিতে হয়। ক্ষেত্রের সমুদয় সীমানা সম্মুখে ও দক্ষিণ পার্শ্বে রাখিয়া নির্দ্দিষ্ট একটি কোণে, আইলের তিন হস্ত ব্যবধানে গিয়া দাঁড়াইতে হয়। দক্ষিণ হস্তে পূর্ণমুষ্টি বীজ লইয়া হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক ছড়াইয়া দিলে বীজগুলি গোট্ গোট্ ভাবে পতিত হইয়া যায়। কিন্তু মুষ্টিস্থিত সমুদয় বীজ যুগপৎ ক্ষেপণ করা কর্ত্তব্য নহে। এক মুষ্টি বীজ শস্যবিশেষে দুই কচে, তিন কচে, ও চারি কচে ছড়াইবার রীতি আছে। বীজ বপনের সময়, সহজ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দ্রুত পদে ক্রমশঃ ঠিক ঋজুভাবে অগ্রসর হইতে হয়। দক্ষিণ হস্তে বীজ বপনের কদাচ বিরাম হইবে না। প্রসারিত হস্ত অগ্রপশ্চাৎভাবে

আলোড়িত হইতে হইতে যেমন বীজ নিঃশেষ হইয়া যায়, অমনি মুহূর্ত্ত মধ্যে বীজাধার হইতে বীজ উঠাইয়া লওয়া চাই। কিন্তু সজোরে ভিন্ন দুর্ব্বল হস্তে বীজ ছড়াইলে, সে বীজ চৌরস হইয়া পড়ে না।

এইরূপে বীজ ছড়াইতে ছড়াইতে ক্ষেত্রের এক সীমা হইতে অপর সীমায় গিয়া উপস্থিত হওয়া যায়। অপর সীমাস্থ সম্মুখের আইল তিন হস্ত ব্যবধান থাকিতে দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরিয়া ও আইলটি বাম ভাগে রাখিয়া ঠিক সোজাসুজি চারিপদ অগ্রসর হইতে হয়। তথায় অর্দ্ধ ঘূর্ণায়মান হইলে, পশ্চাৎবর্ত্তী ভূমি সম্মুখবর্ত্তী হইয়া থাকে। তথা হইতে আবার বীজ বপন করিতে করিতে ক্ষেত্রের অপর সীমায় গিয়া উপনীত হইতে হয়। এবার সম্মুখের আইল তিন হাত তফাৎ থাকিতে বামাবর্ত্তে ঘূর্ণায়মান হওয়া আবশ্যক। এইরূপ কখন বামাবর্ত্তে কখন দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরিয়া ফিরিয়া, এক আইল হইতে অপর আইল পর্য্যন্ত বীজ বুনিতে বুনিতে পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিলে ক্ষেত্রের কোন স্থানে প্রায় বীজ পড়িতে বাকি থাকে না। ইহাকে একবান্ বীজ বোনা বলে। পুনর্ব্বার ইহার বিপরীত ভাবে আর একবান্ বীজ বুনিতে হয়। প্রায় সকল জাতীয় শস্য বীজই দুই বানে বুনানী করা আবশ্যক। নতুবা বীজ সকল স্থানে বেশ চৌরস হইয়া পড়ে না এবং হস্ত-বিরাম স্থলে বীজের অভাব হইয়া যায়। দুইবান বীজ বপনের হস্ত বিরাম যদি দৈবাৎ এক স্থানে হয়, তবে তথায় পুকুরে পড়িয়া থাকে।

প্রথমে বীজ বপনের সময় যে তিন পদ ভূমি ব্যবধান রাখা হয়, কুত্রাপি তাহার ন্যূনাধিক্য ঘটিলে চলে না, আগা গোড়া ঐ ব্যবধান ভূমি ঠিক সমান থাকা আবশ্যক করে। কোন স্থানে পাই প্রশস্ত হইলে তথাকার একাংশ ভূমি বীজশূন্য হইয়া যায়; তাহাকে "পেয়ে পড়া" বলে। কোন স্থানে পাই সঙ্কীর্ণ হইলে বীজ পড়া ভূমিতে যদি পুনশ্চ বীজ পতিত হয়, তাহাকে "গত চাপা" কহে। অতএব বীজ বপনের সময় যে তিন পদ ভূমি মাপিয়া লওয়া যায়, ক্ষেত্রের এক দিকের সীমা হইতে অন্য দিকে যাইবার সময় তাহার কোথাও প্রশস্ত কোথাও সঙ্কীর্ণ না হয়, সে পক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া এ আইল ও আইল যাতায়াত করা কর্ত্তব্য। অপর পৃষ্ঠায় অঙ্কিত চিত্র ক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করিলে বীজ বপনের নিয়ম বুঝিতে পারা যায়।
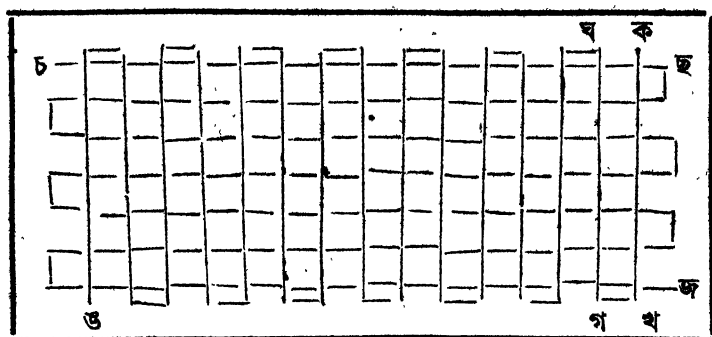
প্রথমতঃ ক চিহ্নিত স্থান হইতে বীজ বপন আরম্ভ করা হইয়াছে। তথা হইতে সরল রেখা ক্রমে খ চিহ্নিত স্থানে গিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরিয়া চারি পদ গমন করিলেই গ চিহ্নিত স্থানে যাওয়া যায়। তথায় পুনশ্চ দক্ষিণাবর্ত্তে অর্দ্ধ ঘূর্ণায়মান হইলেই পশ্চাৎ ভূমি অগ্রস্থিত হয়। তাহার পর বীজ বুনিতে বুনিতে ঋজুভাবে ক্রমাগত অগ্রসর হইলে ঘ চিহ্নিত স্থানে উপনীত হওয়া যায়। ঘ চিহ্নিত স্থানে গিয়া বামভাগে ঘুরিতে হয়। তদনন্তর কখন বামাবর্ত্তে কখন দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরিয়া ফিরিয়া ঙ চিহ্নিত স্থানে উপস্থিত হইলে একবান বীজ বপন সমাপ্ত হয়। আর একবান বীজ বপনের সময় প্রথমতঃ চ চিহ্নিত স্থান্ হইতে ছ চিহ্নিত স্থানে গিয়া, তাহার পর পূর্ব্বগতির নিয়মানুসারে জ চিহ্নিত স্থানে উপস্থিত হইতে পারিলেই দুইবান বীজ বপন সমাপ্ত হইয়া যায়। যে কোন বীজ হউক, এক কোয়ার্টার সময়ের মধ্যে এক বিঘা জমি একজন কৃষকে বুনানী করিতে সক্ষম হয়। বীজ বপন সম্বন্ধে একটি বচন ছিল, তাহার অধিকাংশই প্রাচীন কৃষকদিগের সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাইয়া গিয়াছে। এক্ষণে কয়েকটি কথা মাত্র শুনিতে পাওয়া যায়। যথা, "ঘন সরিষা, পাতলা রাই। ন্যাঙ্গে ন্যাঙ্গে কাপাষ চাই" ইত্যাদি।

বপনের পর চাষ ও মৈ দিয়া বীজ ঢাকিয়া দিতে হয়। কিন্তু সর্ষপ, তিল, নীল, প্রভৃতি ক্ষুদ্র দানা বিশিষ্ট কতক গুলি শস্যের অঙ্কুর অধিক মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠিতে পারে না। তজ্জন্য ঐ সকল শস্যের বীজ চাষের উপর ফেলাইয়া মৈ দিয়া রাখিতে হয়। কিন্তু ধান্য, মসিনা, ছোলা, প্রভৃতি স্থূলদানা

শস্য সকলের বীজ বপনের পর এক বা চাষ দিয়া তাহার পর মৈ দেওয়া আবশ্যক করে।

বীজ বপনের পর চাষ দিবার সময় লাঙ্গল অধিক চাপিয়া ধরিলে বীজ গভীর মৃত্তিকা তলে গিয়া পতিত হয়, তাহাতে চারা ভাল বাহির হয় না। সুতরাং বুনানী চাষ ছেও লাঙ্গলে অলগা করিয়া দিতে হয়। কিন্তু গোমের বীজ সম্বন্ধে সেরূপ নিয়ম নহে। গোমের বীজ বুনানীর পর বাই লাঙ্গলে দোয়ার চাষ দেওয়া আবশ্যক করে। গোমের বীজ যত মাটির তলায় যায়, ততই ভাল হয়। উপরে থাকিলে ফাল্গুণ মাসের হাওয়ায় গোমের গাছ উল্টাইয়া পড়ে।

ধান্য বুনানীর এয়ামে বৈশাখী চাষের সময় প্রতি চাষে মৈ দিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ধান্য বুনানীর পর তাহার আবাদের নিমিত্ত অনেক পালা মৈ দেওয়া আবশ্যক করে। এমন কি, ধান্যের বাওয়ালী আধ হাত পরিমাণে দীর্ঘ হইলেও তখন পর্য্যন্ত মৈ দেওয়া যায়। আর খন্দের এয়ামে ভুমি চষিবার সময় প্রতি চাষের পর একপালা, দুইপালা মৈ দিয়া মাটি গুড়াইয়া দেওয়া হয়। সুতরাং খন্দ বুনানীর পরে দুই পালা মৈ দিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। খন্দের বীজে অঙ্কুর হইলে আর মৈ দিতে নাই। খন্দের অঙ্কুরে বা চারায় মৈ দিলে সমূলে নির্ম্মূল হইয়া যায়।

সকল প্রকার বীজই ভরা বত্তরে (পূর্ণ যোয়ে) বুনানী করা কর্ত্তব্য (১)। কিন্তু কখন কখন পরিশুষ্ক মাটিতে ধান্য বীজ বপন করা যায়। তাহাকে "কাকৃড়ি"

---

(১) বীজ বপনের জন্য এক প্রকার কল প্রস্তুত হইয়াছে। এক্ষণে কোন কোন কৃতবিদ্য যুবকের সংস্কার যে, ঐ কল আমাদের দেশে প্রচলিত হইলে ভাল হয়। তাঁহাদের বিশ্বাস, এ দেশের কৃষকেরা হাতে বীজ বপন করায়, বীজ অনেক বেশী পড়িয়া লোকসান হইয়া থাকে, কলে বীজ বপন করিলে অল্প বীজই কার্য্য সমাধা হইবে। কিন্তু তাঁহাদের এ বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রমাত্মক। এ দেশের কৃষকেরা বীজ বপনের সময় যেরূপ পারদর্শিতা দেখাইয়া থাকে, তাহা দৃষ্টি করিলে অবাক্ হইতে হয়। তিলের বীজ অতি ক্ষুদ্র, ॥৵৹ দশ ছটাক তিলের বীজে এক বিঘা জমি বুনানী করা হইয়া থাকে। প্রথমতঃ ।৵৹ পাঁচ ছটাক বীজে একবার্ বুনানী করিলা অপর পাঁচ ছটাক বীজের দ্বারা তাহার বিপরীত ভাবে আর একবার বুনানী করা হয়। পাঁচ ছটাক বীজে এক বিঘা ভুমি কৌশলরূপে বুনানী করা বিশেষ পারদর্শিতার কার্য্য। যাহা হউক,

করা হলে। খন্দ বীজ কাকড়ি করিবার ব্যবস্থা নাই। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, নরম বত্তরে চাষ দিলে মাটি শিলাইয়া চেঙ্গটা ধরিয়া যায়।* তথায় কোন শস্য বীজ বপন করিলে গাছ নিস্তেজ হইয়া পড়ে। ফল কথা, নরম বত্তরে যখন ক্ষেত্রে চাষ দিবার ও গবাদি পশু বিচরণের নিষেধ হইতেছে, তখন তথায় বীজ বপন করা কিরূপে সম্ভবে। তবে ধান্য কিঞ্চিৎ নরম বত্তরে বুনানী করিলে তাদৃশ হানি হয় না। ধান্য বুনানীর পর বর্ষাও সমাগত হয়, সুতরাং ক্ষেত্র কখন পরিশুষ্ক কখন জলসিক্ত হইয়া চেঙ্গটা দোষ শুধরাইয়া যায়। কিন্তু খন্দের সময় তাহা হয় না। বিশেষতঃ ছোলা মসীনা প্রভৃতি খন্দের বীজ অত্যন্ত নরম বত্তরে বুনানী করিলে বা বুনানীর পর অধিক বৃষ্টি হইলে অধিকাংশ স্থলেই বীজ প্রায় পচিয়া যায়, তাহাতে চারা বাহির হয় না। তবে কোন শিবেটান ও ক্রমনিম্ন ক্ষেত্রে চারা বাহির হইলেও তাহাতে জোর ধরে না।

যে কৃষকেরা ॥৶০ দশ ছটাক বীজে এক বিঘা জমি বুনানী করিতে সক্ষম হয়, তাহাদের হাতে অকারণে ধান্যবীজ অধিক পড়িয়া নষ্ট হইয়া থাকে, এ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অমূলক বলিতে হইবে। তবে এস্থানে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, আড়াই সের হইতে চারি সের ধান্য বীজে যখন এক বিঘা জমি রোয়া হয়, সেস্থলে বুনানীর সময় ষোল সের ধান্য বীজ ফেলাইবার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন আছে। আশু ধান্যের ও বাগড়ো আমনের আবাদের নিমিত্ত মৈ বিদে এবং রাড়ী আমনের আবাদের জন্য মে বিদে এবং কাড়ান চাষের আবশ্যক হয়। সহস্র চাষের জমি হইলেও মৈ বিদে ও কাড়ান চাষ ভিন্ন ধান্য আদৌ জন্মে না। ঐ বিদে মৈ ও কাড়ান চাষে আট সের বীজের চারা নষ্ট হইয়া অবশিষ্ট আট সের বীজের গাছ জমিতে থাকে। কিন্তু আট সের বীজ বপন করিয়া তাহাতে পাঁচ ছয় হইতে সাত আট পালা মৈ বিদে দিতে গেলে সমুদয় চারা উঠিয়া যায়। অবশিষ্ট যে দুই চারিটা গাছ থাকে, তাহাতে ভুমি ঠিক গড়ে না। এখন কলেই ফেল, আর হাতেই ফেল, বিঘা প্রতি আশু ধান্য বীজ ষোল সের ও আমন ধান্য বীজ বার সের বুনানী করিতেই হইবে। তবে রোয়াতে বীজ যে অনেক কম লাগে, তাহার কারণ রোয়া ধান্যে যেরূপ ঝাড় হয়, বোনা ধান্যে সেরূপ হয় না। আর বিলের রই যোয়াইলে দোয়ার চাষ দিয়া কালবয়রা মুক্তাহার প্রভৃতি ধান্য সকল বনে খড়ে বুনানী করা যায়, তাহাকে বাওড়া বুনানি বলে। ঐ সকল ধান্য-আজান মাটির উপর জলের জোরে ভাসিয়া উঠে। এই জন্য মৈ বিদে অধিক দিবার আবশ্যক হয় না। সুতরাং বাওড়া বুনানীতে আট সের দশ সের বীজ হইলেই যথেষ্ট হইতে পারে। যে জমি জলের তলে বহুকাল পর্য্যন্ত পতিত থাকে, তাহাকে আজান মাটি বলে।

শস্য ক্ষেত্রের পারিপাট্য।

ধান্য প্রভৃতি শস্য বীজ বপনের পর ক্ষেত্রে নানা জাতীয় তৃণ সকল বহির্গত হইয়া থাকে। তাহাদের সংখ্যা যে কত তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। বিশেষতঃ উচ্চ ক্ষেত্রে তৃণের এত প্রাদুর্ভাব যে দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। পতিত উর্ব্বরা ক্ষেত্র সমুদয় সর্ব্বদাই নানা জাতীয় তৃণপুঞ্জে সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকে; ঐ তৃণ পুঞ্জ কুত্রাপি বিচ্ছিন্ন নহে। কিন্তু পতিত ক্ষেত্রের তৃণ সকল নিতান্ত তেজহীন, এবং নানা কারণ বশতঃ তাহারা একেবারে মৃত্তিকার সহিত মিশাইয়া থাকে বলিলেই হয়। আবাদি ক্ষেত্রের তৃণের ভঙ্গী সেরূপ নহে। কর্ষিত ক্ষেত্রের তৃণ সকল অতীব তেজস্বী এবং উচ্চতার ও বিস্তারের পরিমাণও অপেক্ষাকৃত অতিরিক্ত। বৎসর বৎসর বিবিধ উপায় দ্বারা শস্য ক্ষেত্রের খড় সকল ধ্বংশ করা যায়। কিন্তু রক্তবীজের ঝাড়ের ন্যায় তাহারা কিছুতেই নির্ম্মূল হইবার নহে। অল্পদিনের মধ্যেই আবার কোথা হইতে সমুদ্ভূত হইয়া সমুদয় স্থান আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

একমাত্র মরুভূমি ভিন্ন গ্রীষ্ম মণ্ডল হইতে হিম মণ্ডল পর্য্যন্ত এবং পর্ব্বতের চির নীহার সীমা ও জলস্থল, কুত্রাপি তৃণের অভাব নাই। যে দিকে দৃষ্টি করা যায়, সেই দিকেই দেখিতে পাওয়া যায়, নানা জাতীয় তৃণ সকল মনোহর হরিদ্বর্ণে ভূষিত হইয়া ধরা মণ্ডলের পরম রমণীয় শোভা সম্পাদন করিতেছে। কিন্তু তৃণ সকল এক দিকে যেমন নানা কারণে জগতের হিত সাধন করে, অন্য দিকে তেমনি কৃষকদিগের ও কৃষি ক্ষেত্রের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে। ধান্যাদি শস্য বীজ বপনের পর যদি ক্ষেত্রের কোনরূপ আবাদ করা না হয়, তবে কৃষককে সে ক্ষেত্রের শস্যের প্রাপ্তি আশায় বঞ্চিত হইতে হয়। ভূগর্ভে অধিক সংখ্যক তৃণ মূল বিস্তারিত হইয়া শস্য মূল বিস্তারের প্রতিরোধ করে, এবং ক্ষেত্রের তেজাংশ আকর্ষণ করিয়া আপনারা হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া উঠে। মূল দ্বারা ভূগর্ভ যেমন অধিকার করিয়া লয়, তেমনি শাখা প্রশাখা বিস্তার করতঃ উর্দ্ধ স্থানে সদৃঢ় সত্ববান হইয়া ধান্যাদি শস্য সমূহের উন্নতির প্রতিরোধ করিয়া থাকে।

ধান্যাদি বর্ষোৎপন্ন শস্য সমূহ বুনানীর পর শামাদি বীজ খড় ও কেশে কুশ প্রভৃতি কাট খড় যাহা বহির্গত হয়, তাহাদের বিনাশের নিমিত্ত মৈ, বিদে,

নিড়ানী ইত্যাদি যন্ত্র সকল ব্যবহৃত হয়। আর শস্য বিশেষে কোথাও কাড়ান চাষ এবং কোথাও বা খোড় দেওয়ার আবশ্যক করে। তদ্ভিন্ন শস্য রক্ষার নিমিত্ত ক্ষেত্রের আবরণ দেওয়ার প্রয়োজন হয়। সময়ে সময়ে বৃষ্টির অভাব হইলে জল সেচন করিয়া দিতে হয়।

অতঃপর মৈ বিদে পরিচালনার রীতি, নিড়াইবার পদ্ধতি, ও কাড়ান চাষ, খোড় প্রভৃতি কার্য্য সকলের প্রণালী ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে।

মৈ দিবার রীতি।

উপরে মৈয়ের প্রতিরূপ প্রকাশিত হইল। একখানি সরল বাঁশ মধ্যস্থলে চিরিয়া দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ক, ক, ক, ক চিহ্নিত ঐ খণ্ড দ্বয়ের নাম "পাটী"। পাটীর মধ্যস্থলে শ্রেণীবদ্ধ ছিদ্র মধ্যে কয়েকটী বংশ-শলাকা সংযোজিত করা হইয়াছে। ঐ বংশ-শলাকাগুলির নাম "কোয়া"। কোয়ার মধ্যস্থলে খ চিহ্ন দেওয়া গিয়াছে। গগগগ চিহ্নিত স্থানে ছিদ্র আছে। ইতর ভাষায় তাহাকে "দড়ার বিঁধে" বলে।

একজন কৃষকের ব্যবহৃত মৈয়ের নাম "একছেয়া মৈ" বলে। একছেয়া মৈয়ের পরিমাণ দীর্ঘে চারি হাত, উহা দুই বলদের দ্বারা পরিচালিত হয়। আর চারি বলদে পরিচালিত দুই জন কৃষাণের ব্যবহৃত যে মৈ, তাহাকে "দো ছেয়া মৈ" বলে। দোছেয়া মৈয়ের দৈর্ঘ্য পরিমাণ সাড়ে সাত হাত হইবে। দো ছেয়া মৈ পরিচালনের জন্য দুই খানি যোয়ালের আবশ্যক করে। যোয়ালের দড়া মৈয়ের ছিদ্র মধ্য দিয়া বন্ধন করিয়া দিতে হয়। তদনন্তর মৈয়ের দুই দিকে দুই জন কৃষাণ দণ্ডায়মান হইয়া গরু ডাকাইয়া গেলেই মৈ পরিচালিত হইতে থাকে।

যে প্রণালীতে আঁতর বেড়িয়া লাঙ্গল বহন করা যায়, সেই প্রণালী অনুসরণ ক্রমে পালা ঘিরিয়া মৈ দিতে হয়। যে ভাবে চাষ দেওয়া গিয়াছে, সেই

ভাবে যদি মৈ দেওয়া যায়, তবে তাহাকে "চাষ মৈ" বলে। চাষের বিপরীত ভাবে মৈ দিলে, তাহাকে "ঝাপান মৈ" কহা যায়। ঢেলা গুড়া করিবার জন্য প্রতি চাষের পর চাষ মৈ দেওয়া উচিত, এবং বীজ বুনিবার পর ঝাপান মৈ দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু তিল, সরিষা প্রভৃতি অতি ক্ষুদ্র শস্য বীজ বুনানীর পরে চাষ মৈ দেওয়া গিয়া থাকে। এক কালীন দুই পালা মৈ দিতে হইলে, প্রথম পালার বিপরীত ভাবে দ্বিতীয় পালা দিতে হয়।

মৈ কৃষিকার্য্যের যে বিশেষ উপকারী যন্ত্র, তাহার সন্দেহ নাই। মৈ ঘর্ষণ ব্যতীত কর্ষিত ক্ষেত্রের ঢেলা সকল গুড়া হয় না, এবং উচু নীচু সমান না হইয়া লাঙ্গলের শিরালার মাটি অমনি অসমান থাকিয়া যায়। তাহাতে শস্য ক্ষেত্রের আবাদ করার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা ঘটে। বিশেষতঃ কর্ষিত মৃত্তিকা আল্‌গা থাকিলে, তাহার ভিতরে তাপ ও বায়ু প্রবেশ করিয়া অতি শীঘ্র শীঘ্র শুখাইয়া মৃত্তিকার তল পর্য্যন্ত নীরস হইয়া উঠে। কিন্তু মৈ ঘর্ষণের দ্বারা কর্ষিত মৃত্তিকা খুব করিয়া চাপিয়া দিলে, সে দোষ ঘটিতে পারে না। মৈয়ে আঁটা মাটি অনেক দিন পর্য্যন্ত সরস থাকিতে দেখা যায়। কার্ত্তিক মাসে রবিখন্দ বুনানীর সময় মাটি শীঘ্র শীঘ্র টানিয়া যায়; সে সময় চাষের পর মৈ ঘর্ষণ ভিন্ন ক্ষেত্রের যো রক্ষা করিতে পারা যায় না।

পূর্ণ যোয়ের মাটিতেও যদি শস্য বীজ বপন করিয়া মৈ ঘর্ষণের দ্বারা মাটি উত্তম রূপে চাপিয়া দেওয়া না হয়, আর যদি ঐ সময়ে কিছু দিন ধরিয়া বৃষ্টির অভাব হইয়া যায়, তবে পূর্ব্ব রসে বীজ সকল অঙ্কুরিত হইতে হইতেই, তাপ ও বায়ু সংস্পর্শে আলগা মাটি এত সত্বর পরিশুষ্ক হইয়া উঠে যে, তাহাতে আর চারা বাহির হয় না। রসের অভাবে সমুদয় অঙ্কুর শুখাইয়া যায়। ইহাকে "রস কাকড়ি" বলে। বৃষ্টি অথবা মৈ ঘর্ষণ বিনা রস কাকড়ি নিবারণের উপায় নাই। তবে টানালো যোয়ে বীজ বপন করিয়া তাহাতে মৈ ঘর্ষণ করিলে, কোন উপকার দর্শে না।

ধান্যের চারা কিঞ্চিৎ বড় না হইলে, তাহার অন্য রূপ আবাদ করা চলে না। কিন্তু যে সময় ধান্যের চারা বহির্গত হয়, তখন ধান্যের সঙ্গে সঙ্গে অনেক তৃণ-বীজও অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। সে সময় একমাত্র মৈ ঘর্ষণ ভিন্ন

সেই সকল তৃণাঙ্কুর নিপাতিত করিবার অন্য কোন উপায় নাই। ধান্য-ক্ষেত্রের এই একটি প্রধান কার্য্য মৈয়ের দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

কর্ষিত ক্ষেত্রে ও বিছুটী ক্ষেত্রে যে মৈ দেওয়া যায়, তাহার পৃথক রূপে যোয়ের পরীক্ষা করিতে হয় না। লাঙ্গল বহন সমাপ্তির পরেই মৈ দেওয়া যাইতে পারে। কাকড়ি করা ক্ষেত্র জল-সিক্ত হইলে নরম বা উখরাণ বতরে মৈ না দিয়া, ঠিক পূর্ণ যোয়ে মৈ দিতে হয়। কিন্তু বাওয়ালি ক্ষেত্রে নরম বা ঠিক পূর্ণ যোয়ে মৈ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। বাওয়ালি ক্ষেত্রের মৃত্তিকার চটি কিঞ্চিৎ মাত্র সরস থাকিলেই মৈয়ের ঘর্ষণে বাওয়ালি সকল উপড়াইয়া যায়, এবং উখরাণ বতরেও মৈ দিতে গেলে তাহাতে কোন উপকার দর্শে না। অতএব নয় ভরা যো, নয় উখরাণ যো, এরূপ মধ্যবৃত্ত যোয়ে বাওয়ালি মৈ দিতে হয়। এক মাত্র ধান্যের বাওয়ালি ভিন্ন অন্য কোন শস্যের বীজ অঙ্কুরিত বা চারা বাহির হইলে, তাহাতে মৈ দিতে নাই।

বাওয়ালি মৈ অতি প্রত্যুষ হইতে চারি ছয় দণ্ড বেলার মধ্যে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। নীহার উত্তম রূপে পরিশুষ্ক হইলে, বেলা এক প্রহরের পর হইতে নাগাইদ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বাওয়ালি মৈ দেওয়া যাইতে পারে।

বিদে পরিচালনা।

কৃষিকার্য্যোপযোগী অতি জঘন্যাকার যন্ত্র সকল মহান্ গুণে ভূষিত দেখিয়া অবাক হইতে হয়। এক যন্ত্রের পর অন্য যন্ত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া উত্তরোত্তর অধিক উপকারী বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। এই এখনই বলিয়া আসিলাম, মৈ কৃষিকার্য্যে প্রধান উপকারী যন্ত্র। আবার পরক্ষণেই বিদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বোধ হইতেছে যে, কৃষিকার্য্যোপযোগী যতগুলি যন্ত্র আছে, তন্মধ্যে বিদেই সর্ব্ব প্রধান। যাহা হউক, বিদে না থাকিলে ধান্য ক্ষেত্রের পারিপাট্য সাধন কোন মতেই হওয়া উঠিত না। বিশেষতঃ আশু ধান্যের ক্ষেত্রে বিদে না দিলে, আবাদ করিয়া উঠা কাহারও সাধ্য নহে। অধুনা বিদের বিবরণ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। বিদে যন্ত্রকে কোন কোন প্রদেশের কৃষকেরা "লাঙ্গলী" বলিয়া থাকে। আবার কোন প্রদেশে বা "আঁচড়া"ও বলে।
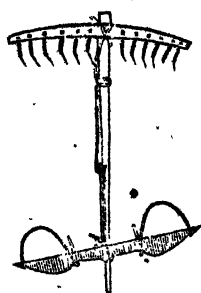
প্রাদেশ প্রমাণ পরিসর, পঞ্চাঙ্গুলি বেধ, এবং আড়াই হস্ত দীর্ঘ, এক খানি গঠিত কাষ্ঠ হয়। তাহাকে "গড়" (১) বলে। গড়ের পরিসরের মধ্য স্থলে ঈষৎ বক্রাকার দ্বাদশটি ছিদ্র আছে। ঐ ছিদ্র মধ্যে বিংশতি অঙ্গুলি দীর্ঘ, দুই অঙ্গুলি পরিমাণ প্রশস্ত চেপ্টাকৃতির বারটি লৌহ শলাকা প্রথিত করা থাকে। শলাকার প্রথমাংশ স্থূল, তাহার একদিক ক্রমশঃ বক্রক্রমে সূক্ষ্ম হইয়া, অগ্রভাগ সূচিকাকার ধারণ করিয়াছে। গড়ের বেধের মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ ছিদ্র থাকে, তন্মধ্যে এক খণ্ড দীর্ঘকার বাঁশ সংযুক্ত করা গিয়া থাকে। গড়, লৌহ শলাকা, ও একখানি বাঁশ একত্রিত হইয়া যে যন্ত্রের অবয়ব সম্পন্ন হয়, তাহার নাম বিদে। এই প্রস্তাবের শিরোভাগে বিদের চিত্রময় প্রতিকৃতি প্রকাশ করা গিয়াছে।

এক গাছা স্থূল রজ্জুর দুই মুখ গড়ের উভয় পার্শ্বে বন্ধন করিয়া, রজ্জুর মধ্যস্থলে ধারণ করতঃ,এক জন কৃষক দুইটি বলিবর্দ্দের দ্বারা বিদে পরিচালিত করিয়া থাকে। বিদে পরিচালনার সময় বাঁশের গায়ে যোয়াল খানি লাগাইয়া, লাঙ্গলাদড়াগাছটি গড়ের গাত্রে বন্ধন করিয়া দেওয়া হয়। ইহারও ছেও বাই পরীক্ষা করা আবশ্যক করে। বিদে কিঞ্চিৎ ছেও হইলে ভাল হয়। ছেও বিদের যেরূপ মৃত্তিকা পরিচালিত হয়, বাই বিদেতে সেরূপ হয় না। বিদের কাটি বিশ অঙ্গুলির মধ্যে গড়ের নিম্নে বার অঙ্গুলি মাত্র সাজান আবশ্যক করে। সমস্ত শলাকার অগ্রভাগ ঠিক সমান করিয়া সাজাইতে হয়।

(১) বিদেগড় বাবলা ও বিল্ব কাষ্ঠ ভিন্ন অন্য কোন কাষ্ঠে প্রস্তত হয় না। বাবলাই উত্তম, তদভাবে বেলকাষ্ঠ।

যেমন জাঁতর বেড়িয়া লাঙ্গল বহন করা যায়, সেই মত পালা ঘেরিয়া বিদে দিতে হয়। লাঙ্গলের প্রথম চাষ যে ভাবে দেওয়া যায়, দোয়ার চাষ তাহার বিপরীত ভাবে চষা হইয়া থাকে। কিন্তু বিদে পরিচালনার নিয়ম সেরূপ নহে। প্রথম পালা যে গতি অনুসারে দেওয়া যায়, তদনন্তর ক্ষেত্রে যত পালা বিদে দিবার আবশ্যক হয়, তত পালাই সেই দিক হইতে ঠিক সেই ভাবে দিতে হয়। কিন্তু বিশেষ নিয়ম এই যে, যদি প্রথম পালা ক্ষেত্রের পশ্চিম আইল হইতে দেওয়া হইয়া থাকে, তবে দ্বিতীয় পালার সময় পূর্ব্ব আইল হইতে পালা আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। এই রূপে একবার পশ্চিম দিক হইতে অন্যবার পূর্ব্ব দিক হইতে সোজা সুজি বিদে দিয়া তাহাতে যদি তৃণ পুঞ্জ উৎপাটিত না হয়, তখন অগত্যা বিপরীত ভাবেই বিদে দেওয়া আবশ্যক করে। তাহাকে "ঝাপান" দেওয়া বলে। ঝাপান বিদে দিলে খড় সকল সমূলে নির্ম্মূল হইয়া যায় ও তৎসঙ্গে ধান্যের বাওয়ালিও বিস্তর উঠিয়া গিয়া থাকে। কিন্তু দুই এক পালা বিদে দেওয়ার পর ঝাপান দেওয়া উচিত নহে। অন্যূন চারি পালার পর তবে ঝাপান দেওয়া কর্ত্তব্য।

বিদে পরিচালনার সময় হস্তধৃত রজ্জুতে বিশেষ টান রাখিতে হয়। লৌহ শলাকা গুলিকে ভূগর্ত্তে অধিক দূর প্রবেশ করিতে না দিয়া, কেবল উপর উপর মাটি চালনা করাই কর্ত্তব্য কার্য্য। ক্রমশঃ দুই তিন চারি পালা বিদে দিতে দিতে শেষে ভূপৃষ্ঠের চারি অঙ্গুলি পর্য্যন্ত মৃত্তিকা পরিচালিত হইয়া থাকে। তবে কোন স্থানের মৃত্তিকা সহজে পরিচালিত না-হইলে, তথায় হস্তস্থিত পাঁচনির দ্বারা বিদে চাপিয়া ধরা যাইতে পারে। কিন্তু আইলের নিকট পাক ফিরিবার সময়, বিদে এককালীন তুলিয়া ধরিতে হয়।

যে মর্দ্দনের দ্বারা ধান্য ক্ষেত্রের পৃষ্ঠ দেশ ঠিক সমাকৃতি হইয়া উঠিলে, কোন স্থানে ঢেলা বা গুটি দৃষ্টিগোচর হয় না; সেই সময় বিদে দেওয়া আবশ্যক করে। ধান্যের চারা সাত আট অঙ্গুলি উচ্চ না হইলে, বিদে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। বিদে দিবার সময় যো পরীক্ষা করিয়া লইতে হয়। বগাধরা মৃত্তিকার সর্ব্বত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফাটল হইয়া চটি ধরিয়া উঠিলে তাহাকে বিদের পূর্ণ যো বলা যায়। পূর্ণ যোরে বিদে দিলে চটিধরা মৃত্তিকা উত্তম

রূপে পরিচালিত হইতে থাকে। উপর্য্যুপরি দুই তিন পালা বিদে দিলে ক্ষেত্রের কোন স্থানের মৃত্তিকা প্রায় অপরিচালিত থাকে না। বিদের পরিচালিত মৃত্তিকার চটি রৌদ্রোত্তাপে পরিশুষ্ক হইলে, তাহার উপরিস্থিত সমুদয় তৃণাঙ্কুর শুখাইয়া যায়।

মৃত্তিকার চটি কিঞ্চিৎ সরস থাকিতে বিদে দেওয়া কর্ত্তব্য। চটি অত্যন্ত শুখাইয়া গেলে, তাহাকে "ডাকরা যো" বলে। ডাকরা যোয়ে বিদে দিলে, মোটা মোটা চটি ধরিয়া ধানে খড়ে সমুদয় একত্র উঠিয়া যায়। আবার নরম যোয়ে বিদে দিলে, মৃত্তিকা ভাল পরিচালিত হয় না, কেবল আঁচড়াইয়া যায়। সুতরাং ডাকরা যোয়ে বা নরম যোয়ে বিদে দেওয়া উচিত নহে। তাহাতে শস্য ক্ষেত্রের বিশেষ কোন উপকার দর্শে না। বরং অপকার হইয়া থাকে।

শস্য ক্ষেত্রে যে সকল বীজ খড় বহির্গত হয়, তাহাদেরই নিপাতের জন্য ক্ষেত্রে বিদে দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু বিদে পরিচালনার দ্বারা শস্য ক্ষেত্রের আরও কয়েকটি উপকার হইতে দেখা যায়।

১। পুনঃ পুনঃ মৈ ঘর্ষণের দ্বারা ধান্য ক্ষেত্রের মৃত্তিকা অত্যন্ত সংলিপ্ত হইয়া যায়, এবং বৃষ্টি হওয়ার পরে মৃত্তিকার যোগাকর্ষণ শক্তি কথক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই উভয় কারণে মৃত্তিকার যে কিঞ্চিৎ কঠিনতা জন্মে, ধান্যাদি শস্য মূল সকল সুকোমল হেতু সহজে তাহা ভেদ করিতে সমর্থ হয় না, এবং ভূপৃষ্ঠস্থ মৃত্তিকা সর্ব্বদা সংলিপ্ত হইয়া থাকিলে তন্মধ্যে পতিত বৃষ্টিবারি প্রবেশ করিতে না পাইয়া স্থানান্তরে চলিয়া যায়। ভূগর্ভে জল প্রবেশ না করিলে, তত্রত্য উদ্ভিজ্জ সকল তেজস্বী হয় না। অগত্যা ঐ কঠিনতা দূরীভূত করিবার নিমিত্ত, শস্য ক্ষেত্রে খুঁড়িয়া দেওয়া আবশ্যক করে। কিন্তু ধান্যের চারা অত্যন্ত ঘন থাকা প্রযুক্ত, তাহার মধ্যে কোদাল ইত্যাদি যন্ত্রের দ্বারা খোড় দেওয়া চলে না। বস্তুতঃ ধান্য ক্ষেত্রে বিদে কাটির দ্বারা যে মৃত্তিকা পরিচালিত হইয়া থাকে, তাহাতে মৃত্তিকার কঠিনত্ব দূর হইয়া ঠিক খোড় দেওয়ার ন্যায় কার্য্য করে।

২। যে সময় ধান্যের চারা (বাওয়ালি) অতি ক্ষুদ্র থাকে, তখন গ্রীষ্ম প্রভাবে ক্ষেত্রের মৃত্তিকা অতিশয় পরিশুষ্ক হইলে, বাওয়ালি ধান্যের

মূল দেশ পর্য্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া একেবারে দগ্ধ হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু যো মত বিদে দিয়া রাখিতে পারিলে পরিচালিত মৃত্তিকার চটি মাত্র উপর উপর পরিশুষ্ক হইয়া তল দেশ দিব্য সরস থাকিয়া যায়। যতই কেন রৌদ্র হউক না, তাহাতে বিদে দেওয়া ক্ষেত্রস্থ ধান্যের চারার কোন হানি হয় না। বরং বাওয়ালি ধান্যে অধিক তাত পাইলে, ভবিষ্যতে সে ধান্য অত্যন্ত তেজস্বী হইয়া উঠে। এই জন্য প্রবাদ আছে, "বাওলা তাতে, চাষা মাতে"। কিন্তু বিদে দ্বারা মৃত্তিকা পরিচালিত করা না থাকিলে, বাওয়ালিতে অধিক উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া শুখাইয়া যায়।

৩। বিদে-চালিত পরিশুষ্ক মৃত্তিকা বৃষ্টি জলে গলিত হইয়া ধান্যের তেজ বৃদ্ধি করে। বিদের মাটি যত বেশী শুখাইয়া জল পায়, ততই ভাল হয়। কিন্তু বিদে দিবার সময় বা বিদে দেওয়ার পর, এক রাত্রি গত না হইতে যদি অধিক বৃষ্টি হয়, তবে তাহাতে বিশেষ ইষ্ট সাধন না হইয়া, বরং অনিষ্ট হইয়া থাকে। বিদের মাটিতে ধান্য চাপিয়া যায় এবং কাঁচা মাটিতে জল পাইলে তাহাতে চেপটা ধরিয়া থাকে। আর পশ্চাল মারা বৃষ্টিতে বিদের মাটি ধুইয়া গেলে, ক্ষেত্রের বিলক্ষণ শক্তিহীনতা হওয়া সম্ভব।

কি আমন, কি আশু, সকল ধান্যের ক্ষেত্রেই বিদে দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু আশু ও বাগুড়ো আমন ধান্যের আবাদ যেরূপ বিদের উপর একান্ত নির্ভর করে, রাড়ি আমন সম্বন্ধে অবিকল সেরূপ নহে। রাড়ি আমনের মধ্যে যে সকল রোয়ার জমি থাকে, বিদের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধই নাই। তবে বুনানী করা জমিতে বিদে দিলে উপকার দর্শে বটে; কিন্তু নিম্ন ভূমিতে অধিকাংশ সময়েই বিদের যো হইয়া উঠে না। যাহা হউক, রাড়ি আমনের জমিতে বিদে দিতে না পারিলেও, ধান্যের বিশেষ হানি হওয়া সম্ভব নহে। রাড়ি আমনের রোয়া কাড়ান লইয়াই কথা। তাহাতে কাড়ান চাষ না হইলেই, আবাদ বিশৃঙ্খল হইয়া ধান্য আদৌ জন্মে না। কিন্তু বিদে দেওয়া জমিতে কাড়ান চাষ না হইলেও ধান্য জন্মাইতে দেখা গিয়াছে (১)।

(১) ধান্যের আবাদ সম্বন্ধে বিদে যে কি উপকারী যন্ত্র, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। এই বিদে যন্ত্র যিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও সাহসের ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়। ছোট ছোট ধান্যের চারার উপর দিয়া ভারযুক্ত বারটী লৌহশলাকা চালাইতে

প্রত্যুষ হইতে নাগাইদ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বিদে দেওয়া যাইতে পারে। জোড়া বলদ থাকিলে দিনমানে এক জন কৃষক একখানি বিদে দ্বারা বার বিঘা হইতে ষোল বিঘা পর্য্যন্ত ভূমিতে বিদে দিতে সক্ষম হয়। ঠিকা দস্তুরে বিদে দিতে হইলে এক বিঘা জমিতে এক পালা বিদে দেওয়ার মূল্য চারি পয়সা মাত্র। কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে চারি পালা হইতে সাত আট পালা পর্য্যন্ত বিদে দেওয়া আবশ্যক করে। খন্দের জমিতে বিদে দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। তবে কখন কখন ভিটা, পলি, ও বালি মাটি জলের পশালে অধিক আঁটিয়া গেলে, সরিষা ও মসিনার ক্ষেত্রে বিদে দিলে কিছু উপকার দর্শে।

কাড়ান চাষ।

কাড়ান চাষ দিবার নিমিত্ত অন্য কোন পৃথক যন্ত্র ব্যবহার করা হয় না। লাঙ্গলের দ্বারা স্বাভাবিক লাঙ্গল বহনের রীত্যনুসারে কাড়ান চাষ দেওয়া হইয়া থাকে। প্রভেদের মধ্যে, স্বাভাবিক চাষ বিলক্ষণ ঘন করিয়া দিতে হয়, সুতরাং তাহার ভাঁওর শিরালা ভেদ করিয়া চলে। কাড়ান চাষের নিয়ম ঠিক সেরূপ নহে। কাড়ান দিবার সময় পাতলা করিয়া চষিতে হয়। সে চাষের ভাঁওর আধ হাত বা আড়াই পোয়া অন্তরে দেওয়া গিয়া থাকে। কাড়ান চাষ বুনানী করা রাড়ি আমনের পক্ষেই বিশেষ উপকারী, এমন কি কাড়ান চাষ ব্যতীত রাড়ি আমনের গাছ তেজস্বী হইয়া উঠে না। কিন্তু রোয়া ধান্যের জমিতে কাদান চাষ দেওয়া হইয়া থাকে, তজ্জন্য তাহাতে কাড়ান চাষ দিবার আবশ্যক করে না।

নীলের ক্ষেত্রে অধিক তৃণ জন্মিয়া গাছ নিস্তেজ হইলে, তাহার তেজ বৃদ্ধির জন্য কখন কখন কাড়ান চাষ দেওয়া যায়, তাহাকে ছোট চাষ বলে। আমনের জমিতে প্রায় আধ হাঁটু জলে কাড়ান চাষ দেওয়া হয়, কিন্তু নীলের ব্যবস্থা সেরূপ নহে। নীলের জমিতে জল বদ্ধ হয় না। তাহার পূর্ণ যো

কিরূপে সাহসী হইয়াছিলেন, বলা যায় না। ধান্য ক্ষেত্রে বিদে না দিলে যে সকল দোষ ঘটে, বিদে দিলে সেই সকল দোষ শুধরাইয়া যাইবে, ইহা যে তিনি কি রূপে অনুভব করিয়াছিলেন, তাঁহা তিনিই জানেন। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহা আয়ত্ত হইবার নহে।

পরীক্ষা করিয়া তবে কাড়ান চাষ দিতে হয়। একখানি লাঙ্গলে দুই বিঘা জমিতে কাড়ান চাষ দিতে পারে।

বার্ত্তাকু ও কার্পাসের ভূমিতে কাড়ান চাষ দিবার প্রথা প্রচলিত আছে, কিন্তু তাহা অপেক্ষাকৃত ঘন করিয়া দিতে হয়। অন্যান্য শস্য ক্ষেত্রে কাড়ান চাষ খাটে না। তবে এক্ষণে কোন কোন কৃষককে আশু ধান্য কর্ত্তনের পর অরহরের জমিতে কাড়ান চাষ দিতে দেখা যায়। আর কোন কোন প্রদেশে ক্ষুদ্র এক জাতীয় লাঙ্গল প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা মরিচের ক্ষেত্রে কাড়ান চাষ দেওয়া হইয়া থাকে।

কদলীর বাগানে যে চাষ দেওয়া যায়, তাহাকে কাড়ান চাষ বলে না। বাগান চষার নিয়ম স্বাভাবিক চাষ হইতে অধিক বিভিন্ন নহে। তবে বাগান চষিবার সময় গাছ বাদ দিয়া চষিতে হয়, এই মাত্র বিশেষ।

নিড়াইবার পদ্ধতি।
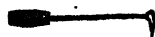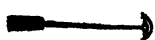
এই প্রস্তাবের শিরোভাগে যে সকল লৌহাস্ত্রের চিত্রময় প্রতিরূপ প্রতি-ষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহাদের প্রথম চিত্রের নাম "নিড়ানী", দ্বিতীয় চিত্রের নাম "কুড়ানী", তৃতীয় অস্ত্রের নাম "বাঁক" বা খুরপী।

১। নিড়ানী। ধান্যাদি শস্য ক্ষেত্রের মধ্যে যে সকল তৃণ জন্মিয়া থাকে, তাহাদের আমূল পর্য্যন্ত কাটিয়া তুলিবার নিমিত্ত, এই যন্ত্র ব্যবহার করা গিয়া থাকে।

প্রথমে লাঙ্গলের দ্বারা মৃত্তিকা পরিচালনের সহিত তৃণ সকল উৎপাটিত হইয়া থাকে। লাঙ্গলে যাহা এড়াইয়া যায়, তাহা কোদাল, ফাওড়া, বা দেঙ্কোর দ্বারা হালী কাটিয়া দেওয়া হয়। তদনন্তর ধান্য বুনানীর পর ধান্যের সহিত এক যোগে যে সকল তৃণ বীজ অঙ্কুরিত হইতে থাকে, মৈ দর্পণে সে সমস্ত প্রায় নির্ম্মূল হইয়া যায়। অতঃপর ধান্যের বাওয়ালী আধ হাত

পরিমাণে উচ্চ হইয়া উঠিলে, তখন আর মৈ দেওয়া চলে না। তখন যে সকল খড় বহির্গত হয়, তাহাদিগকে বিদে পরিচালনার দ্বারা উৎপাটিত ও নিপাতিত করা গিয়া থাকে। মৈ ও বিদের মুখে যাহারা রক্ষা পায় এবং বিদে সমাপ্তির পরে যে সকল তৃণ সমুদ্ভূত হয়, সেই সকল তৃণ নিড়ানীর দ্বারা পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। কৃষকেরা তাহাকে "নিড়ান" কহে, এবং নিড়ান শব্দের অর্থ নির্ম্মল বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকে।

প্রথম যখন বিদের মাটি হাটকাইয়া নিড়ানী করা যায়, তখন যোয়ের প্রতীক্ষা করিতে হয়। সে সময় কাদা হইলে ধানা ক্ষেত্রে নামিতে পারা যায় না। কিন্তু জলের পশ্চালে বিদের মাটি বসিয়া গেলে আর যোয়ের অপেক্ষা করিবার আবশ্যক হয় না। ত্রিবিধ যোয়েই নিড়ানী করা যাইতে পারে। তবে পূর্ণ যোয়ের মাটিতে যেমন স্থচারুরূপ নিড়ানী করা চলে, নরম বা উথরাণ বতরে সেরূপ হয় না। বিশেষতঃ টানালো যোযে ভূমি নিড়ান স্থকঠিন হয়। তাহাতে শস্যের কিছু অনিষ্ট ও ব্যয় বাহুল্য হইয়া পড়ে, এই জন্য শীত কালে খন্দের জমি নিড়াইবার প্রথা প্রচলিত নাই।

মাঠের মধ্যে একাকী কোন কার্য্য করিতে উৎসাহ জন্মে না। এই কারণে সাত আট জন কৃষক একত্রে যোট হইয়া ছাটা করিয়া থাকে। পালি মত ছাটা প্রাপ্ত হইলে কৃষকেরা আপন আপন শস্য ক্ষেত্রের তৃণ পুঞ্জ উত্তম রূপে পরিষ্কার করিয়া লয়। বর্ষোদ্ভব যে কোন শস্য হউক না কেন, তাহার ক্ষেত্র অন্যূন দুই বার নিড়াইয়া দিতে হয়।

নিড়াইবার সময় ক্ষেত্রের সমুদয় সীমানা সম্মুখে ও বাম ভাগে রাখিয়া কৃষকগণকে শ্রেণী বদ্ধ রূপে এক পার্শ্বে উপবিষ্ট হইতে হয়। শস্যের চারা গুলি যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিয়া বাছিয়া বাছিয়া তৃণ সকল ধরিতে হয়। তদনন্তর দক্ষিণ হস্তস্থিত নিড়ানী অস্ত্রের দ্বারা তৃণের মূল দেশে আঘাত করিলে অতি সহজেই কাটিয়া যায়। তখন কিঞ্চিৎ মাত্র আকর্ষণ করিলেই সমূল তৃণ হস্ত মধ্যে উঠিয়া আইসে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ তৃণ সকল উত্তোলিত হইয়া যখন মুষ্টি পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, তখন সাবধানতার সহিত তৃণ গুচ্ছ পশ্চাৎ ভাগে রাখিয়া দিতে হয়। ক্রমে পাই উঠিলে আপন আপন পাইয়ের খড় উত্তোলন করতঃ ক্ষেত্রের আইলে গিয়া নিক্ষেপ করিতে হয়,

অথবা ক্ষেত্র মধ্যে শূন্য স্থান দেখিয়া তথায় স্তুপাকার করিয়া রাখা যাইতে পারে। তৃণস্তুপ পূত হইয়া সারের কার্য্য করে। এ স্থলে প্রত্যেক কৃষকের স্মরণ রাখা উচিত যে, যদি ক্ষেত্র মধ্যে নিড়ান ঘাসের স্থান সঙ্কুলান হয়, তবে তাহা আইলে ফেলা বা অন্য কুত্রাপি স্থানান্তরিত করা কর্ত্তব্য নহে। আর পাইয়ের সীমানা বিংশতি হস্ত বা তাহার ন্যূন হওয়া আবশ্যক করে, বেশী হইলে নিড়াইবার স্থবিধা হয় না।

বিদের মাটি নাড়িয়া চাড়িয়া ছোট বাওয়ালি ধান্য নিড়াইয়া দিলে তাহাকে "ঠুকবাতে নিড়ান" বলে। ঠুকবাতে নিড়াইবার সময় সকল খড় ধরিবার প্রয়োজন হয় না। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খড় গুলিতে নিড়ানীর পাতার আঘাত করিয়া গেলেই মরিয়া যায়। বীজ খড়ের মূল কাটিয়া দিলেই আর তাহা মুকাইতে পারে না। কিন্তু মুথা, কেশে, কুশ প্রভৃতির মূল দেশ ভূগর্ভের অনেক নিম্ন ভাগে অবস্থিত। স্থতরাং ঐ কয়েক জাতীয় খড় নিড়াইবার সময় নিড়ানীর অগ্রভাগ ভূগর্ভে অধিক প্রবেশ করাইতে হয়। মুথার আঁটি না তুলিয়া ডাঁটা মাত্র কাটিয়া দিলে দুই এক দিন পরে আবার যেমন মুথা তেমনই হইয়া উঠে। অতএব তাহার গেঁড় তুলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু কেশে, কুশার মূল উঠান বড় সহজ নহে। কেশে, কুশার বোঁট মাত্র কাটিয়া দিলে শীঘ্র আর গজাইতে পারে না।

উত্তম পাইটের ভূমি হইলে প্রথম বাতে চারি দ্বিতীয় বাতে চারি সর্ব্বশুদ্ধ আট জন কুলীতে এক বিঘা ভূমি দুইবার নিড়াইতে পারে। কিন্তু মুথা-যুক্ত জমি হইলে এক বিঘা জমি একবার নিড়াইতে আট দশ জন মজুর লাগিয়া থাকে। এক জন কুলীর মজুরি দৈনিক দুই আনা কখন বা দশ পয়সাও পড়ে। প্রদেশ ভেদে কুলীর মজুরির অনেক বেশী কমি দেখিতে পাওয়া যায়।

২। কুড়ানী। চিত্রময় নিড়ানীর দক্ষিণ ভাগে, কুড়ানীর প্রতিকৃতি লিখিত হইয়াছে। ঐ অস্ত্র নিড়ানীর ন্যায় তৃণ-নাশক বটে, কিন্তু ধান্য ক্ষেত্রে উহা ব্যবহৃত হয় না। পেঁপুল, মরিচ প্রভৃতি যে সকল ক্ষেত্রে বিদে পরি-চালিত করা যায় না, সেই সকল ক্ষেত্রের তৃণাঙ্কুর বিনাশের নিমিত্ত ঐ অস্ত্র ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু কুড়ানীর নাম ও কার্য্য সকল প্রদেশের

কৃষকেরা অবগত নহে। কেবল পূর্ব্ববঙ্গে উহার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়।

নিয়াগ্র কুড়ানী, হাত বাড়াইয়া সম্মুখের ভূপৃষ্ঠে চাপিয়া ধরিতে হয়। তদনন্তর কোলের দিকে টানিলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণ সকল উঠিয়া আইসে। ইহাতে মৃত্তিকা কিয়ৎ পরিমাণে চালিত হইয়া থাকে। কুড়ানী অস্ত্রে কেশে কুশ প্রভৃতি কাট খড়ের কিছুই হয় না।

৩। খুরপী বা বাঁক। লঙ্কা মরিচের জমিতে চালা দিবার জন্য বাঁকের উৎপত্তি হয়; কিন্তু উহার দ্বারা, চারার গোড়া খোঁড়া, জমি নিড়ানী, ইত্যাদি সকল কার্য্যই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

লঙ্কা মরিচের ভূমিতে চালা দিবার সময়, বাম হস্তের তালুদেশ ভূপৃষ্ঠে স্থাপিত করিয়া তাহার নিম্ন দেশে খুরপী প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়। তাহার পর একটু চাড় দিলেই মৃত্তিকা পরিচালিত হইয়া উঠে। পরিচালিত মৃত্তিকার সঙ্গে যে দুই চারিটা জঙ্গল থাকে, তাহা বাম হস্তে বাছিয়া লইয়া স্থানে স্থানে গুচ্ছ গুচ্ছ করিয়া রাখিয়া দিতে হয়। নিড়াইবার সময় নিড়াইতে নিড়াইতে ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়া যায়। কিন্তু চালা দিবার সময় সেরূপ নিয়ম নহে। মৃত্তিকা চালিতে চালিতে পশ্চাৎ ভাগে পিছাইয়া যাইতে হয়। তাহার পর পাই শোধ হইলে তৃণ গুচ্ছ সকল উঠাইয়া স্থানান্তরে নিক্ষেপ করা হইয়া থাকে। আট জন কুলীতে এক বিঘা ভূমি চালা দিতে পারে।

জলবদ্ধ ধান্য ক্ষেত্রে নিড়ানী করা চলে না। তথাকার তৃণপুঞ্জ হস্ত দ্বারা ধরিয়া টানিলেই উঠিয়া আইসে। ঐ তৃণ সকল স্থানান্তরে নিক্ষেপ করিবার প্রয়োজন হয় না। ক্রমে মুষ্টি পূর্ণ হইলে টাসন দিয়া কর্দ্দম মধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিতে হয়। ইহাকে ভুঁই টানা বলে। ভাল পাইট করা ভূমি হইলে চারিজন কুলীতে এক বিঘা ভূমি টানিতে সক্ষম হয়।

ক্ষেত্র খনন।

কোন কোন শস্য ক্ষেত্রে খোঁড় না দিলে শস্য ভাল জন্মে না। মরসুম বা উখরাপ অন্তরে খোঁড় দেওয়া উচিত নহে। ঠিক পূর্ণ যোয়ের মাটি

পরীক্ষা করিয়া খুঁড়িয়া দিতে হয়। ক্ষেত্র খননের নিয়ম অতি সহজ, কিন্তু তাহাতে অত্যন্ত পরিশ্রম হইয়া থাকে। একখানি পাত কোদাল দুই হস্তে ধারণ করিয়া কুব্জ পৃষ্ঠে হেট মুণ্ডে হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক সজোরে ভূপৃষ্ঠে আঘাত করিতে হয়। কোদালের পাত ভূমধ্যে প্রবেশ করিলে, যৎকিঞ্চিৎ চাড় দিয়া কোদাল কোলের দিকে টানিলেই চেবা উল্টাইয়া পড়ে। যোয়ের মাটি হইলে চেবা উল্টাইয়া পড়িবা মাত্র মাটি ঝুরা হইয়া যায়। যদি কোন চেবা আপনা আপনি ঝুরা না হয়, তবে তাহা কোদালের আঘাত করিয়া ভাঙ্গিয়া দিতে হয়।

তদনন্তর আর এক পদ্ধতি ক্রমে খোঁড় দেওয়া যায়, তাহাকে "ভিলান" বা "ভিলিকাটা" বলে। ক্ষেত্র ভিলানর সময় পূর্ব্ববৎ কোদাল হস্তে দুই জন কৃষক উভয়তঃ পশ্চাদ্বর্ত্তী অথচ কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ হইয়া দাঁড়াইতে হয়। মধ্য স্থলে তিন পোয়া পরিমিত ভূমি ব্যবধান রাখিয়া উভয় পার্শ্বের অথচ কৃষকের অধোভাগস্থ মৃত্তিকা স্থূল ভাবে চাচিয়া ঐ ব্যবধান ভূমির উপর উল্টাইয়া ফেলাইতে হয়। এই রূপে চেবা উল্টাইয়া ফেলিতে ফেলিতে বাম দিকে, নয় দক্ষিণ দিকে আড় ভাবে সোজাসুজ গমন করিলে উভয় কৃষাণের পশ্চাৎ ভাগের মধ্যস্থান আলবাল সদৃশ উচ্চ হইয়া উঠে এবং আলবালের উভয় পার্শ্বের খনিত স্থান কিঞ্চিৎ নিম্ন হইয়া যায়। ক্রমে ক্রমে সমস্ত ক্ষেত্র ঐ রূপ ভিলিকাটা হইলে হস্তান্তরে একটি খাদ ও একটি আলবাল দৃষ্ট হইয়া থাকে। তৃণ-সমাকীর্ণ জমি হইলে নরম বতর এবং ভরা যোয়ে ভিলি কাটা যাইতে পারে। কিন্তু উখরাণ যোয়ে হয় না।

ক্ষেত্র আবরণ।

কৃষকেরা কহে, "আগে বেঁাদ, তাবই খোঁদ"। কিন্তু সমস্ত মাঠ বন্দাবন্দী উঠিত থাকিলে ধান্য ও খন্দ ক্ষেত্রে প্রায় বেড়া দিবার প্রয়োজন হয় না। আর রাস্তার নিকটে ও মাঠের এক প্রান্তে যে সকল ক্ষেত্রের, অবস্থিতি, তথায় এবং ভুৎ, পান, ও উদ্যান প্রভৃতি পাকা বিক্রয় ক্ষেত্রে-গবাদি পশু

ও মনুষ্য বর্গের দৌরাত্ম্য হওয়া সম্ভব। অতএব ঐ সকল ক্ষেত্রে প্রাকার (পগার) বা বেড়া (বৃতি) দেওয়া আবশ্যক করে। পগার ও বেড়ার বিবরণ সকলেই অবগত আছেন বলিয়া এস্থলে তাহা লিখিত হইল না।

শস্য কাটাই মলাই।

কোন কোন ফসল একেবারে সমুদয় সুপক্ক না হইয়া একে একে পাকিতে থাকে। দৈনিক নিয়মে তাহা তুলিয়া লওয়া যায়। যেমন কার্পাষ, মরিচ ইত্যাদি।

মূল জাতীয় শস্য সকল ভূমি কোপাইয়া তুলিয়া লইতে হয়। আর ধান্য ও রবিখন্দ ইত্যাদি শস্য সকল গাছের সহিত এক যোগে পাকিয়া উঠে। তাহাদিগকে কাণ্ডের সহিত একত্রে কর্ত্তন করিয়া লওয়া গিয়া থাকে।

কাচি নামে এক যন্ত্র আছে, প্রস্তাবের শিরোভাগে তাহার চিত্রময় প্রতিরূপ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রদেশ ভেদে তাহাকে কাচি, কাস্তে, এবং কোথাও বা কোদে বলে। কাচির ধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দন্তাকার করিয়া পুরি-কাটান হইয়া থাকে। পুরি না কাটিয়া সহজ ধার রাখিলে তাহাকে হেঁসো বা হাঁশুয়া বলে। উভয় যন্ত্রেই ধান্যাদি শস্য ও ঘাষ ইত্যাদি কর্ত্তন হইয়া থাকে।

যখন দেখা যায় যে গাছ সহিত শস্য সকল দিব্য সুপক হইয়া উঠিয়াছে, সেই সময় শস্যাদি কর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। ক্ষেত্রের এক পার্শ্ব হইতে নিড়া-নীর অনুসরণ ক্রমে পাই বাঁধিয়া শস্য কর্ত্তন করিতে হয়। কর্ত্তনের সময় বাম হস্তের মুষ্টিতে যত গুলি গাছ ধরিতে পারা যায়, একেবারে ধরিয়া গোড়ায় কাচি লাগাইয়া কোলের দিকে টানিলেই গাছ গুলি কাটিয়া যায়।

কর্ত্তিত গাছ গুলি যত্ন পূর্ব্বক পশ্চাৎ ভাগে রাখিয়া দিতে হয়। এই রূপ দুই তিন গুচ্ছ একত্রে রাখিয়া শেষে আটি বন্ধন করা হয়। চাষারা তাহাকে "বিড়ে বান্ধা" বলে। এরূপ আটি না বান্ধিয়া আল্‌গা রাখিয়া দিলে তাহাকে "পাঁজা" বলে।

জলা ভূমির ধান্য ও গোধুম আঁটি বান্ধিয়া লওয়া হয়। পরিশুষ্ক ভূমির ধান্য এবং সমস্ত রবি শস্য পাঁজা ফেলিয়া রাখা হয়। কিন্তু আটিই হউক আর পাঁজাই হউক, শেষে বোঝা বান্ধিয়া খামারে লইয়া যাওয়া হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে কৃষকেরা মাথায় করিয়া বোঝা বহিত, এখন প্রায়ই গাড়ি যোগে শস্য লইয়া যাইতে দেখা যায়।

কাটাই শস্য খামারে আনিয়া স্তুপাকার করিয়া রাখিলে তাহাকে পালা দেওয়া বলে। ধান্য ও গোধুমের বর্হির্ভাগে গোড়া ও অভ্যন্তরে শীষ গুলি সাজাইয়া গোলাকার ভাবে অথবা বাঙ্গালা ঘরের আকারে পালা দিয়া রাখা হয়। কিন্তু ছোলা প্রভৃতি শস্য সকলের ঢিপী করিয়া রাখা ভিন্ন এরূপ পালা দেওয়া হয় না।

আশু ধান্যের খামার (খোলা) কূর্ম্মপৃষ্ট ক্ষেত্র ভিন্ন অন্য কুত্রাপি চাঁচাই করা কর্ত্তব্য নহে। হৈমন্তিক ধান্যের ও রবিখন্দের খামার অত্যন্ত কুড়ি ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য সর্ব্বত্রে করা যাইতে পারে। খামার মাত্রই গোলাকারে চাঁচাই হইয়া থাকে, এবং শস্য বুঝিয়া তাহার আয়তন করা কর্ত্তব্য। খামারের মধ্যস্থলে আটটি বলদ ঘুরিবে ও চতুর্দ্দিকে শস্য পালা থাকিবে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া খামারের আয়তন করা উচিত। কোন কোন প্রদেশের কৃষকেরা মাঠে খামার করে না। তাহারা বাড়ির ভিতরে শস্য মলাই করিয়া থাকে।

খামারের মধ্যস্থলে চারি হস্ত পরিমিত এক খান বাঁশ প্রোথিত করিয়া রাখিতে হয়। তাহাকে "মেই ঠেঙ্গা" বলে। একে একে পালা ভাঙ্গিয়া মেই ঠেঙ্গার চতুর্দ্দিকে শস্যের গাছ সকল বিছাইয়া দিতে হয়। তাহাকে মাড়ন ভাঙ্গা বলে। তদনন্তর দাঁওনে ছয়, সাত, বা আটটি গোরু জুড়িয়া দাঁওনের এক মুখ মেই ঠেঙ্গায় নিবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এক জন কৃষক বামাবর্ত্তে গোরু সকল তাকাইয়া যায়; আর এক জন কৃষক কাঁদাল

নামক ——— এই আকারের যন্ত্র দ্বারা শস্যের নাড়া সকল উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দিতে থাকে। তাহাকে "হানা" দেওয়া বলে।

মাড়ন বৃহৎ হইলে ইচ্ছানুসারে এক মাড়নে দুই তিন দাঁওন বলদ জুড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। প্রত্যেক দাঁওন ডাকাইবার জন্য এক এক জন কৃষক ও হানা দিবার জন্য দুই তিন জন কৃষক থাকা আবশ্যক করে। মাড়নে গোরু জুড়িয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পাক দিতে দিতে গোরুর পায়ের চাপে ক্রমে গাছ হইতে ফল সকল পৃথক হইয়া পড়ে।

ধান্যের গাছ ভাঙ্গিয়া গুড়া হয় না, আস্ত থাকিয়া যায়, তাহাকে পোয়াল বলে। মাড়ন হইতে পোয়াল গুলি উঠাইয়া খামারের এক পার্শ্বে ঢিবি দিয়া রাখিতে হয়, এবং ধান্য সকল লইয়া খামারের মধ্যস্থলে জমা করিতে হয়। ঐ ধান্যের সহিত অনেক আগড়া ও অন্যান্য গরদা সকল মিশ্রিত থাকে। তাহা পরিষ্কারের নিমিত্ত ধান্য সকল কুলায় করিয়া উঠাইয়া মস্তকোর্দ্ধে হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিতে হয়। বায়ু প্রবাহে এক পার্শ্বে গরদা সমুদয় এবং অন্য পার্শ্বে পরিষ্কৃত শস্য গুলি স্তূপাকার হইতে থাকে। তাহার পর গরদা কাটিয়া দূরে নিক্ষেপ করা হয়।

পরিশুষ্ক বা নরম উভয় অবস্থাতেই ধান্য মলাই করা যাইতে পারে। তবে রসা পোয়ালের মধ্যে কতক পরিমাণে ধান্য থাকিয়া যায়। পশ্চাৎ পোয়াল শুখাইয়া সে ধান্য ঝাড়িয়া লওয়া হয়।

রবিখন্দের গাছ নরম থাকিলে গাছ হইতে ফল পৃথক হইয়া পড়ে না। এজন্য ছোলা, গোধুম প্রভৃতি শস্য সকলের গাছ উত্তম রূপে পরিশুষ্ক করিয়া তাহার পর মাড়ন জুড়িতে হয়। রবি শস্যের গাছ সকল মাড়নে গুড়া হইয়া যায়। বস্তুতঃ তাহা ভূষি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত গুড়া করাও আবশ্যক বটে।

পোয়ালের ন্যায় রবি শস্যের ভূষি পৃথক করিয়া তুলিতে পারা যায় না। ভূষি ও গুলুম (শস্য) একত্রে জমা করিয়া কুলায় করিয়া উড়াইলে উভয় পদার্থ পৃথক হইয়া পড়ে। কিন্তু উড়ানের পরেও রবি শস্যের গুলুমের সহিত অনেক কল ও মোটা মোটা ভূষি থাকিয়া যায়। পুনর্ব্বার চালনে চালিয়া তাহাদিগকে পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়।

অধিকাংশ সময়ে রাঢ়ি আমন ধান্য পূর্ব্বোক্ত রূপে মলাই না করিয়া ঠেঙ্গাইয়া লওয়া হয়। ঠেঙ্গানের প্রক্রিয়া অতি সহজ। আটির গোড়া ধরিয়া একখানি তক্তার উপর সজোরে আঘাত করিলেই গাছ হইতে ধান পৃথক হইয়া পড়ে। পরে তাহা উড়াইয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। ঠেঙ্গান আটিকে "বিচালি" বা আউড় বলে।

ইক্ষু, তামাকু, কোষ্ঠা প্রভৃতি কতক গুলি শস্যের পরিণাম প্রক্রিয়া এরূপ নহে। তদ্‌ব্রান্ত উদ্ভিজ্জ-ভেদ প্রকরণে লিখিত হইবে।

উদ্ভিজ্জ-ভেদ।

যে পদার্থের একাংশ মৃত্তিকা ভেদ করিয়া ভূগর্ভে নিমগ্ন হয়, অপরাংশ ঊর্দ্ধদেশ ভেদ করিয়া উঠিতে থাকে, তাহাকে উদ্ভিজ্জ বলে। উদ্ভিদ্ পদার্থ মাত্রই আপন আপন জন্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে সমর্থ নহে; যাবজ্জীবন এক স্থানেই স্থির হইয়া অবস্থিতি করে।

উদ্ভিজ্জ পদার্থ সকল আমাদের ন্যায় আহার করে না, কেবল একমাত্র মৃত্তিকার তেজ আকর্ষণ করিয়া তাহারা জীবন ধারণ করে ও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ঐ প্রক্রিয়াকেও তাহাদের আহার বলিলে বলা যাইতে পারে। আমরা যে আহার করি, তাহার উদ্দেশ্য পরমাণুতে পরমাণুর সংযোগ ভিন্ন আর কিছুই নহে। বৃক্ষাদিরও তেজাকর্ষণ সেই পরমাণু সংযোগ মাত্র। আমাদের ন্যায় বৃক্ষাদি উদ্ভিজ্জ পদার্থের শ্বাস প্রশ্বাস আছে, তাহা পত্রের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা নিরূপণ করিয়াছেন, পৃথিবীমণ্ডলে প্রায় দুই লক্ষ জাতীয় উদ্ভিজ্জ পদার্থ বর্ত্তমান আছে। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি মূলজ, কতকগুলি শাখাজ, কতকগুলি ফলজ, অপর কতকগুলি উভজ ও ত্রিবিধজ। কিন্তু ঐ সমুদয় উদ্ভিজ্জ প্রধান চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, ও ওষধি।

বৃক্ষ।

যে সকল উদ্ভিজ্জ জাতি একবার উৎপন্ন হইয়া বহুকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকে, এবং তন্মধ্যে প্রতিবর্ষে কাহারও একবার কাহারও দুইবার যথা নির্দ্দিষ্ট

সময়ানুসারে ফলোৎপত্তি হয় ও ঐ সকল ফল সুপক্ক হইলে বৃন্তচ্যুত হইয়া ভূতলে নিপতিত হয়, অথচ গাছের কোন হানি হয় না, তাহাদিগকে বৃক্ষ বলে। যথা, আম্র, কাঁঠাল, নিচু, পেয়ারা, শাল, সেগুণ, ইত্যাদি।

লতা।

যে সকল উদ্ভিজ্জ জাতির বল্কলাভ্যন্তরে কাষ্ঠ নাই এবং কাণ্ড শাখাদির আকৃতি অধিক বিভিন্ন নহে, সকলই দেখিতে প্রায় একরূপ ও কাঠিন্য-রহিত, কাণ্ডাদির কাঠিন্য অভাবে কোন একটি অবলম্বন বিনা স্বয়ং ঊর্দ্ধ ভেদ করিয়া সোজাসুজি উঠিতে সমর্থ হয় না, সুতরাং বিনা আশ্রয়ে ভূপৃষ্ঠে এবং অন্য কোন উদ্ভিদের সাহায্যে বৃক্ষোপরে ও কখন মাচার উপরে বা ঘরের চালে বেষ্টিত হইয়া থাকে, তাহাদিগকে লতা বলে। যথা লাউ, কুষ্মাণ্ড, পটল, তরমুজ, নাটীম, সশা, ঝিঙ্গে, ইত্যাদি।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ অপেক্ষা কোন কোন লতার দৈর্ঘ্য অনেক অধিক ও কোন কোন লতাজ ফল অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। ফল-প্রসবান্তে লতা জাতীয় উদ্ভিজ্জের প্রায় জীবন শেষ হইয়া যায়। কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি কতকগুলি লতার গাছ শুকাইয়া গেলেও ফল কাঁচা থাকে। মাধবী, মধুমালতী প্রভৃতি কতকগুলি ভিন্ন, প্রায় সমুদয় লতাই বর্ষ-জীবী।

গুল্ম।

কতকগুলি উদ্ভিজ্জের সাধারণ নাম গুল্ম। বৃক্ষবৎ তাহাদের কাণ্ড শাখা প্রশাখা সকলই আছে, কেবল তত্তুল্য বৃহৎ হয় না। গুল্ম সকল ঝোপ ঝোপ হইয়া থাকে। কোন কোন গুল্ম বর্ষজীবী। অপর কোন কোন জাতিকে বৃক্ষাদির ন্যায় অতি দীর্ঘজীবী হইয়া থাকিতে দেখা যায়। অরহর, কার্পাস ইত্যাদি গাছ সকল গুল্ম শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট।

ওষধি।

ফল সুপক্ক হইলে যে সকল উদ্ভিদের জীবন শেষ হইয়া যায়, তাহাদিগকে ওষধি বলে। ওষধি জাতীয় উদ্ভিদ্ হইতে একবার ভিন্ন দ্বিতীয় বার ফল প্রাপ্তির প্রত্যাশা নাই।

ঐ জাতীয় উদ্ভিদ্ মধ্যে যাহারা একপত্রোৎপত্তিক, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদিগের শাখা প্রশাখাদি কিছুই নাই। মূলের অগ্রভাগেই এক প্রকার অদ্ভুত আকৃতির কতকগুলি অসার কাণ্ড দৃষ্ট হয়। এক একটি কাণ্ডের গর্ত্ত হইতে এক একটি শীর্ষ বহির্গত হইয়া থাকে, তাহার সর্ব্বাংশ প্রায় ফলে পরিপূর্ণ। যথা, ধান্য, গোধুম, যব, ইত্যাদি।

অপর কতক গুলির বৃক্ষবৎ কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, আছে। তাহারা দ্বিপত্রোৎপত্তিক ও তাহাদিগের ফল গর্ভ-সংস্থিত নহে। শাখা, প্রশাখার আদ্যোপান্ত প্রায় প্রত্যেক পত্রের সন্ধিস্থলে পুষ্প ফল দৃষ্ট হয়। যথা ছোলা, মশিনা, রাই, ইত্যাদি।

ওষধি-বাচক উদ্ভিজ্জ পদার্থের জীবনের স্থায়িত্ব জাতি-প্রভেদে তিন মাস হইতে এক বৎসর।

উক্ত চতুর্ব্বিধ উদ্ভিদ্ পদার্থ প্রকৃতিগত ভেদানুসারে বহু শ্রেণীতে বিভক্ত। এই স্থলে তাহা বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। উদ্ভিজ্জ তত্ত্বে সে সকল বিবৃত হওয়াই উচিত। এই গ্রন্থে কেবল মাত্র কৃষিজাত উদ্ভিজ্জ পদার্থেরই বিষয় সকল সংক্ষেপে লিখিত হইবে। তন্মধ্যে কৃষি ক্ষেত্রে ওষধি-বাচক উদ্ভিজ্জেরই বাহুল্য দৃষ্ট হয় এবং সর্ব্ব সাধারণ জনগণের তাহা সর্ব্বদা প্রয়োজনীয়। সুতরাং কৃষি-ক্ষেত্রোৎপন্ন ওষধি-বাচক উদ্ভিদ্-বৃত্তান্ত অগ্রে লেখা কর্ত্তব্য বিবেচনায় তদ্বর্ণনে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। কিন্তু আবশ্যক মতে ওষধি প্রকরণে লতা, লতা প্রকরণে বৃক্ষ, ইত্যাদি লিখিত হইবে। সে সম্বন্ধে কৃষিতত্ত্ব কোন নিয়মের অধীন নহে।

ধান্য।

ধান্য প্রধান পঞ্চ শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা আশু, আমন, বোরো (বোরা) জলি, ভুরা আশু, ইত্যাদি।

ঐ সকল ধান্যের আকৃতি প্রকৃতি এবং উৎপত্তির নিয়ম পরস্পর বিভিন্ন এবং প্রত্যেক শ্রেণীর ধান্যের পৃথক পৃথক ক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট আছে ও তাহার আবাদের প্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

আশু ধান্য।

যে ধান্য বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বুনানি করা যায় এবং শ্রাবণ ভাদ্র মাসে পাকিয়া উঠে, তাহাকে আশুধান্য বলে। বোধ হয়, শীঘ্র হয় বলিয়া ইহার নাম আশু ধান্য হইয়াছে। আশু ধান্য যে কত প্রকার আছে, তাহার সংখ্যা করিয়া উঠা যায় না। কিন্তু তৎ সমুদয় প্রধান দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা ছোটনা ও বরাণ। ঐ উভয় শ্রেণীর ধান্য এক ক্ষেত্রে উৎপন্ন হয় না। উহাদের পৃথক পৃথক ক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট আছে। তবে বরাণের ক্ষেত্রে ছোটনা জন্মাইতে দেখা যায়, কিন্তু ছোটনার ক্ষেত্রে বরাণ উৎকৃষ্ট রূপ জন্মে না। ছোটনা বরাণ ভেদে পরস্পর আবাদের কোন ইতর বিশেষ নাই এবং গাছও প্রায় দেখিতে এক রূপ। আশু ধান্যের গাছ দুই হস্ত হইতে ক্ষেত্র বিশেষে তিন হস্ত পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে। যে ক্ষেত্রে দুই হস্তের অতিরিক্ত বর্ষার জল বদ্ধ হয়, তথায় আশু ধান্য উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নহে।

ছোটনা আশু (১)।

ছোটনা আশু ধান্যের গাছ ও পাতা কিছু চিকণ এবং ধান্য অপেক্ষাকৃত মোটা হইয়া থাকে। গভীর কুড়ী ও বিলান ক্ষেত্র (২) ভিন্ন, শিষেটান, সমতল, কোলকুড়ী প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রে, এবং লোণা ফোটা লোণাসেয়ারা ভিটা ভূমি ভিন্ন, ম্যেটেল, পলি, বেলে, দো-আশলা প্রভৃতি সমস্ত মৃত্তিকায় এই ধান্য জন্মিয়া থাকে। বরাণ অপেক্ষা ছোটনা কিছু অগ্রস্থচি পাকিয়া থাকে।

---

(১) ক্যোলে, মুদ, জামরে ঢেঙ্গা, ছোট কুমারী, ঢেঙ্গা কুমারী, নড়াই জামরে, সাঁতাল নেড়ামুদ, মাণিকমুদ, পুর্ণিক্যেলে, আশুলঘু, কালমাণিক, কাদাচাপ, খাজুরকান্দী, গুড়কপিলে, ইত্যাদি। এই শ্রেণীর মধ্যে "ষেটে" নামে এক জাতীয় ধান্য আছে, সুপালিত হইলে তাহা ষাটি দিনের মধ্যে পাকিয়া উঠে।

(২) গভীর কুড়ী ও বিলান ক্ষেত্রে আশু ধান্য যে না জন্মে, এমন নহে। কেবল ডুবিয়া যাওয়ার আশঙ্কায়, তথায় বুনানি করা হয় না।

বরাণ আশু (১)।

বরাণ আশুর গাছ মোটা, পাতা খুব চওড়া, এবং ধান্য চিকণ। অত্যন্ত গভীর কুড়ী, বিলান, কূর্ম্মপৃষ্ঠ, ও ক্রমনিম্ন ক্ষেত্র ভিন্ন সমতল ও কোলকুড়ী ক্ষেত্রে, এবং বেলে, লোণাকোটা, লোণাসেয়ারা ভিটা ভূমি ভিন্ন, অন্য সমস্ত মৃত্তিকায় এই ধান্য জন্মাইতে পারে। বরাণ আশুর ক্ষেত্রে অৰ্দ্ধ হস্ত পরিমিত জল বদ্ধ না থাকিলে গাছ তেজস্বী হয় না। সুতরাং সমতল ও কোলকুড়ী ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কুত্রাপি এই ধান্য উৎকৃষ্টরূপ জন্মে না। ইহার ফসল কিছু নামলা হয়।

আবাদের রীতি।

আশু ধান্যের ক্ষেত্রে, কার্ত্তিকে চাষের সময় উত্তম করিয়া চাষ দিয়া রাখিতে হয়। তদনন্তর ফাল্গুণ চৈত্র মাসে দোয়ার তেয়ার চাষ দেওয়া আবশ্যক করে। যখন দেখা যায়, চাষে চাষে ক্ষেত্রের সমুদয় মৃত্তিকা পরিচালিত হইয়া ধূলিবৎ গুড়াইয়া গিয়াছে এবং ক্ষেত্রের কোন স্থানে তৃণের চিহ্ন মাত্র নাই, তখন ধান্যের বীজ বপন করা যাইতে পারে। ধান্য বুনানির প্রকৃত সময় বৈশাখ মাস, কিন্তু নামলাবাত্তে জ্যৈষ্ঠ মাসের দশই পোনেরই পর্য্যন্ত বুনানি হইয়া থাকে। এই ধান্যের বীজ প্রতি বিঘায় ষোল সের হারে পতিত হয়। বীজ বুনানির পর ক্ষেত্রে এক ঘা চাষ দেওয়ার প্রয়োজন হয়। কিন্তু বীজ বপনের পর যে চাষ দেওয়া যায়, তাহার লাঙ্গল কিঞ্চিৎ আলগা মুটে ছেও করিয়া বহিতে হয়, নতুবা অধিক মাটির তলায় বীজ পড়িলে তাহাতে সুচারু রূপ চারা বাহির হয় না।

ধান্য-বীজ দুই প্রকারে বুনানি করা হইয়া থাকে। যথা, কাকৃড়ি ও ষোবুনানি।

---

(১) সর্ব্বভোগ, কপিলেশ্বর, চন্দ্রমণি, সূর্য্যমণি, কবুতরঝুড়ি, পিপড়েক্যোলে, লক্ষ্মীজটা, সরু জামরে, মুগজামরে, বেণাফুলী, পুটেগজাল, বেগুণবীচি, কালকচু, জগদ্দুর্লভ, ভুবনদুর্লভ, লোহাগড়, মুক্তকাঞ্চণ, চিনড়েশাল, ইত্যাদি। ইহার মধ্যে লক্ষীজটা, পুটেগজাল প্রভৃতি কএক জাতীয় ধান্য অত্যন্ত মোটা।

কাকৃড়ি।

পরিশুষ্ক মৃত্তিকায় ধান্য-বীজ বপন করিলে, তাহাকে "কাকৃড়ি" করা বলে। কাকৃড়ি করা ক্ষেত্রে বুনানি চাষের পর মৈ দিবার আবশ্যক করে না, এবং মৃত্তিকা যে পর্য্যন্ত জলসিক্ত না হয়, তাবৎ অন্য কোন রূপ আবাদ করা চলে না।

সকল ক্ষেত্রেই কাকৃড়ি করা যাইতে পারে, কিন্তু মেঁটেল ব্যতীত অন্য কোন মৃত্তিকায় কাকৃড়ি করা কর্ত্তব্য নহে। মেঁটেল ভিন্ন অন্য যত প্রকার মাটি আছে, তৎ সমুদয় মৃত্তিকার নিম্নদেশ কিছু সরস থাকা সম্ভব। সুতরাং সেই সকল মৃত্তিকায় ধান্য-বীজ রস-কাক্‌ড়ি হইলেও হইতে পারে, এবং উই, কড়া পোকা প্রভৃতি কীটাদির উৎপাত উপস্থিত হওয়াও বিচিত্র নহে। কিন্তু মেঁটেল মাটির তল পর্য্যন্ত সমভাবে পরিশুষ্ক হইয়া থাকে, এবং তাহাতে কীটাদির দৌরাত্ম্য অতি বিরল। তথায় কাকড়ি করিলে সচরাচর বিশেষ কোন রূপ অনিষ্ট হয় না।

যে ক্ষেত্রে কেশে, কুশ, ও মুথার আধিক্য আছে, তথায় কাকড়ি করা শ্রেয়স্কর নহে (১)। দেব-মাতৃক দেশে কবে জল হইবে, তাহার নিশ্চয় থাকে না; দৈবাৎ যদি শীঘ্র জল না হয়, তবে ধান্য-বীজ যেমন তেমনই থাকিয়া যায়। কিন্তু কাশ, কুশা, মুথার মূল সকল অঙ্কুরিত হইয়া ভূমি তৃণাচ্ছন্ন হইয়া উঠে। জল-প্রাপ্তি মাত্রই তাহারা বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। সে ক্ষেত্রের আবাদ করা বড় কঠিন হইয়া থাকে। তৃণতলে ধান্য সতেজ হইতে পারে না।

কাকড়ি করা ক্ষেত্র জলসিক্ত হইলে, তাহার যথা যোগ্য আবাদ করিয়া দিতে হয়। ঐ আবাদ ও যোবুনানি ধান্যের আবাদ ঠিক একরূপ, কিছু মাত্র বিশেষ নাই।

যোবুনানি।

ভরা বতরে (পূর্ণ যোয়ে) ধান্য বীজ বপনের পর এক ঘা চাষ ও দুই পালা মৈ দিয়া বীজ ঢাকিয়া দিতে হয়। বুনানির পর প্রথমতঃ চাষ মৈ দিয়া তাহার পর ঝাপান মৈ দেওয়া কর্ত্তব্য। তদনন্তর যদি সুবৃষ্টি হয়, তবে

(১) যে জমিতে কেশে কুশ অধিক থাকে, তাহাকে মুদিটান জমি বলে। মুদিটান জমিতে কাকড়ি করিতে নিষেধ আছে।

আর অধিক মৈ দিতে হয় না। কিন্তু বৃষ্টি-জলের অভাব হইলে ধান্যবীজ রস-কাকড়ি হইবার আশঙ্কায় যতদিন পর্য্যন্ত ধান্যের চারা বাহির না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ এক এক পালা মৈ দেওয়া আবশ্যক। তার মধ্যে বুনানীর পর চতুর্থ দিবসে মৈ দিতে নাই। কৃষকেরা বলে, "চতুর্থ দিবসে ধান ধ্যানে বসে।" একথার তাৎপর্য্য এই যে, চতুর্থ দিবসে ধান্যের অঙ্কুর সকল বহির্গত হইয়া মৃত্তিকার সহিত সংযোগ হইতে থাকে। চতুর্থ দিবসে মৈ ঘর্ষণের দ্বারা ধান্য নড়িয়া গেলে যোগ ভঙ্গ হইয়া যায়। কিন্তু তাহার পর পঞ্চম দিবসে মৈ দিলে আর কোন হানি হয় না।

পুনঃ পুনঃ মৈ ঘর্ষণের দ্বারা মৃত্তিকা খুব করিয়া চাপিয়া দিলে বীজ সকল মৃত্তিকার সহিত বিশেষ রূপে লিপ্ত হইয়া থাকে এবং ভূগর্ভে বায়ু ও সূর্য্য-কিরণ অধিক পরিমাণে প্রবেশ করিতে পারে না। বায়ু ও উত্তাপের অভাবে তলদেশ সম্পূর্ণ সরস থাকিয়া, চারি পাঁচ দিবসের মধ্যে ধান্যবীজ অঙ্কুরিত হইয়া সপ্তাহের পর সূচিকাকারে ঊর্দ্ধদেশ ভেদ করিয়া উঠিতে থাকে। তাহাকে "সূচফোড়" বলে। দশদিনের দিন সূচিকাকার ঘুচিয়া পত্র সকল প্রসারিত হইয়া গাছের অবয়ব ধারণ করে। তাহার নাম "বাওয়ালি" বা "জাওলা"। বাওয়ালি ধান্য দেখিতে অতি সুন্দর ও মনোহর।

ধান্যের বাওয়ালি যখন বাহির হইতে থাকে, তখন তাহার সহিত এক যোগে অনেক বীজ খড় বহির্গত হইয়া সমুদয় ক্ষেত্র আচ্ছন্ন করিবার উপক্রম করে। কিন্তু ধান্যের গাছ কিঞ্চিৎ বড় না হইলে তখন অন্য কোন রূপ আবাদ করা চলে না। অগত্যা পুনঃ পুনঃ মৈ ঘর্ষণের দ্বারা তৃণাঙ্কুর সকল ভগ্ন করিয়া দিতে হয়। কিন্তু অতি প্রত্যুষে বাওয়ালির গাত্রে শিশির বিন্দু বর্ত্তমান থাকিতে বাওয়ালি মৈ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। বেলা ছয় দণ্ড এক প্রহরের পর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বাওয়ালি মৈ দেওয়া যাইতে পারে। নরম ও ভরা বতরে বাওয়ালি মৈ দিতে নাই। নয় ভরা, নয় উখরাণ, এইরূপ মধ্যবিত্ত যোয়ে বাওয়ালি মৈ দিতে হয়। যো মত বাওয়ালি মৈ চারি পালা দিলেই যথেষ্ট হইতে পারে।

ধান্যের চারা দশ অঙ্গুলি পরিমিত উচ্চ হইয়া উঠিলে তখন বিদে দেওয়া আবশ্যক। যে অবধি ধান্যে "মাট গিড়ে" না বান্ধে, সে পর্য্যন্ত বিদে

দেখা যাইতে পারে। মাটি গিড়ে বাজা পর্য্যন্ত যতবার বৃষ্টি হওয়ার পর ক্ষেত্রে যো ধরিবে, তত বারই বিদে দিতে হইবে। প্রথম ভরণে তিন পালা তাহার পর প্রত্যেক ভরণে দুই দুই পালা বিদে দিলেই হইতে পারে। তবে বীজ খড়ের আধিক্য ও কোন কারণ বশতঃ মৃত্তিকা সুপরিচালিত না হইলে এক এক ভরণে চারি পাঁচ পালা পর্য্যন্ত বিদে দেওয়া আবশ্যক হইয়া উঠে। কিন্তু সচরাচর এরূপ অবস্থা প্রায় ঘটে না। যাহা হউক, ধান্যে মাটগিড়ে বাজার মধ্যে তিন বার বিদের যো পাওয়া গেলে তাহাকে শ্রেষ্ঠ আবাদ বলা যাইতে পারে। বিদে দেওয়ার পর চারি পাঁচ দিন প্রখর রৌদ্রে চটি শুখাইয়া মন্দা মন্দা বৃষ্টি পাইলেই উত্তম হয়। বিদে দেওয়ার পরক্ষণেই বৃষ্টি হইয়া যদি চালিত মৃত্তিকা শুখাইতে না পায়, তবে তাহাতে উপকার না হইয়া বরং অপকার হইয়া থাকে। বিদের মাটি ন্যূন কল্পে দুই দিনও শুখান আবশ্যক। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত হইতে বেলা সাড়ে তিন প্রহর পর্য্যন্ত বিদে দেওয়া যাইতে পারে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে বিদে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। ক্ষেত্রে প্রথম যে দিন বিদে দেওয়া যায়, তাহার পূর্ব্ব দিবস সন্ধ্যার সময় ঐ ক্ষেত্রে এক পালা মৈ দিয়া রাখিতে হয়। অথবা বিদে দেওয়ার পূর্ব্বক্ষণে এক পালা মৈ দিয়া তাহার পরে বিদে জুড়িলেও চলিতে পারে।

মৈ, বিদের আবাদের সময় কৃষককে সর্ব্বদা সতর্কতার সহিত ক্ষেত্রের যো পরীক্ষা করিতে হয় এবং খড়ের জাওলার প্রতি অনুক্ষণ দৃষ্টি রাখিতে হয়। মৈ বিদের যো এক দণ্ডে হয়, এক দণ্ডে যায়; এবং খড়ের জাওলা বড় হইয়া একবার মূল বিস্তার করিলে, মৈ বিদের দ্বারা তাহা বিনষ্ট করিতে পারা যায় না। অতএব ধান্য বুনানির পর হইতে যেমন এক এক ভরণ খড় বাহির হইতে থাকে, তেমনই যো মত মৈয়ের সময় মৈ, বিদের সময় বিদে, দিয়া ঐ সকল খড় নিপাতিত করিতে হয়। মৈ ও বিদের দ্বারা তৃণ-পুঞ্জ নির্ম্মূল না হইলে, কেবল মাত্র নিড়ানীর দ্বারা ধান্য ক্ষেত্রের পারিপাট্য সাধন হইয়া উঠে না।

ধান্য ক্ষেত্রে কত পালা মৈ বিদে দিতে হয়, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। মৈ, বিদের পরিমাণ যোয়ের উপরও অনেকটা নির্ভর করে। ধান্য

বুনানির পর যদি প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি পায়, তবে বাওয়ালি বাহির হওয়ার পূর্ব্বে দুই পালার অধিক আর মৈ দেওয়ার আবশ্যক হয় না। কিন্তু জলের টানাটানি হইলে ছয় সাত পালা পর্য্যন্ত মৈ দিতে হয়।

বাওয়ালি ক্ষেত্রে সুযোগে মৈ বিদে দিতে পারিলে, চারি পালা মৈ ও আট পালা বিদে দিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। কিন্তু বিলান ক্ষেত্রে চারি পালার অধিক বিদে দিবার আবশ্যক হয় না। তবে সুযোগের অভাব হইলে বেশী লাগা সম্ভব। আশুধান্যের ক্ষেত্রে মৈ বিদের বিশৃঙ্খলা ঘটিলে খড়ের বড় বাহুল্য হইয়া উঠে। তৃণ-বহুল ক্ষেত্রে নিড়ানী খরচ অধিক লাগিয়া থাকে। ধান্যের চাষে আয় অতি সামান্য, তাহাতে ব্যয়াধিক্য হইলে লোকসান হওয়া সম্ভব।

উচ্চভূমিস্থ আশুধান্যের ক্ষেত্রে মৈ,বিদের আবাদ যত উৎকৃষ্ট হইবে, নিড়ানী খরচ তত কম পড়িবে ও ধান্যও খুব তেজস্বী হইবে। আর মৈ বিদের যত বিশৃঙ্খলা ঘটিবে, নিড়ানী খরচও তত বেশী লাগিবে, অথচ ধান্য ভাল তেজস্বী হইবে না। মৈ বিদের আবাদেই কৃষকের কৃষি-নৈপুণ্যের পরীক্ষা হইয়া থাকে। মৈ বিদে দেওয়ার দোষ গুণে ধান্যের বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব।

লাঙ্গল, মৈ, ও বিদের মুখে যে সকল খড় এড়াইয়া যায়, নিড়ানীর দ্বারা তাহাদিগকে পরিষ্কার করিতে হয়। ধান্য বুনানির পর হইতে দুদ ক্ষীর পর্য্যন্ত সকল সময়েই নিড়ানী করা যাইতে পারে। কিন্তু ক্ষেত্রে বিদের মাটি বর্ত্তমান থাকিতে থাকিতে প্রথম বার নিড়ানী সমাপ্ত করিতে পারিলেই ভাল হয়। তদনন্তর থোড় হওয়ার পূর্ব্বে যে কোন সময়ে হউক আর একবার নিড়াইয়া দিলে খড়েতে ধান্যের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। কৃষকেরা প্রথম নিড়ানীকে "মলচে কাট" ও দ্বিতীয় বার নিড়ানীকে "দোবান্ত" বলে। মলচে কাটে খড় অধিক বড় হইলে ধান্য নিতান্ত জীর্ণ করিয়া ফেলে এবং পশ্চাৎ ঐ খড় নিড়াইতেও বিস্তর ব্যয়-বাহুল্য হইয়া থাকে। আর এরূপ ঘটনা-স্থলে ধান্য সর্ব্বতোভাবে বাড়িতে পারে না। অতএব প্রথম নিড়ানীর সময় তৃণ যাহাতে আট আঙ্গুলের অধিক বৃদ্ধি না হয়, তদ্বিষয়ে কৃষককে বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত।

নিড়ানীই ধান্য ক্ষেত্রের চরম আবাদ। চাষ, কোপান্, মৈ, বিদে, ইত্যাদি যত প্রকারেই ক্ষেত্রের আবাদ করা যায়, একমাত্র নিড়ানীর ব্যতিক্রম ঘটিলেই তৎ সমুদয় ভস্মে ঘৃত নিক্ষেপের ন্যায় হয়। নিড়ান-পড়া ক্ষেত্রে ধান্য ভাল হয় না। এই জন্য কৃষকেরা বলে, "নিড়াইলে ধান, না নিড়াইলে চাষা জাহান্নমে যান্"। আরও বলে, "নাই ধান ত নিড়িয়ে আন।"

আশুধান্যের ক্ষেত্র দুইবার নিড়ান আবশ্যক। কোন কোন ক্ষেত্র তিন বার পর্য্যন্ত নিড়াইতে হয়। এক বিঘা ধান্য নিড়াইতে প্রথম বারে চারি জন হইতে ছয় জন কুলীর দরকার হয়।

দ্বিতীয় বারেও ঐ পরিমাণ কুলী লাগিয়া থাকে। বার জন কুলীর মজুরি ১৸৶০ এক টাকা চৌদ্দ আনা। কিন্তু মুথা আড়ি ভূমি হইলে, প্রথম বারে আট দশ জন, দ্বিতীয় বারেও আট দশ জন, সর্ব্বসমেত ষোল জন হইতে বিশ জন কুলীর কম এক বিঘা জমি নিড়ান হইয়া উঠে না। তাহার মজুরি ২॥০ আড়াই টাকা হইতে ৩৶০ তিন টাকা দুই আনা।

সুপক্ক ধান্য কাটাই ও মলাই করিয়া উড়াইয়া লইতে হয়। ধান্য কাটাইয়ের পর খুঁটি দিয়া দুই চারি দিবসের মধ্যে মাড়িয়া লইলে, ধান্য অতি উত্তম থাকে। কিন্তু এদেশের কৃষকেরা বীজ ভিন্ন সমুদয় ধান্য পালা দিয়া রাখে এবং আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে তাহা মলাই করিয়া লয়। এরূপ অবস্থায় ধান্য অত্যন্ত শুমিয়া যায়। শুমা ধান্যের চাউল অতি মলিন ও তাহার অন্ন শীঘ্র পরিপাক হয় না।

এক বিঘা ধান্য কাটাই করিতে চারি জন (১) ও মলাই করিতে দুই জন, সর্ব্বশুদ্ধ ছয় জন কুলীর মজুরি ৶০ তিন আনা হিসাবে ১৵০ আঠার আনা। গাড়ীতে ধান্য ঢোলাইয়ের খরচ ⁄০ এক আনা ও পোয়াল ঢোলাই খরচ ৶০ দুই আনা, সাকুল্যে ১।⁄০ এক টাকা পাঁচ আনা খরচ হইয়া থাকে।

---

(১) চারি জন কুলীতে বেলা তৃতীয় প্রহরের মধ্যে এক বিঘা ধান্য কাটাই করিয়া, বৈকালে তাহারা ঐ ধান্য ঢোলাই করিয়া খামারে লইয়া যাইতে পারে।

এক বিঘা আশু ধান্যের আবাদ-খরচ ও উৎপন্ন-আয়।

লাঙ্গল ৪ খানা	৸৹	
মৈ ছয় পালা	৶৹	
বিদে ছয় পালা	I৶৹	
নিড়ানী, ১২ জন কুলীর মজুরি	১৸৶৹	
কাটাই খরচ, সমেত ঢোলাই খরচ, ইত্যাদি ...	১।৹	
খাজনা	I৶৹	
বীজ আঠ কাঠার মূল্য	।৹	
		৫।৶৹
উৎপন্ন ধান্য আট মণের মূল্য	৮৲	
পোয়ালের মূল্য	।৹	
		৮॥৹
লাভ ...		২৸৶৹

উপরে যে ব্যয় ও লাভের তালিকা দেওয়া হইল, তাহা সকল সময় ঠিক থাকে না। আমাদের এই দেব-মাতৃক দেশে কৃষি কার্য্যের আয় ব্যয়ের হিসাব ঠিক থাকিবার উপায় নাই। যাহা হউক, কেণা লাঙ্গলে দুই চারি বিঘা ধান্যের জমি করিয়া, তাহাতে ভদ্র লোকের লাভবান্ হওয়া সম্ভব নহে। যাহারা আপন গতর খাটাইয়া কৃষি কার্য্য করে, তাহাদের কিছু লাভ হইতে পারে। যদি জল সেচনের কোন উপায় করিতে পারা যায়, তাহা হইলে অধিক পরিমাণে ধান্যের জমি করিলে লাভ হওয়া সম্ভব বটে। উপরোক্ত জমিতে এক টাকা খরচ করিয়া যদি সার দেওয়া যায় এবং প্রথমে যদি সুবৃষ্টি হয়, তাহা হইলে আট মণের স্থানে বার মণ ধান্য উৎপন্ন হইতে পারে। এই কৃষিতত্ত্বের শেষ ভাগে এক লাঙ্গলের চাষের হিসাব দিয়া কৃষি-কার্য্যের লাভ লোকসান বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

পরিশিষ্ট।

সমস্ত বৈশাখ মাস আশু ধান্য বুনানি করিবার উপযুক্ত সময়। ইতর ভাষায় ঐ উপযুক্ত সময়কে "সেরবাত" বলে। কখন কখন বৎসর গতিকে প্রথমে সুবৃষ্টির অভাব হইলে, যথা সময়ে চাষ আবাদ হইয়া উঠে না। অগত্যা বৎসর গতিকে এই ধান্য জ্যৈষ্ঠ মাসেও বুনানি করা গিয়া থাকে। তাহাকে "নামলা বাত" বলে। কিন্তু বৈশাখে বুনানি করা ধান্য যেমন উৎকৃষ্ট জন্মে, নামলা বাতে সেরূপ হয় না। কৃষকেরা ইহার বচন কহে, "বৈশাখী বোয়া, আষাঢ়ে রোয়া, জায়গা হয় না ধান-থোয়া।"

আশু ধান্য বুনানির পর হইতে যাবৎ কাল সুপক্ক না হয়, তাবৎ কখন অল্প কখন অধিক সর্ব্বদাই জলের আবশ্যক করে। ইহার জমি আবাদের নিমিত্ত মাঘ মাসের শেষে এক পশালা বৃষ্টি হওয়া চাই। কৃষকেরা বলে, "ধন্য রাজার পুণ্য দেশ, যদি বর্ষে মাঘের শেষ।" (এই জলে রবিখন্দেরও যথেষ্ট উপকার দর্শে।) তাহার পর চৈত্র মাসে দুই পশালা বৃষ্টি হইলেই, জমি চষা সমাপ্ত হইতে পারে। তদনন্তর বৈশাখ মাসে উৎকৃষ্টরূপ তিন বার বৃষ্টি হইলে, বুনানি কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমে খরাণী হইলে, আশু ধান্যের বিশেষ উপকার হয়। ঐ সময়ের মধ্যে মৈ বিদের আবাদ ও প্রথম নিড়ানীর কার্য্য শেষ হইয়া যায়। জ্যৈষ্ঠ মাসের দশই বারই আর এক বার বৃষ্টি হইয়া বিশের পর হইতে ঘন বাদলা আরম্ভ হইয়া সমস্ত আষাঢ় মাস ও শ্রাবণের বিশে পর্য্যন্ত প্রত্যহ না হউক এক দিন অন্তরও বৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে মৃগশিরা নক্ষত্রে সূর্য্যের সঞ্চার হইলে. এদেশে ঘন বাদলা আরম্ভ হয়। তাহাকে মৃগের বাদল বা মিগ বলে। (এত অনাবৃষ্টি-তেও অদ্যাপি মৃগের বাদলের কোন অন্যথা ঘটে নাই।) সাতই আষাঢ় মিগ উত্তীর্ণ হইয়া যায়। মিগের পরেই অম্বুবাচী প্রবৃত্ত হয়। অম্বুবাচীর পরেই বসুমতীর উৎপাদিকা শক্তির স্ফুরণ হইয়া থাকে। সেই সময় আশু ধান্য অপেক্ষাকৃত বাড়িয়া উঠে ও তাহার গর্ভমধ্যে মঞ্জরীর সঞ্চার হয়।

তাহাকে "কাঁচ থোড়" বলে। ক্রমে থোড় কণ্ঠাগত হইলে, তাহাকে কেবল "থোড়" বলে। কাঁচ থোড়ের সময় হইতে ধান্য চালভর হওয়া পর্য্যন্ত অজস্র বারিধারা বর্ষণ না হইলে সমুদয় ধান্য থোবড়া পড়িয়া যায় ও তাহাতে গাঁদি প্রভৃতি নানাবিধ রোগের সঞ্চার হইতে দেখা যায়। বিশেষতঃ থোড় ধান্য এত ভঙ্গুর হয় যে, দুই তিন দিন ধরিয়া রৌদ্র পাইলে গাছ ঝাঁওলাইয়া পত্র সকল শিথিল হইয়া পড়ে এবং গর্ভস্থিত মঞ্জরী ভাপিয়া সিদ্ধবৎ হইয়া উঠে। সুতরাং আষাঢ় শ্রাবণ দুই মাস প্রত্যহ বারিধারা বর্ষণ না হইলে, এই ধান্য আদৌ ফুলাইতে পারে না।

গর্ভ হইতে যখন ধান্য-মঞ্জরী বহির্গত হয়, তখন শীষের গায়ে প্রত্যেক ধান্য দ্বিধা বিভক্ত থাকে। তাহার মধ্যে শস্যের কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না। কেবল ধান্যের গাত্রে একটি ক্ষুদ্র পুষ্প দৃষ্ট হয়। ইহার গর্ভকেশর অতি ক্ষুদ্র, ও তাহা উভয় খণ্ডের পুরোভাগে অবস্থিত। পরাগ কেশর অপেক্ষাকৃত লম্বাকার হইয়া উভয় খণ্ডের সন্ধিস্থলের বহির্ভাগে ঝুলিয়া পড়ে। দুই তিন দিনের মধ্যে পুষ্পটি শুষ্ক হইয়া যায়, এবং উভয় খণ্ড একত্রিত হইয়া ধান্যের অবয়ব সুসম্পন্ন করে, ও তন্মধ্যস্থিত গর্ভকেশরে দুগ্ধের সঞ্চার হইয়া, ক্রমে তাহা ঘনীভূত ও কঠিন হইতে থাকে। দুগ্ধ সঞ্চারের অষ্টাহ পরে, ধান্য মধ্যে চাউলের উৎপত্তি হয়। ধান্য ফুলানর পর পোনের দিন পর্য্যন্ত বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি জলে মঞ্জরী সিক্ত না হইলে দুগ্ধের সঞ্চার হয় না ও ধান্য মধ্যে শস্যের অভাব হইয়া সমুদয় ধান্য চিটে পড়িয়া যায়। অনাবৃষ্টি বা কিঞ্চিৎ মাত্র বৃষ্টির ব্যতিক্রম হইলে, আশু ধান্য আদৌ জন্মে না।

হৈমন্তিক বা আমন ধান্য।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে যে সকল ধান্য বুনানি করা হয় এবং কার্ত্তিক মাসের শেষ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসের মধ্যে পাকিয়া উঠে, তাহাদিগকে হৈমন্তিক বা আমন ধান্য বলে। হৈমন্তিক ধান্য নানা জাতি, কিন্তু তৎসমুদয় প্রধান দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। তাহার এক

১৩৫ পৃষ্ঠার ক্রোড়-পত্র।

রাড়ি আমন ছোটনা ও বরাণ ভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত।

১। ছোটনা। লঘু; কেলেন্দী, রোয়াকোলে, ইত্যাদি।

২। বরাণ। লোণা, হরিণখুরি, মাওড়শালী, রাণশালী, কৃষ্ণশালী, কদমশালী, কুসুমশালী, পরমান্নশালী, বোনগোটা, আমিরভোগ, সরভোগ, রাজভোগ, কৃষ্ণভোগ, বাঁষমতি, বাঁষফুলী, ছিতেমাওড়, পোকা, নিনামা, কণকচুর, ইত্যাদি। ইহার মধ্যে পরমান্নশালী চালের অন্ন তিক্ত রসে পাক হইয়া থাকে, তজ্জন্য উহা শূল ও অম্লাদি রোগে অতি সুপথ্য। এবং কণকচুর ধান্যে অতি উৎকৃষ্ট খৈ প্রস্তুত হয়, তজ্জন্য উহা অতি মহার্ঘ দরে বিক্রয় হইয়া থাকে। পোকা ধান্যের চাউল অগ্নি বিনা কেবল মাত্র জলে ভিজিয়া ভাতের ন্যায় হইয়া উঠে।

শ্রেণীর নাম রাঢ়ি আমন বা শালিধান্য, অপর শ্রেণীকে বাগ্ড়ো আমন বলে। হেমন্ত ঋতুতে হয় বলিয়া ইহাদের নাম হৈমন্তিক হইয়াছে।

রাঢ়ি আমন।

রাঢ়ি আমনের গাছ উর্দ্ধে দুই হাত আড়াই হাত কোথাও বা ক্ষেত্র-বিশেষে তিন হস্ত পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে। ইহার গাছ দেখিতে প্রায় আশু ধান্যেরই তুল্য, কিন্তু তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ কঠিন ও সুশ্রী এবং পাতা চিকণ। এই ধান্যের চাউল অতি সূক্ষ্ম ও পরম সুন্দর। পৃথিবীতে যত শ্রেণীর ধান্য আছে, কেহই ইহার তুল্য উৎকৃষ্ট নহে।

কুড়ী কোলকুড়ী ও জোল ভিন্ন, কূর্ম্মপৃষ্ঠ, ক্রমনিম্ন, অসংস্কৃত সমতল, ও বিলান প্রভৃতি ক্ষেত্রে রাঢ়ি আমন জন্মে না। কিন্তু যে সকল বিলান ক্ষেত্রে বণ্যা-বারি প্রবেশ করে না, অথবা দৈবাৎ যদি বণ্যা হয় তথাপি উর্দ্ধে দুই হস্তের অধিক জল হয় না, এরূপ চাতরের বিলে এই ধান্য উৎপন্ন হইতে পারে। ইহার মৃত্তিকা-ভেদ নাই বলিলেও হয়; কেবল লোণা-ফোটা ও লোণা-সেয়ারা ভিন্ন যে কোন ক্ষেত্রে অর্দ্ধ হস্তের অধিক ও দেড় হস্তের অনধিক জল বদ্ধ হইয়া থাকে, সেই ক্ষেত্রে রাঢ়ি আমন জন্মাইতে দেখা যায়।

ভারতবর্ষের নানা স্থানে এই ধান্যের আবাদ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে রাঢ় অঞ্চলে ইহার অত্যন্ত বাহুল্য বলিয়া, ইহাকে রাঢ়ি আমন বলা যায়। রাঢ়ি আমন, ছোটনা ও বরাণ, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। উভয় শ্রেণীস্থ ধান্যের প্রকৃতি ঠিক একরূপ এবং আবাদেরও কিছু মাত্র ইতর বিশেষ নাই। বিভিন্নতার মধ্যে ছোটনা কিঞ্চিৎ অগ্রে এবং বরাণ কিছু পশ্চাতে সুপক্ক হয়। আর যে সকল ক্ষেত্রে আধ হাত তিন পোয়ার অধিক জল হয় না। তথায় ছোটনা, ও যে সকল ক্ষেত্রে তিন পোয়ার অধিক জল বদ্ধ হয়, তথায় বরাণ-ধান্যের আবাদ হইয়া থাকে। রাঢ়ি আমনের আবাদ দ্বিবিধ প্রণালীতে সম্পন্ন হয়। যথা বপন ও রোপণ। রোপণ করা ধান্য সচরাচর রোয়া শব্দে কথিত হইয়া থাকে।

আবাদের রীতি।

যে প্রণালীতে আশু ধান্য বপন করা যায়, আমন ধান্য বুনানি করিবার নিয়ম অবিকল সেইরূপ। প্রভেদের মধ্যে রাঢ়ি আমনের বীজ বিঘায় বার সের হিসাবে পতিত হয়। আশু ধান্যের মত রাঢ়ি আমনেও মৈ ঘর্ষণ আবশ্যক করে; কিন্তু অধিক পরিমাণে বিদে দিবার ও পুনঃ পুনঃ নিড়াইবার প্রয়োজন হয় না। রাঢ়ি আমনের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়েই বিদের যো পাওয়া যায় না। তজ্জন্য বিদে দেওয়া তাদৃশ ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু না ঘটিলেও বিশেষ হানি হয় না। ইহার আবাদ কাড়ান চাষের উপরেই অধিক নির্ভর করে। সহস্র প্রকার আবাদ করিয়া দিলেও, কাড়ান চাষ ভিন্ন রাঢ়ি আমন বিশেষ তেজস্বী হয় না। আষাঢ় মাসের প্রথম হইতে পোনেরই শ্রাবণ পর্য্যন্ত কাড়ান দিবার উপযুক্ত সময়। বৃষ্টির অভাবে নামলা বাতে ১০ই ভাদ্র পর্য্যন্ত কাড়ান দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু নামলা কাড়ানে ধান্যের আবাদ সুচারুরূপ হয় না।

উপযুক্ত সময়ে ধান্য ক্ষেত্রে জলবদ্ধ হইলে, অগ্রে ঐ জলের পরীক্ষা করিতে হয়। যদি দশ বার দিন পর্য্যন্ত বদ্ধ জল শোষিত না হইয়া স্থির থাকা অনুমান হয়, তবে ক্ষেত্রে কাড়ান চাষ দেওয়া যাইতে পারে। এবং কাড়ান চাষের পর এক পালা বা দুই পালা মৈ দেওয়া আবশ্যক করে। কাড়ানে এক ঘায়ের অধিক চাষ দিবার ব্যবস্থা নাই, তবে তৃণের অত্যন্ত বাহুল্য থাকিলে খুব পাতলা পাতলা করিয়া আলগা মুটে অতি সাবধানতার সহিত দোয়ার চাষ দেওয়া যাইতে পারে।

কাড়ান দেওয়ার অষ্টাহ পরে ক্ষেত্রের তৃণ সকল জলে কাদায় পচিয়া উঠে। তখন ঐ সকল তৃণপুঞ্জ হাতে টানিয়া ক্ষেত্র পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। তদনন্তর পাশকাটি ছাড়িয়া ধানের গাছ ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠে। কাড়ান চাষের দুই তিন দিবস পরে যদি ক্ষেত্রের জল শুখাইয়া যায়, তবে মাটি শিলাইয়া ধান্যের তেজের বিলক্ষণ হানি হইয়া থাকে। এই জন্য কাড়ান চাষের পূর্ব্বে ক্ষেত্রের জল পরীক্ষা করা একান্ত আবশ্যক।

কোন কোন কৃষক কাড়ান চাষ দেওয়ার পরে নিড়ানী (টানা) সমাপ্ত করিয়া ক্ষেত্রে খৈল গুড়া ও সাড়ের গুড়া ছিটাইয়া দেয়। তাহাতে ধান্যের

বিশেষ উপকার দর্শে। আমরা বিবেচনা করি, ক্ষেত্রে এরূপ "উপরসার" দেওয়া প্রত্যেক কৃষকেরই কর্ত্তব্য। তবে যে সকল মাতলা জমির ধান্য ছড়িয়া যাওয়া সম্ভব, তাহাতে সার দেওয়া উচিত নহে।

রোয়া আমন।

যে সকল গভীর কুড়ী ক্ষেত্রে ও চাতরের বিলে অধিক পরিমাণে জল বদ্ধ হইয়া থাকে, সেই সকল ক্ষেত্রে রোয়া মানায় না। আর যে ক্ষেত্রে জলের ভাগ অপেক্ষাকৃত অল্প হয়, তথায় রোয়া ধান দিয়া থাকে।

রোয়া জমিতে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বা তদধ্যে কোন এক সময়ে দোয়ার চাষ দিয়া রাখা কর্ত্তব্য। তদনন্তর ঐ ক্ষেত্রে জল বদ্ধ হইলে, পুনর্ব্বার দোয়ার চাষ ও দুই পালা মৈ দিলে, মৃত্তিকা দধিকাদাবৎ হইয়া উঠে। অনন্তর বীজের আটি বাম হস্তে ধারণ করিয়া, দক্ষিণ হস্তে গুছি লইতে হয়। প্রত্যেক গুছিতে একটি বা দুইটি বাওয়ালি থাকিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। আড়াই পোয়া অন্তরে গুছি বসান কর্ত্তব্য। গুছি যে ভাবে রোপণ করা যায়, তাহা নিম্নলিখিত চিত্র-ক্ষেত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

সমস্ত আষাঢ় মাস ও শ্রাবণ মাসের পোনেরই পর্য্যন্ত ধান্য রোপণের সের বাত। তদনন্তর নামলা বাত বলে। নামলা বাতের ধান্য তাদৃশ উৎকৃষ্ট হয় না। কারণ আমন ধান্য মাত্রেই আশ্বিন মাসের মধ্যে থোর হইয়া কার্ত্তিক মাসের প্রথমেই ফুলাইতে আরম্ভ করে। শ্রাবণ মাসের শেষে ও ভাদ্র মাসে যে ধান্য রোপণ করা যায়, তাহার থোড় সঞ্চার হইতে অধিক সময় থাকে না। অতি অল্প কালের মধ্যে ধান্য অধিক বাড়িতে ও ঝাড়াইতে পায় না। সুতরাং নামলা বাতের ধান্যের ফলন নিতান্ত কম হইয়া যায়। আর যে ধান্য সের বাতে রোয়া হয়, তাহার বৃদ্ধি প্রাপ্তির অনেক সময় থাকে। ঐ দীর্ঘ কালের মধ্যে অধিকাংশ পাশকাটি ছাড়িবার অবকাশ পায় এবং ধান্যের ঝাড় সকল বৃহৎ হইয়া উঠে। এই জন্য

কৃষকেরা বলে, "আষাঢ়ে রোয়া আশী কাটি।" আরও একটি বচন কহিয়া থাকে, যথা—"আষাঢ়ে রোয়া শীষকে, শ্রাবণে রোয়া বিশকে, ভাদ্রে রোয়া কীষকে, আশ্বিনে রোয়া দিশকে।" আশু-প্রকরণে বলা হইয়াছে, বৈশাখী রোয়া আষাঢ়ে রোয়া। বাস্তবিকই আষাঢ় ও শ্রাবণের মধ্যে যে সকল ধান্য রোয়া হয়, তাহাদেরই ফলন অতি উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। আর ভাদ্র মাসে রোয়া ধান্যের কেচিটীর ন্যায় শীষ বহির্গত হয় এবং আশ্বিন মাসের রোয়ায় আদৌ ধান্য হয় না বলিলেই হয়। অতএব যে কৃষকের দিশে গুলো লাগে, সেই কৃষকই আশ্বিন মাসে ধান্য রোপণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। ফল কথা, আশ্বিন মাসে ধান্য রোপণ করিতে নাই।

যে দিবস ধান্য রোপণ করা যায়, তাহার পর দিন একবার ক্ষেত্র খানি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরিদর্শন করা কর্ত্তব্য। কোন স্থানের দুই চারিটা গুছি যদি জল-হিল্লোলে উপড়াইয়া স্থানচ্যুত হইয়া যায়, তবে ঐ সকল গুছি পুনর্ব্বার স্বস্থানে বসাইয়া দিতে হয়। এবং দশ বার দিন পরে রোয়ার জমির মাটি ছাটকাইয়া তৃণ সমুদয় টানিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

ধান্যের যে বীজ রোপণ করা যায়, তাহা দ্বিবিধ উপায়ে সংগৃহীত হইয়া থাকে। প্রথম, বুনানী ক্ষেত্রে বাওয়ালি ঘন থাকিলে, কাড়ান চাষ দেওয়ার পূর্ব্বে তাহা তুলিয়া লওয়া যাইতে পারে। অপর, আকরে পাত দিয়া বীজ প্রস্তুত করা হয়। দুই প্রকার পদ্ধতি ক্রমে পাত প্রস্তুত করা গিয়া থাকে। প্রথম "বুনানী পাত," দ্বিতীয় "নেগুচ্ করা"।

বুনানী পাত।

যে প্রণালীতে ধান্য বুনানি করা যায়, বীজপাত দেওয়ার নিয়ম অবিকল সেই রূপ। প্রভেদের মধ্যে বীজতালায় বিঘা প্রতি ষোল সের হইতে বত্রিশ সের পর্য্যন্ত বীজ বুনানি করিতে পারা যায়। এবং বীজ বুনানির পর ক্ষেত্রে আর চাষ দিবার আবশ্যক হয় না, কেবল মাত্র দুই পালা মৈ দিয়া রাখিতে হয়। বীজের আকরে প্রথমে চাষ দেওয়ার সময় ও বীজ বাহির হওয়ার পরে কিছু সার দেওয়া একান্ত আবশ্যক করে।

বিলান ক্ষেত্র ভিন্ন সমুদয় ক্ষেত্রে, এবং লোণা-কোটা ও লোণা-সেয়রা ভিন্ন সমস্ত মৃত্তিকায় পাত দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যে সকল জমিতে সচরাচর আধ হাত আন্দাজ জল হইয়া থাকে, সেই সকল জমিতেই ধান্য বীজ পাত দেওয়া প্রশস্ত; এবং বীজতালার মাটি বিশেষ তেজস্বী হওয়া আবশ্যক। মরা মাটিতে পাত দিলে, বীজ ভাল যোগায় না। বীজ উত্তম যোগাইলে ⁄২ দুই সের ধান্য বীজে এক বিঘা জমি রোয়া হইতে পারে। নতুবা চারি সের পাঁচ সের বীজ লাগিয়া থাকে।

বীজ তালার মাটি ক্রমে ক্রমে চষিয়া উত্তম মেড়েলো করিতে হয়। যখন দেখা যায়, চাষে চাষে মাটি ধূলিবৎ হইয়া গিয়াছে ও কোন স্থানে তৃণ বা আগাছার চিহ্ন মাত্র নাই, সেই সময় পাতর বীজ বুনানি করা কর্ত্তব্য। পাত বুনানির পর চাষ দিবার নিষেধের কারণ এই যে, ধান্য অধিক ভূতলে প্রবিষ্ট হইলে, বীজ তুলিবার সময় সহজে উঠাইতে পারা যায় না। জোরের সহিত টানিয়া তুলিতে হইলে, প্রায়ই বোট ছিন্ন হইয়া যায়। এরূপ ঘটনা-স্থলে নিড়ানীর সাহায্য ব্যতিরেকে, বীজ উত্তোলন করা সুকঠিন হইয়া উঠে। অথচ নিড়ানীর দ্বারা বীজ উঠাইতে হইলে খরচ-বাহুল্য হইয়া থাকে। অতঃপর বুনানীর পূর্ব্বে অধিক পরিমাণে চাষ দিয়া, পরে চাষ না দেওয়াই শ্রেয়ঃ। কিন্তু এ দেশের কৃষকেরা ছেও লাঙ্গলে আলগা মুটে এক ঘা চাষ দিয়া থাকে।

নেওচ্ করা।

কোন ক্ষেত্রে অর্দ্ধ হস্ত বা তন্ন্যূন পরিমাণ জল বদ্ধ থাকিলে ঐ ক্ষেত্রে পুনঃপুনঃ চাষ ও মৈ ঘর্ষণের দ্বারা উত্তমরূপে কাদা প্রস্তুত করিতে হয়। তদনন্তর কাদায় জলে বীজ ছিটাইয়া দিলে, বীজগুলি কর্দ্দম মধ্যে প্রোথিত হইয়া যায়। ইহারও বীজ প্রতি বিঘায় বত্রিশ সের হারে ফেলান যাইতে পারে। বীজ বপনের পর ক্ষেত্রে মৈ দিবার আবশ্যক হয় না।

অনন্তর ঘোলা বসিয়া জল পরিষ্কার হইলে, ক্ষেত্রের আইল কাটিয়া ঐ জল বাহির করিয়া দিতে হয়। এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত ক্ষেত্র জলশূন্য হইয়া থাকিলেই, ধান্যের চারা বাহির হইয়া পড়ে। তখন উপরে কিছু সার

ছিটাইয়া দিয়া ক্ষেত্র পুনর্ব্বার জলপূর্ণ করিয়া দিতে হয়। তাহা হইলে অল্প দিনের মধ্যে বীজ যোগাইয়া উঠে।

বুনানী পাতই হউক, আর নেওচ্ করাই হউক, বীজ সকল চতুরঙ্গুলি মাত্র উচ্চ হইলে, পাতের আকারে সর্ব্ব। জল বদ্ধ থাকা আবশ্যক করে। নতুবা বীজ ভাল হয় না। ডেঙ্গার বীজ জলে রোপণ করিলে, বীজ জলে শীঘ্র লাগে এবং অল্প দিনের মধ্যেই তেজস্বী হইয়া উঠে।

কোন কোন প্রদেশে ধান্য বীজ পাত দেবার জন্য কাষ্ঠ ও ঘুটের দ্বারা ভূমি পোড়াইয়া দেওয়া হয়। সে ব্যবস্থা মন্দ নহে। পোড়াইয়া দিলে মাটি অধিক উর্ব্বরা হইয়া উঠে। এবং তত্রত্য আগাছা ও তৃণ এবং তৃণ-বীজ ও ঝাড়া ধান্য সমুদয় দগ্ধ হইয়া ধান্য-বীজ অতি বিশুদ্ধ ভাবে প্রস্তুত হইয়া থাকে। সে ধান্য-বীজই যে বিশেষ তেজস্বী হয়, তাহার সন্দেহ নাই। কৃষি গেজেটে ইহা রাঁব নামে কথিত হইয়াছে।

বিশেষ বিধি।

ক্ষেত্রে যে দিবস ধান্য রোপণ করা যায়, তাহার পূর্ব্ব দিবস আকর হইতে বীজ উঠাইয়া রাখা কর্ত্তব্য। উত্তোলনের সময় তিন চারি মুষ্টি বীজ একত্রে আঁটি বাঁধিয়া মূল দেশে কর্দ্দম লেপিত করিয়া রাখিতে হয়। রজনীর মধ্যে বীজের মূল দেশ হইতে নূতন চুঙ্গরী বহির্গত হইবার উপক্রম হইয়া থাকে। সদ্যোজাত কর্দ্দমে তাহা রোপণ করিলে, সত্বরে ধান্যের গুছি সকল লাগিয়া যায়। এই নিমিত্ত কৃষকেরা কহে যে, "সাঁজো কাদা বাসি বীজ, রুইতে না পারিস্ ছড়িয়ে দিস্।" কিন্তু এ নিয়ম সকল সময় রক্ষা পায় না। ভূমি কইতে রুইতে বীজ অসঙ্কুলান হইলে, সদ্যবীজ উঠাইয়া রোপণ করা হয়। এবং অন্যান্য কারণ বশতঃ দুই তিন দিনের কাদাতেও বীজ রোপিত হইয়া থাকে।

আধ হাত আড়াই পোয়া উচ্চ যে বীজ, তাহাই রোপণ করা প্রশস্ত। তাহার ছোট হইলে বীজ প্রায় জলে চবকাইয়া যায়, এবং অধিক বড় হইলে, প্রায় উপড়াইয়া পড়ে। সুতরাং জলের সমযোগ্য ভিন্ন নিতান্ত ছোট বীজ রোপণ করা কর্ত্তব্য নহে এবং অধিক বড় হইলে পাতা কাটিয়া

রোপণ করা উচিত। পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে যে, বীজ উত্তম যোগাইলে /২ দুই সের ধান্য বীজে এক বিঘা জমি রোয়া হইতে পারে। কিন্তু যত বিঘা রোয়ার জমি থাকে, তাহার প্রত্যেক বিঘায় /৪ চারি সের হারে বীজ পাত দেওয়া কর্ত্তব্য।

রোয়া ও কাড়ানের পর হইতে এই ধান্যের ক্ষেত্রে জল বদ্ধ হইয়া থাকা আবশ্যক করে। বিন্দু বিন্দু জলে মাটি সিক্ত মাত্র থাকিলে, আমন ধান্যের পক্ষে বিশেষ উপকার দর্শে না। অহরহঃ ইহার মূল দেশে অর্দ্ধ হস্ত বা হস্তোধিক পরিমিত জল বদ্ধ হইয়া না থাকিলে, এই ধান্য আদৌ জন্মে না। তবে রোয়া কাড়ানের কতক দিন পরে একবার ক্ষেত্রের জল শুখাইয়া কর্দ্দম থাকিতে থাকিতে, পুনর্ব্বার জলপূর্ণ হইলেই ভাল হয়। কৃষকেরা একটি বচন কহিয়া থাকে, "কর্কট ছরকট, সিংহ শুখো, কন্যা কাণে কাণ। তুলাতে না বহে বাতাস, কোথা রাখি ধান।" শ্রাবণ মাসে আমনের ক্ষেত্র জলপূর্ণ হইয়া, ভাদ্র মাসে ঐ জল একবার শুখাইয়া পুনর্ব্বার যদি আশ্বিন মাসে ক্ষেত্র জলপূর্ণ হয়, এবং কার্ত্তিক মাসে যদি প্রবল রূপে বায়ু প্রবাহিত না হয়, তবে এই ধান্য প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

আমন ধান্য ফুলানর পর আশু ধান্যের ন্যায় দ্বিধা বিভক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু আশু ধান্যের উভয় খণ্ড একত্র সংযোজনার জন্য যেমন বৃষ্টি জলের প্রয়োজন হয়, আমন ধান্যের সেরূপ হয় না। এ সম্বন্ধে আমন ধান্যের প্রকৃতি আশু ধান্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। শিশির বিন্দু স্পর্শে আমনের উভয় খণ্ড একত্রিত হইয়া থাকে। বরং ফুলানর পর অধিক বৃষ্টি হইলে, আমন ধান্যের মধ্যে শস্য সমুদ্ভব না হইয়া অধিকাংশই আগড়া (চিটে) পড়িয়া যায়। এই জন্য কৃষকেরা বলে, "আউষের মাথায় জল, আমনের গোড়ায় জল।"

প্রতি বৎসর রাঢ়ি আমনের ক্ষেত্র সংস্কার করিয়া দিতে হয়। অর্থাৎ ক্ষেত্রের জল নিঃসারিত হইয়া অন্য ক্ষেত্রে যাইতে না পারে, এই অভি-সন্ধিতে চারি দিকের আইল উচ্চ রূপে বান্ধিয়া রাখিতে হয়। প্রতিবৎসরই দেখা যায়, কর্কট ও নানা জাতীয় কীট লাগিয়া আইলের অভ্যন্তর ছিদ্রযুক্ত করিয়া ফেলে। এই জন্য বৎসর বৎসর মাটি দিয়া আইলের ছিদ্র সকল

অবরোধ করিয়া দিতে হয়। কিন্তু মাট একতালা হইলে, অথবা গভীর কুড়ী ক্ষেত্র হইলে এরূপ প্রণালীতে আইল না বাঁধিলেও চলিতে পারে। তবে ভিত পরিষ্কার করিবার সময় মাটি কাটিয়া আইলের উপরে দেওয়া হইয়া থাকে। অধিক বৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে, আষাঢ় মাসের প্রথমেই আমনীয়া জমির আইল বন্ধন করিয়া করিয়া দেওয়া উচিত। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে আকাশের ভাব গতিক দেখিয়া জল হইবার লক্ষণ বেশ বুঝিতে পারা যায়। এ সম্বন্ধে খণার একটি বচন আছে, যথা, "কোদালে কুড়ুলে (১) মেঘের গা, এলো মেলো বহে বা, মাঠে গিয়ে শ্বশুর বাঁধ আল, আজ না হয় হবে কাল (২)।"

আমনীয়া জমির সংস্কারের প্রতি কৃষকের অমনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য নহে। ক্ষেত্রের কোন স্থান উচ্চ নীচ থাকিলে, উচ্চ স্থানের মৃত্তিকা কাটিয়া নিম্নস্থানে নিক্ষেপ করিতে হয়। কোন ক্ষেত্র কিঞ্চিৎ ক্রমনিম্ন ভাবে অবস্থিত হইলে, তাহার মধ্যস্থলে একটী আইল প্রস্তুত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া উচ্চ নিম্ন ক্রমে উভয় খণ্ডই সমতল হইয়া যায়। আমনের জমি যত সমতল হইবে, ততই তাহা শ্রেষ্ঠতা লাভ করিবে।

চুণে মেটেল ভিন্ন অন্যান্য মৃত্তিকায় রোয়া কাড়ানের সময় চাষের বাহুল্য প্রযুক্ত, অধিক কাদা হইলে ধান্য প্রায় পাঁকি লাগিয়া যায়। আর শাঁখি নামে এক জাতীয় কীট আছে, তাহাতে ধান্যের পাতা বিনষ্ট করিয়া ফেলে। শাঁখি জলের দোষেই জন্মিয়া থাকে। পাঁকি ও শাঁখি নিবারণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়, আলি কাটিয়া অথবা সেচনের দ্বারা জল নিঃসারণ করিয়া, ক্ষেত্রের মৃত্তিকা অল্প পরিমাণে শুখাইয়া দেওয়া। তদ্ভিন্ন ঐ রোগদ্বয় আর কিছুতেই উপশম করিতে পারা যায় না।

ধান্যের পাতা ক্রমে ক্রমে বাহির হইতে থাকে। তাহার মধ্যে কোন কোন গাছের পাতা কলিকা পাতার মত না হইয়া, শলাকাবৎ গোলাকার

(১) স্তুপস্তর মেঘ।

(২) আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, এই লক্ষণ ঘটিলে নিশ্চয়ই জল হইয়া থাকে। এ বিষয় এ দেশের কোন কৃষকের অজ্ঞাত নাই। তাহারা বলে, "কোদালে কুড়লেকে না দিও গাল, আজ না হয় হবে কাল।"

হইয়া বাহির হয়, তাহাকে "ভেঁপুলাগা" বলে। যে গাছে ভেঁপু লাগে, সে গাছে পাতা বা শীষ হইবার স্থান থাকে না। ভেঁপুই তাহার জীবনের পরিণাম ক্রিয়া রূপে গণ্য হয়। ভেঁপু বড় ভয়ানক রোগ। তবে যে গাছটিতে ভেঁপু লাগে, সেইটীই নষ্ট হইয়া যায়, ঝাড়ের অপরাপর পাশ কাটী সকল তেজস্বী হইয়া উঠে। ভেঁপুর উৎপত্তির কারণ কিছুই বুঝা যায় না।

এই ধান্য আশ্বিন মাসের মধ্যে থোর হইয়া, কার্ত্তিক মাসের প্রথমেই ফুলাইতে আরম্ভ করে ও অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে পাকিয়া উঠে। এই ধান্য কাটাইয়ের পর অধিকাংশই ঠেঙ্গাইয়া লওয়া হয়; কেহ কেহ বা সামান্য পরিমাণে মলাইও করিয়া থাকে। ঠেঙ্গান এবং মলাই ধান্য কুলার দ্বারা উড়াইয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়।

ঠেঙ্গান ধান্যের আটিকে আউড় বা বিচালি বলে। তাহা গোরুর পক্ষে অতি উপাদেয় খাদ্য। প্রদেশ বিশেষে আউড়ের দ্বারা ঘর ছাওয়াও হইয়া থাকে।

বাগ্ড়ো আমন।

বাগ্ড়ো আমন, ছোটনা ও বরাণ এই দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। অন্যান্য ধান্য অপেক্ষা ইহার শ্রেণী-বিভাগ বড় আশ্চর্য্য। ছোটনা ও বরাণ, এই উভয় শ্রেণীস্থ ধান্যের আকার দেখিয়া সহসা এক জাতীয় ধান্য বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু উভয় শ্রেণীস্থ ধান্য এক বিলান ক্ষেত্রের মধ্যে এক সময়ে বুনানী ও উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ইহা বৈশাখ মাসের প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত বুনানি করা যায়। কিন্তু পোনেরই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত সের বাত, তদনন্তর নামলা বাত বলিতে হয়। ইহা কার্ত্তিক মাস হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে পাকিয়া উঠে। ইহার মধ্যে "কাল বয়রা" প্রভৃতি কয়েক জাতীয় ধান্য পাকিতে প্রায় পৌষ মাস গত হইয়া যায়।

রাঢ়ি আমনের সহিত ইহার আবাদের কোন সৌসাদৃশ্য নাই। বরং আশু ধান্যের সহিত ইহার আবাদের যথেষ্ট ঐক্য আছে। প্রভেদের মধ্যে,

আষাঢ় মাসে নিড়ানী সমাপ্ত না হইলে, আশু ধান্য সুচারু গোছ জন্মে না; কিন্তু এই ধান্য শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত নিড়ান যাইতে পারে। ইহার বীজ প্রতি বিঘায় যোল সের হারে পতিত হয়। কিন্তু হেড়মো মেটেল যুক্ত যে সকল বিলান ক্ষেত্রে অধিক বিদে দিবার প্রয়োজন হয় না, সেই সকল ক্ষেত্রে দশ বার সের বীজ ফেলিলেও চলিতে পারে।

বিলান ক্ষেত্র সকলে এই ধান্য বুনানি করিতে অধিক চাষ লাগে না। কার্ত্তিক মাসে রবিখন্দ বুনানীর সময় তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। কথকাংশ ছিটান ও কথকাংশ চাষ বুনানি হইয়া, অপর যে সকল জমি যোয়ায় না, তাহারা পতিত পড়িয়া থাকে (১)। তাহার মধ্যে ছিটান ও পতিত জমিতে তেয়ার এবং চাষের জমিতে দোয়ার মাত্র চাষ দিয়া এই ধান্য বুনানি করা যায়। বিলান ক্ষেত্র মাত্রেই প্রায় কাক্‌ড়ি বুনানি হইয়া থাকে। কিন্তু কাক্‌ড়ি করার পূর্ব্বে ক্ষেত্রের হালী কাটিয়া দিতে হয়। ধান্য মাত্রেই এক চাষের নীচে বুনানি হইয়া থাকে। আশুধান্যে যে প্রণালীতে মৈ বিদে দেওয়া হয়, ইহাতেও মৈ বিদে দেওয়ার ব্যবস্থা অবিকল সেই রূপ। কিন্তু বাগ্‌ড়ো আমন একবার নিড়াইলেই হইতে পারে। নিড়ানীর পরে ভাদ্র মাসে কাচির দ্বারা আর একবার সোলা কুঁচ প্রভৃতি আগাছা সকল কাটিয়া দিতে হয়। তবে ছোটনা আমন ও আশু এক সঙ্গে দোমুট বুনানী থাকিলে, দুইবার নিড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক করে। বাগ্‌ড়ো আমনে কাড়ান চাষ খাটে না।

বাগ্‌ড়ো আমন, ছোটনা (২)।

ছোটনা বাগ্‌ড়ো আমনের গাছ অবিকল আশু ধান্যের তুল্য। ইহা উচ্চে দুই তিন হস্তের অধিক বড় হয় না। কূর্ম্মপৃষ্ঠ, ক্রমনিম্ন, সমতল, গভীর

(১) জল বদ্ধ থাকা প্রযুক্ত কার্ত্তিক মাসে খন্দ বুনানীর সময় যে সকল জমিতে যো হয় না সেই সকল জমি শীতকালে চষা গিয়া থাকে। শীতের চাষ বড় উপকারী।

(২) কেঁকো, ডেঙ্গাকুড়ি, কার্ত্তিকে ঝেপু, দুদনাড়ি, কুঁচে, রোয়াকেলে, ডহর নাগরা, মেঘলাল, আগার মাণিক, দুধমুনি, আয়না, ইত্যাদি। ক্রমে ক্রমে জল বৃদ্ধি হইলে, ইহারা আড়াই হাত পর্য্যন্ত জলের উপর উঠিতে পারে। তাহার অধিক জলে আর উঠিতে সক্ষম হয় না, পচিয়া যায়।

বিলের চাতাল, ও রই ভিন্ন, আড়কান্দী, চাতরের বিল, কুড়ী প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই ধান্য জন্মিয়া থাকে। বর্ষাকালে যে সকল ক্ষেত্রে অর্দ্ধ হস্তের অধিক ও তিন হস্তের অনধিক জল বদ্ধ হইয়া থাকে, সেই সকল ক্ষেত্রে ইহা উৎপন্ন হইতে পারে।

কখন কখন আশুধান্যের বীজ অর্দ্ধেক ও এই ধান্যের বীজ অর্দ্ধেক একত্রে মিশাইয়া এক ক্ষেত্রে বুনানি করা হয়, তাহাকে "দোমুট" বলে। এক আবাদেই উভয় ধান্যের আবাদ সম্পাদন হইয়া থাকে। দোমুট বুনানিতে আশুধান্যের পোয়াল নষ্ট হইয়া যায়। কারণ ভাদ্র মাসে আশুধান্য সুপক্ক হইলে, তাহার গোড়া কাটিবার উপায় থাকে না; অগত্যা কেবল শীষগুলি কাটিয়া লইতে হয়। তৎসঙ্গে আমনের পাতার অগ্রভাগ কাটা পড়িয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন হানি হয় না। দোমুট বুনানীর গুণ এই যে, সুপালিতের বৎসর হইলে আশু যে পরিমাণ জন্মে, আমনও সেই পরিমাণ জন্মিয়া থাকে। তবে আশুধান্যের পোয়াল যাহা নষ্ট হইয়া যায়, তাহা মাটি হইয়া ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করে। আমন কাটার পরে, দোমুটের জমিতে আবার ছোলা, গোম, মশুর ইত্যাদি বুনানি করা গিয়া থাকে।

ছোটনা বাগ্‌ড়ো আমন পাত দিয়া রোপণ করিলেও হইতে পারে। রোয়ার বৃত্তান্ত পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

বাগ্‌ড়ো আমন বরাণ্ (১)।

ছোটনার সহিত বরাণের আবাদের কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু বরাণের প্রকৃতি অতি আশ্চর্য্য। ইহাকে এক প্রকার জলের দাম দল বলিলেও বলা যাইতে পারে। বন্যা বারি অথবা বর্ষার জলপ্লাবিত গভীর বিলান ক্ষেত্র ও চাতরের বিলের রই ভিন্ন এই ধান্য অন্য কোন ক্ষেত্রে জন্মে না। ইহার মূল দেশে অল্প মাত্র জল বদ্ধ হইলে, তাহাতে কোন উপকার দর্শে না। অন্যূন দুই তিন হস্ত জলের উপর ভাসমান না হইলে ইহার আলস্য দূর হয় না।

(১) কৃষ্ণকলি, মুক্তাহার, ছোট দীঘে, বড় দীঘে, নেংড়া, ধলি, পিণ্ডরাজ, কেয়ারশালী দুধ আমলা, পুঁটি, কলমা, ন্যাপো, লালকাবাই, মেহেরকল, হাশবত, কালবয়রা, ইত্যাদি।

যে ক্ষেত্রে এই ধান্যের আবাদ হয়, তথায় বৃষ্টি বারি বদ্ধ হইয়া থাকে। কোথাও বা বন্যার জল আসিয়া তাহার সহিত যোগ দান করে। ভর্ষা বা বন্যা যদি এককালে অত্যন্ত অধিক বাড়িয়া উঠে, তবেই এই ধান্য জলনিমগ্ন হয়। নতুবা সামান্য ভর্ষা বা বন্যার জলে ইহার কোন ক্ষতি করিতে পারে না। সোণামুখী বান হইলে, অর্থাৎ বন্যার জল যদি ক্রমে ক্রমে বাড়িতে থাকে, তবে বাগেড়ো বরাণ্ বিংশতি হস্ত জলের উপর ভাসিতে সমর্থ হয়। দেখা গিয়াছে, জলে যদি ঘোলা না থাকে, এরূপ জল ধান্যের গাছের উপর দুই হাত পরিমাণ বাড়িয়া উঠিলেও, সেই সময় যদি রৌদ্রের চকশা পায়, এবং ঝড় তুফান যদি না হয়, তবে জলের মধ্যে মধ্যে পাতা ফেলিয়া দুই দিনের মধ্যে এই ধান্য অনায়াসে জাগিয়া উঠে।

জলপ্লাবন ব্যতীত এই ধান্য কোন মতেই জন্মে না। জাতি বিশেষে ইহা সচরাচর তিন হাত হইতে দশ বার হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে। একটি গভীর বিলের আড়কান্দিতে দুই হাত ও ক্রমে ক্রমে মধ্যস্থানে দশ হাত পর্য্যন্ত জল হয়। কিন্তু জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য সৃষ্টিকৌশল! যে ক্ষেত্রে দুই হাত জল হয়, তথায় কার্ত্তিকে ডেপু, তিন হাতের স্থলে দেব মুনি, দুদনাড়ি, চারি হাতের স্থলে কৃষ্ণকলি, পাঁচ হাতের স্থলে ছোট দীঘে, বড় দীঘে, ছয় হাত স্থলে নেতো, ধলি, সাত হাত স্থলে পিওরাজ, আট হাত স্থলে মুক্তাহার, কেয়ার শাল, নয় হাত স্থলে হাশবত, দশহাত স্থলে কালবয়রা, ইত্যাদি ক্রমে জন্মিয়া থাকে। আবার যেখানে আধ হাত তিন পোয়ার বেশী জল হয় না, সে ক্ষেত্রে ডেঙ্গাকুড়ি, আঁধারমাণিক কেঁকো, আয়দা, ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। এই সকল ধান্য দোনুটি বুনানি হইয়া থাকে। বিল জোলের মধ্যে যত পৃথক পৃথক শ্রেণীর ক্ষেত্র আছে, তত পৃথক পৃথক প্রকৃতির ধান্যও আছে। তদ্‌বৃত্তান্ত বিস্তারিত রূপে লিখিতে গেলে এরূপ দশখানি কৃষিতত্ত্বেও তাহা সঙ্কুলান হইয়া উঠে না। কৃষকেরা বলে, ক্ষেত্র ভেদে পৃথিবীতে হাজার এক জাতীয় ধান্য আছে; ইহা নিতান্ত অলীক বলিয়া বোধ হয় না। কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ ধান্য জন্মে, তাহা যথারীতি আমি ত লিখিতে পারিলাম না। কিন্তু তাহা কখন যে কাহারও দ্বারা লিপিবদ্ধ হইবে, এরূপ আশা করা যা না। তবে এতদ্ গ্রন্থে স্থূল স্থূল বিবরণ যাহা লেখা হইল,

তাহা পাঠ করিয়া কৃষক কৃষিকার্য্য করিতে অবশ্যই সক্ষম হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই।

বরাণ ধান্য অনেক সময় বনে খড়ে বুনানি করা যায়; তাহাকে "বাওড়া বোনা" বলে। যে সকল বিলান ক্ষেত্র জ্যৈষ্ঠ মাসের জলের ঢলে ডুবিয়া যায়, সেই সকল ক্ষেত্রের ধান্য পাইবার অধিক আশা থাকে না। "হাজে কাঠা বাধে বিশ" বলিয়া কৃষকেরা ঐ সকল ক্ষেত্রে দোয়ার চাষ দিয়া বিঘা প্রতি দশ বার সের হিসাবে ধান্য বীজ ফেলাইয়া রাখে। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ের ঢলের জলে টিকিয়া গেলে আর তাহার মার নাই। একবার জলের উপর ভাসিয়া উঠিলে বনে খড়ে বাওড়া ধান্যের কিছুই করিতে পারে না। বাওড়া ধান্যের ফলন নিতান্ত মন্দ নহে। বিঘায় ছয় মণ সাত মণ পর্য্যন্ত ধান্য উৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে।

এই ধান্যের গোড়ায় না কাটিয়া গাছের আগা দুই হাত আন্দাজ কাটিয়া লওয়া হয়। কাটাই ধান্য মলাই করিয়া উড়াইলে পরিষ্কার হইয়া যায়।

বোরো ধান্য।

বোরো ধান্য সর্ব্বত্রই এক রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ছোটনা বরাণ ইত্যাদি কোন প্রভেদ নাই। এই ধান্য প্রায় বার মাসই জন্মিয়া থাকে। ইহা অন্যান্য সকল ধান্য হইতে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট। বোরো ধান্য দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ, কচিৎ শ্বেতবর্ণও লক্ষিত হয়। কিন্তু শ্বেত, কৃষ্ণ, পৃথক জাতি বলিয়া বোধ হয় না। কৃষ্ণবর্ণ ধান্য কোন কারণ বশতঃ ঈষৎ শ্বেতাক্ত হইয়া যায়। একটি শীষে শ্বেত কৃষ্ণ উভয় বর্ণের ধান্যই দেখা গিয়াছে।

বোরোর গাছ কিঞ্চিৎ চিকণ; তাহা দুই হস্তের অধিক উচ্চ হয় না। ইহার চাউল প্রায় আশু ধান্যের তুল্য, কিন্তু ভাত উত্তম রূপ সুসিদ্ধ হইতে দেখা যায় না। সুতরাং বোরো ধান্যের অন্ন একটু খস্‌খসে ও মিষ্ট কম। কিন্তু ইহার সদৃশ ফলন কোন ধান্যেরই নহে। ইহা সচরাচর বিঘায় ষোল মণ পর্য্যন্ত জন্মিয়া থাকে। এই ধান্যের আবাদ দ্বিবিধ প্রকারে সম্পন্ন হয়, যথা, রোয়া ও বুনানি।

রোপিত বোরো।

বিলগর্ত্তে ও পুষ্করিণী গর্ত্তে যে পঙ্কিল ভূমি থাকে, তথায় রোপিত বোরো উৎপন্ন হয়। তদ্ভিন্ন অন্য কোন ক্ষেত্রে ও কোন মৃত্তিকায় রোয়া বোরো জন্মে না। ইহার রোপণ প্রক্রিয়া আমনেরই তুল্য। প্রভেদের মধ্যে আমনের গুছি অপেক্ষা বোরোর গুছি কিঞ্চিৎ ঘন করিয়া বসাইতে হয়। প্রত্যেক গুছি প্রায় অর্দ্ধ হস্ত অন্তরে প্রোথিত করা হইয়া থাকে। আমনের গুছিতে একটি বা দুইটির অধিক গাছ থাকে না; কিন্তু বোরোর গুছিতে চারি পাঁচটি পর্য্যন্ত গাছ দেওয়া হয়। বোরো ধান্যের ক্ষেত্র কর্দ্দমময়, তথাপিও বোরোর প্রকৃতি গুণে পঙ্কোপরে কিয়ৎ পরিমাণে জল বদ্ধ থাকা অবশ্যক করে। ইহার বীজ প্রস্তুতের প্রকরণ ও ক্ষেত্রের পাইট প্রণালী আমন ধান্য হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; তাহা ক্রমশঃ লিখিত হইতেছে।

বীজ প্রস্তুতের বিবরণ।

একটি কলসের মধ্যে বীজ পুরিয়া তাহাতে জলপূর্ণ করিয়া রাখিতে হয়। অষ্ট প্রহরের পর কলসের মুখে বস্ত্র বা তৃণ গুচ্ছের আবরণ দিয়া, কলসটি উবুর করিয়া দিলে ক্রমে সমুদয় জল নিষ্কাশিত হইয়া যায়। তদনন্তর কোন স্থানে কতকগুলি শুষ্ক তৃণ বা পোয়াল বিছাইয়া তাহার উপর কদলী পত্র বা মান পত্র পাতিয়া ঐ পত্রোপরি তিন বুরুল পরিমিত উচ্চ করিয়া বীজগুলি পাত দিতে হয়। পুনর্ব্বার ধান্যোপরি কদলী পত্রের আচ্ছাদন দিয়া একটা চটের দ্বারা ঢাকিয়া রাখিলে চারি পাঁচ দিনের মধ্যে বীজ সকল অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। কিন্তু প্রত্যহ বীজের উপরিস্থিত আচ্ছাদন সকল উঠাইয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জল সিঞ্চন করিতে হয়। জল সিঞ্চনের পর আবার পূর্ব্ববৎ ঢাকিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

উক্ত রূপ প্রক্রিয়া দ্বারা বীজের অঙ্কুর সকল ক্রমশঃ দেড় ইঞ্চ দুই ইঞ্চ লম্বা হইয়া উঠিলে তাহাকে "তুলামুখি" বলে। তুলামুখি বীজ পরস্পর শিকড়ে শিকড়ে সংযোজিত হইয়া থাকে। সাবধানতা পূর্ব্বক জড়িত অঙ্কুর সমুদয় ছাড়াইয়া বীজ পৃথক পৃথক করিতে হয়। তাহার পর জলাশয়ের নিকটস্থ (পূর্ব্বের পাইট করা) কর্দ্দমময় ক্ষেত্রে বপন করিলে

চারি পাঁচ দিনের পরে গাছ বাহির হইয়া থাকে। কিন্তু যে অবধি ধান্যের চারা চারি পাঁচ অঙ্গুলি উচ্চ না হইয়া উঠে, সে পর্য্যন্ত বীজতালায় জল থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। ক্রমে বাওয়ালি সকল একটু উচ্চ ও পত্র-বিশিষ্ট হইয়া উঠিলে, তখন বীজতালা সর্ব্বদা জলপূর্ণ করিয়া দিতে হয়।

কোন কোন বিলের উভয় তীরে অনেক উৎস বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায়। বোরো ধান্যের বীজতালা সেই সকল উৎসের নিকটেই প্রায় মনোনীত হইয়া থাকে। উৎসের একটি দাঁড়া বীজতালার সহিত সংলগ্ন করিয়া দিলে বীজতালা সর্ব্বদা জলপূর্ণ হইয়া থাকিতে পারে, এবং পুনঃ পুনঃ জল পরিবর্ত্তন হইয়া নূতন জলে বীজের যথেষ্ট তেজ বৃদ্ধি করে। উৎসের জলযুক্ত বীজতালায় বোরোর বীজ অতি শীঘ্র যোগাইয়া উঠে। কিন্তু এরূপ সুবিধা সর্ব্বদা ঘটে না।

যথায় উৎসের অভাব হয়, তথায় এরূপ কৌশলে বীজতালা প্রস্তুত করিতে পারা যায় যে, নিকটস্থ জলাশয়ের জল আসিয়া তাহা পূর্ণ করিয়া রাখে। সে কৌশল অতি সহজ। যে স্থানে বীজতালা প্রস্তুত করিতে হয়, সেই স্থানের মাটী উঠাইয়া নিকটস্থ জলসীমা হইতে স্থানটী কিঞ্চিৎ নিম্ন করিয়া জলের দিকে একটি বাঁধ দিয়া রাখিতে হয়। প্রয়োজন মতে বাঁধটি কাটিয়া দিলে আপনাপনি জল আসিয়া বীজতালা পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। যে স্থানে উৎস নাই এবং এরূপ কার্য্যও না ঘটে, তথায় অগত্যা সেচনের দ্বারা বীজতালা জলপূর্ণ করিয়া দিতে হয়। বীজতালায় জল বদ্ধ হইয়া না থাকিলে বোরোর বীজ ভাল রূপ যোগায় না।

বীজ আধ হাত আড়াই পোয়া উচ্চ হইয়া উঠিলে তাহা ক্ষেত্রে রোপণ করিতে পারা যায়। রোয়ার বিবরণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। বোরোর বীজ প্রতি বিঘায় ৵৬ ছয় সের হারে পাত দিবার নিয়ম আছে। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ ও পৌষ তিন মাসের মধ্যে সময়ে সময়ে বোরোর বীজ পাত দেওয়া যাইতে পারে। ক্রমে পৌষ মাঘ ও ফাল্গুণ মাসে তাহা রোপণ করা হইয়া থাকে। পৌষের বোরো চৈত্রে, মাঘের বোরো বৈশাখে, ও ফাল্গুণের বোরো জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকিয়া উঠে। প্রদেশ বিশেষে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বোরো রোপণ হইয়া থাকে।

আবাদের নিয়ম।

পঙ্কিল ভূমিতে যখন অল্প পরিমাণে জল থাকে, সেই সময় পাত কোদালের দ্বারা ক্ষেত্র কোপাইতে হয়। অথবা পাঁক অধিক না থাকিলে লাঙ্গলের দ্বারা চষা যাইতেও পারে। সাত আট দিবসের পর কোপানী বা চষা চেঁবা জলের সহিত থাকিয়া উত্তম গজিয়া উঠে। তখন পদতলে চেবা সকল দলিত করিলে ক্ষেত্র কর্দ্দমময় হইয়া যায়। পরে উচ্চ নীচ ঘুচাইয়া হস্তের দ্বারা সমান করিয়া লইতে হয়। বোরোর ক্ষেত্রে মৈ বিদে দেওয়া চলে না। কচিৎ কোন ক্ষেত্র ভিন্ন লাঙ্গলও সর্ব্বত্র বহন করিতে পারা যায় না। বোরোর আবাদ হাতে পায়েই হইয়া থাকে। তাহার প্রধান যন্ত্র পাত-কোদাল। ইহার ফলন অধিক হইলেও পূর্ব্বোক্ত অসুবিধার জন্য কৃষকেরা ইহার আবাদ অধিক পরিমাণে করিতে সক্ষম হয় না।

বিল ও পুষ্করিণী গর্ভ মাত্রই প্রায় ক্রমনিম্ন ভাবে অবস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার উর্দ্ধভাগের মৃত্তিকা কাটিয়া নিম্নদেশে নিক্ষেপ করতঃ সমতল করিতে গেলে উচ্চ স্থানটি কর্দ্দমাভাবে বোরো ধান্যের অনুপযোগী হইয়া উঠে, এবং ব্যয়ভারও কৃষককে অতিরিক্ত পরিমাণে বহন করিতে হয়। তৎ প্রযুক্ত তাদৃশ কার্য্যানুষ্ঠানে বিরত হইয়া ক্ষেত্রের উচ্চ ভাগের সীমান্তরালে, অর্থাৎ ক্রমনিম্ন ক্ষেত্রের উচ্চ ভাগের যেখানে সমোচ্চতার শেষ হয়, তথায় একটি আলি দিয়া কেয়ারি বান্ধিয়া দিতে হয়। কেয়ারি সকলে এরূপ ভাবে আইল প্রস্তুত করিতে হয়, যেন কেয়ারির সমস্ত স্থান এক সমতল হইয়া যায়, এবং আইল ছাপাইয়া এক কেয়ারির জল অন্য কেয়ারিতে যাইতে না পারে। কেয়ারি বান্ধা এক খানি ক্ষেত্রের চিত্রময় প্রতিরূপ নিম্নে প্রদর্শিত হইয়াছে। তবে ক্ষেত্র সকলের ভঙ্গী এক রূপ নহে। অবস্থানুসারে তাহাদের আকৃতির অনেক বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে।
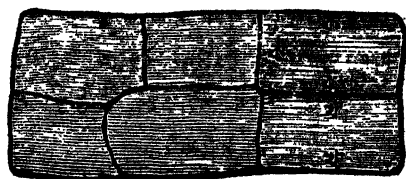
এই ক্ষেত্র আড় গড়ানে। ইহার পূর্ব্ব সীমা হইতে পশ্চিম সীমা প্রায় তিন ফুট নিম্ন। এরূপ ক্ষেত্রে কদাচ জলের স্থায়িত্ব সম্ভবে না। অগত্যা কেয়ারি বন্ধনের দ্বারা ইহার এক এক অংশ ঠিক সমতল করা হইয়াছে।

ক্ষেত্রের পূর্ব্বদিক হইতে, ক, ক, ক, চিহ্নিত স্থান প্রায় সমতল। ঐ সমতলের সীমান্ত ভাগে রেখাবৎ একটি আলি বন্ধন করা হইয়াছে। এবং ঐ রেখার মধ্যস্থান যদিও সমতল, কিন্তু খ, খ, চিহ্নিত স্থান হইতে দক্ষিণ সীমা কিঞ্চিৎ উচ্চ, সুতরাং তথায় আর একটি আলি বান্ধিয়া দেওয়া গিয়াছে। এইরূপে ক্ষেত্রের যে স্থান হইতে যে স্থানে সমোচ্চতার শেষ হইয়াছে, সেই সেই স্থানেই এক একটি আলি দিয়া কেয়ারি বান্ধিয়া দেওয়া হইয়াছে। তদনন্তর হস্ত বুলাইয়া কেয়ারির মধ্যস্থান সমান করা গিয়াছে। এক্ষণে ক্ষেত্রের সর্ব্বত্রই সমভাবে জল অবস্থিত রহিয়াছে।

উপরোক্ত রূপে ক্ষেত্রের পারিপাট্য সাধন করিয়া তদনন্তর ক্ষেত্রে বোরো ধান্য রোপণ করা হয়। কিন্তু গুছি পোতার অষ্টাহ পরে ক্ষেত্রের কর্দ্দম রাশি স্ফীত হইয়া (ফাঁপরাইয়া) উঠে। তাহাতে ধান্যের গুছি লাগার পক্ষে ব্যাঘাৎ জন্মে। অগত্যা ফাঁপরাণ কাদা হাতে নাড়িয়া একবার হাঁটকাইয়া দিতে হয় এবং প্রত্যেক গুছির গোড়া ঐ সঙ্গে আস্তে আস্তে চাপিয়া দিতে হয়; তাহা হইলেই গুছি সকল লাগিয়া ক্রমশঃ তেজ ধরিয়া উঠে। তাহার পর ক্ষেত্রে খড় বহির্গত হইলে, তাহা অধিক না বাড়িতেই শীঘ্র টানিয়া দেওয়া আবশ্যক করে। ক্ষেত্র বিশেষে দুই বারও টানিয়া দিতে হয়।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ক্ষেত্রে জল বদ্ধ হইয়া না থাকিলে কেবল মাত্র কর্দ্দমময় ক্ষেত্রে বোরো ধান্য জন্মে না। ঐ জল দ্বিবিধ উপায়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে পঙ্কিল ভূমিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎসের অস্তিত্ব সম্ভবে, তথায় সেই উৎসোত্থিত জলে ক্ষেত্র সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকিতে পারে। এরূপ ঘটনাস্থলে কৃষকের জল সেচনের ব্যয় বাঁচিয়া যায়। কিন্তু সকল জলাশয়ে উৎস থাকে না, তথায় দ্রোণী বা সেচনীর দ্বারা সেচন করতঃ ক্ষেত্র সর্ব্বদা জলপূর্ণ করিয়া রাখিতে হয়।

বুনানী বোরো।

রোপিত বোরোর বীজ লইয়া জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে আশুধান্যের রীতি ক্রমে অল্প গভীর কুড়ী ক্ষেত্র সকলে বুনানি করা হয়, অথবা আমনের মত রোপণ করাও যাইতে পারে। ঐ উভয় মতেই উত্তম রূপ ধান্য জন্মিয়া থাকে। বুনানি বোরোর আবাদ, আশু বা রোয়া আমন ধান্যের রীত্যনুসারে সুসম্পন্ন করা যাইতে পারে। বীজ প্রতি বিঘায় বুনানিতে ।৬ ষোল সের ও রোয়াতে ৴৪ চারি সের হিসাবে লাগিয়া থাকে। কিন্তু বোরো ধান্যের ক্ষেত্রে কিয়ৎ পরিমাণে জল বদ্ধ থাকা আবশ্যক করে।

কোন কোন প্রদেশের কৃষকেরা কহে, পঙ্কিল ভূমিতে উৎপন্ন রোপিত বোরোর বীজ হইতে পুনর্ব্বার পঙ্কিল ভূমিতে রোয়া ধান্য জন্মে না। এই জন্য পঙ্কিল ভূমিস্থ রোপিত বোরো, যাহা চৈত্র বৈশাখ মাসে উৎপন্ন হয়, তাহার বীজ সংগ্রহ করিয়া জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে উচ্চ প্রদেশস্থ কুড়ী ক্ষেত্রে বুনানী করা আবশ্যক। ঐ কুড়ী ক্ষেত্রের বীজ লইয়া পুনর্ব্বার পঙ্কিল ভূমিতে রোপণ করিতে হয়। কিন্তু এই মত নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল বলিতে হইবে। দেখা গিয়াছে, অনেক স্থলেই পঙ্কিল ভূমির ধান্যবীজ চৈত্র বৈশাখ মাসে সংগ্রহ করিয়া রাখা হয়, এবং কার্ত্তিক মাসে তাহা পাত দিয়া পৌষ মাঘ মাসে পুনর্ব্বার পঙ্কিল ভূমিতেই রোপণ করা হইয়া থাকে। তাহাতে ধান্যোৎপন্নের কিছু মাত্র ব্যতিক্রম ঘটে না।

কোন কোন কৃষক বিবেচনা করেন যে, বোরো ধান্য আদিকালে স্বভাবতঃ পঙ্কিল ভূমিতেই উৎপন্ন হইয়াছিল। উহা পৃথগ্‌ভূত এক জাতীয় ধান্য। কিন্তু বোরোর বীজের অভাব হইলে আশু সুনিকেলে ধান্যের বীজ পাত দিয়া বোরোর রীতিক্রমে তাহা পঙ্কিল ভূমিতে রোপণ করা হইয়া থাকে। তাহাতে বোরো ধান্যের ন্যায়ই ধান্য জন্মাইতে দেখা যায়। এই জন্য অনেকে আবার অনুমান করেন যে উহা আশু ধান্যেরই রূপান্তর মাত্র। এই উভয় মতের প্রকৃত মীমাংসা করা বড় সুকঠিন।

যাহা হউক, এ দেশে যত ভিন্ন ভিন্ন আকারের উর্ব্বরা মৃত্তিকা বিশিষ্ট ক্ষেত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে, পৃথক্ পৃথক্ তত জাতীয় ধান্যও প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। সে স্থলে উৎপাদিকাশক্তিসম্পন্ন পঙ্কিল ভূমি অর্থাৎ

একটী বহ্বায়ত উর্ব্বরা ক্ষেত্রে আদিকালে ধান্যের প্রচার ছিল না, অন্য ক্ষেত্রের ধান্য গিয়া তাহাকে শস্যশালী করিয়াছে, এরূপ বোধ হয় না। আর সমস্ত জাতীয় আশু ধান্য যদি বোরো ধান্যের স্বভাব প্রাপ্ত হইত, তাহা হইলেও বা আশু হইতে বোরোর উৎপত্তি বলা কতকটা সঙ্গত হইতে পারিত। কিন্তু যখন দেখা যায়, কেবল এক মাত্র সুনিকেলে ধান্যই বোরোর আকার ধারণ করে, তখন অবশ্য সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে বোরো ধান্য আদৌ পঙ্কিল ভূমিতে উৎপন্ন হইয়াছিল, পরে উচ্চ ভূমিতে গিয়া স্বভাবের কতকটা পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক সুনিকেলে নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

বোরোর আর একটি আশ্চর্য্য গুণ আছে এই যে, যে সকল বোরো ধান্য চৈত্র মাসে কর্ত্তন করা যায়, তাহার মূল দেশ হইতে গজুরি বহির্গত হইয়া থাকে। তাহাকে "কেচেটী" বলে। কেচেটী ধান্য যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিলে তাহা হইতে বিঘায় দুই মণ আড়াই মণ ধান্য উৎপন্ন হইতে পারে। কেচেটীর অন্য কোন রূপ আবাদ করিতে হয় না।

বোরো ধান্য আশু ধান্যের ন্যায় কাটাই মলাই ও কুলায় উড়াইয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। আবার আমনের মত ঠেঙ্গাইয়া লইলেও চলিতে পারে।

জলি ধান্য।

জলি সুনামপ্রসিদ্ধ স্বতন্ত্র এক জাতীয় ধান্য নহে। ইহা আশু ধান্যেরই রূপান্তর মাত্র। পঙ্কিল ভূমি কিঞ্চিৎ উচ্চ হইলে অপেক্ষাকৃত কঠিন হইয়া উঠে। তাহার এক দিকে জলাশয়, অন্য দিকে উচ্চ ভূমি। উচ্চ ভূমির চোঁয়ানি নামিয়া ঐ সকল ক্ষেত্র প্রায় সর্ব্বদা আর্দ্র থাকে, এবং জলাশয়ের নিকট বলিয়া তথায় উত্তাপেরও অধিক প্রাখর্য্য হয় না। তাদৃশ ক্ষেত্র সকলে ফাল্গুণ চৈত্র মাসে ছোটনা আশু ধান্যের বীজ বপন করিলে, আশু যোরে বাওয়ালি বহির্গত হইয়া থাকে। উহাকে জলি ধান্য বলে। চিরজলার্দ্র মৃত্তিকায় উৎপন্ন হয় বলিয়া, উহার নাম জলি ধান্য হইয়াছে। জলির বীজ প্রতি বিঘায় বার সের হারে পতিত হয়।

জলির আবাদ প্রায় আশু ধান্যেরই তুল্য। প্রভেদের মধ্যে উহাতে বিদে দিবার প্রথা প্রচলিত নাই। কারণ জলি ধান্যের চির-আর্দ্র ক্ষেত্রে বিদে দিবার যথোপযুক্ত যো হয় না। গর যোয়ে বিদে দিলে কোন উপকার দর্শে না। অধিকন্তু কেঁটেল মাটিতে বিদে দিতে হইলে মাটিতে ঝিমুকে ধরিয়া ধান্যের অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। অগত্যা জলির আবাদ কেবলমাত্র লাঙ্গল মৈ ও নিড়ানীর দ্বারা সম্পন্ন করিতে হয়।

চির-জলার্দ্র মৃত্তিকায় সর্ব্বদাই কাঁচলতা দোষ বর্ত্তমান থাকে। কাঁচল মাটিতে লাঙ্গল বহন করিলে মৃত্তিকা উৎকৃষ্ট রূপে পরিচালিত হয় না, এবং দেড়োয় কোপানী করিলে গেলেও, মাটিতে চাপলা ধরিয়া উঠে না। সুতরাং কেঁটেল মৃত্তিকাধিষ্ঠিত ছেড়াট প্রভৃতি কদর্য্য তৃণপুঞ্জ পরিশুষ্ক বা পুত হয় না। এই নিমিত্ত পান্ত কোদালে উহা চাঁচাই করিতে হয়। বন্যা আসিবার পূর্ব্বে আষাঢ় শ্রাবণ মাসেই ক্ষেত্র চাঁচাই করা শ্রেয়স্কর। কখন বা পৌষ মাঘ মাসেও জমি চাঁচাই করা হইয়া থাকে। জলে কাদায় চাঁচাই করিলে সমুদয় তৃণ পচিয়া সারে পরিণত হয়। চাঁচাই করা জমিতে পশ্চাৎ যো ধরিলে লাঙ্গল দ্বারা চারি পাঁচ ঘা চাষ দিলেই মাটি কথক পরিমাণে পরিচালিত হইয়া যায়। তাহাতে জলির বীজ বপন করিলে আশু যোয়ে চারা বহির্গত হইয়া, রস ও উত্তাপের সাহায্যে অতি উৎকৃষ্ট ধান্য জন্মিয়া থাকে।

উচ্চাংশের জলির ক্ষেত্র কখন কখন পরিশুষ্ক হইতেও দেখা যায়। তথায় ধান্য বীজ বপন করিলে কাকড়ি হইয়া থাকে। এক পশলা বৃষ্টি না হইলে, কাকড়ি করা ধান্যে বাওয়ালি বাহির হয় না। বৃষ্টির অভাব হইলে ক্ষেত্রে জল সেচন করিয়া দিতে হয়। ইহার নাম “কাট জলি”।

বোরো ধান্যের রীত্যানুসারে আশু ধান্য পাত দিয়া কোন কোন পঙ্কিল ভূমিতে জলি ধান্য রোপণ করা হইয়া থাকে। তাহাকে বার জলি বলে। বার জলি ধান্য মাঘ মাসের শেষে বা ফাল্‌গুণ মাসের প্রথমে পাত দিয়া ফাল্‌গুণের শেষে বা চৈত্রের প্রথমে রুইতে হয়।

জলি ধান্য জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে পাকিয়া উঠে। জলির পাক নাময়া হইলে প্রায়ই জলনিমগ্ন হইয়া যায়। বাঁধের দ্বারা বন্যা বারি নিবারিত

হইলেও, ভর্ণার জল কিছুতেই নিবারণ হয় না। অতএব জলি যত অগ্রিম বুনিতে বা রুইতে পারা যায়, ততই উৎকৃষ্ট হয়। কিন্তু ইহা বিবেচনা করিতে হইবে যে, বোরোর ন্যায় জলি ধান্য শীত ঋতুতে জন্মে না। জলির পাত বা বুনানি জমির বাওয়ালি বসন্ত ঋতুর বায়ু না পাইলে তেজস্বী হইয়া উঠে না।

ত্বরা আশু।

ত্বরা আশু পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ ধান্যের অন্তর্ভূত নহে। বিশেষ আশু ধান্যের সহিত ইহার কোন সৌসাদৃশ্য নাই। বরং ইহা অনেকাংশে আমনের তুল্য। ত্বরা আশু ও রাঢ়ি আমন দেখিতে প্রায় একরূপ, এবং তাহাদের আবাদের নিয়মও পরস্পর অধিক বিভিন্ন নহে। যে যে ক্ষেত্রে ছোটনা রাঢ়ি আমন জন্মে, সেই সেই ক্ষেত্রে ত্বরা আশু জন্মাইতে পারে।

ইহার বুনানি প্রথা প্রচলিত নাই। কারণ এই যে, ত্বরা আশুতে কাড়ান চাষ খাটে না, এবং বর্ষাকালে কুড়ী ক্ষেত্রে বিদে দিবারও ভাল যো হয় না। এবম্বিধ নানা কারণে বুনানি ক্ষেত্রের ধান্য তাদৃশ তেজস্বী হইয়া উঠে না। অগত্যা বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বীজ পাত দিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের পোনেরই হইতে আষাঢ়ের পোনেরই পর্য্যন্ত এই একমাস কালের মধ্যে ইহা রোপণ করা হইয়া থাকে। পাঁচ সের ধান্যের পাততে এক বিঘা জমি রোপণ হইতে পারে। রোয়ার পদ্ধতি আমন প্রকরণে দ্রষ্টব্য।

ত্বরা আশু প্রধান চারি জাতিতে বিভক্ত; যথা, ত্বরা, মুকো, ঝাটি, নেয়ালি। ইহাদের মধ্যে, ত্বরা ভাদ্র মাসের শেষে, মুকো ও ঝাটি আশ্বিন মাসে, এবং নেয়ালি কার্ত্তিক মাসে সুপক্ক হইয়া উঠে। ইহাদের নাম গৌণ আশু না হইয়া, ত্বরা আশু কেন হইয়াছে বলা যায় না।

দারজিলিং প্রদেশের তরাই অঞ্চলে শ্বেত কৃষ্ণ ভেদে দুই জাতীয় ত্বরা আশু জন্মিয়া থাকে। তত্রত্য অধিবাসীরা তাহাদিগকে ভাদুইয়ে ধান্য বলে।

তন্মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ এক জাতীয় ধান্যের শীষ গর্ভ হইতে বাহির হয় না, গর্ভের মধ্যে থাকিয়াই তাহা সুপক্ক হইয়া উঠে।

পরিশিষ্ট।

যে সকল শ্রেণীজাত ধান্যের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করা হইল, তাহাদের জাতি সংখ্যাই বা কত! আকৃতি ভেদে সহস্র প্রকারেরও অধিক হইবে বলিয়া বোধ হয়। এতদ্দেশীয় কৃষকেরা বলে, পৃথিবীতে হাজার এক জাতীয় ধান্য আছে এবং তাহাদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক নাম আছে। তন্মধ্যে আমরা কয়েক জাতীয় মাত্র ধান্যের নামোল্লেখ করিয়াছি। যাহা হউক, প্রত্যেক প্রদেশের সমুদয় ধান্যের নাম সংগ্রহ করা বড় সহজ কথা নহে, এবং আদি কালে কোন্ প্রদেশের কোন্ ক্ষেত্রে ও কোন্ মৃত্তিকায় কোন ধান্য জন্মিয়াছিল, এক্ষণে বহু অনুসন্ধান করিয়াও তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার কোন উপায় নাই। তবে যে শ্রেণীর ধান্য যে ক্ষেত্রে জন্মাইতে পারে, তাহার স্থূল স্থূল বিবরণ কৃষি তত্ত্বে লেখা হইয়াছে।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, ধান্যের পুষ্পোদ্গম অতি আশ্চর্য্য কাণ্ড। প্রায় সমুদয় উদ্ভিজ্জেরই পুষ্পাভ্যন্তরে বীজ নিহিত থাকে। কোন কোন্ উদ্ভিদের বা বীজকোষের শিরোভাগে পুষ্প দৃষ্ট হয়। কিন্তু ধান্য-পুষ্প সেরূপ গঠনের নহে। গাছের গর্ভ হইতে যখন ধান্যমঞ্জরী বহির্গত হয়, তখন সমুদয় ধান্য দ্বিধা বিভক্ত হইয়া থাকে। তাহার একাংশ কিঞ্চিৎ বড়, অপরাংশ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। উভয় খণ্ডের গর্ভ মধ্যে অতি সূক্ষ্ম একটী পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়। তাহার গর্ভ-কেশর ধান্যের মধ্যে থাকিয়া যায়, এবং পরাগ-কেশরের সূক্ষ্ম সূত্র কয়েক গাছি উভয় খণ্ডের সন্ধিস্থল দিয়া বহির্দ্দেশে ঝুলিয়া পড়ে। পরাগ-কেশরের শিরোভাগে যে রেণু থাকে, তাহা ধান্যের গাত্রে সংলগ্ন হইয়া থাকে। ধান্য মধ্যে গর্ভ-কেশরের অধোভাগে অতি ক্ষুদ্র যে বীজ-কোষ থাকে, কয়েক দিবস পরে তন্মধ্যে দুগ্ধের সঞ্চার হয়, এবং ক্রমে ক্রমে তাহা স্থূল হইয়া খণ্ড দ্বয়ের

অভ্যন্তর ভাগ পরিপূর্ণ করে। তখন উভয় খণ্ড একত্রিত হইয়া, ধান্যের অবয়ব সুসম্পন্ন করে। দুগ্ধটুকু কঠিন হইয়া, পরিণামে চাউলের উৎপত্তি করে। বিশ্বনিয়ন্তার কি আশ্চর্য্য সৃষ্টিকৌশল।

খন্দ বর্গ।

কতকগুলি শস্যের সাধারণ নাম খন্দ। খন্দ সকল প্রধান তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা, তৈল খন্দ, দাইল খন্দ, ও গোধূম। কাহারও কাহারও মতে গোম খন্দ বলিয়া পরিগণিত নহে। ইহার মধ্যে কোন কোন খন্দ আবার রবিখন্দ বা হরিৎখন্দ নামে উক্ত হইয়া থাকে। প্রায় সমস্ত খন্দই, ধান্য-ক্ষেত্রের ধান্য উঠিয়া গেলে, তাহাতেই জন্মিয়া থাকে। আর বর্ষাকালে উপযুক্ত রূপ বৃষ্টির অভাব বশতঃ যে সকল প্রদেশে ধান্য উৎপন্ন হয় না, তত্তৎ প্রদেশস্থ ক্ষেত্র সকলেও খন্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু যে সকল ধান্য-ক্ষেত্র কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে জলনিমগ্ন হইয়া থাকে, তাহাতে খন্দ জন্মে না।

ধান্যোৎপত্তির নিমিত্ত জলের যত প্রয়োজন, খন্দের জন্য তত আবশ্যক হয় না। যত নরম বতরে ধান্য বীজ বপন করা যায় এবং বুনানীর পর যত বেশী বৃষ্টি পায়, বীজ হইতে ধান্যের চারা তত শীঘ্র বাহির হইয়া থাকে। কিন্তু খন্দের বীজ নরম বতরে বুনিলে অথবা বুনানীর পরে অধিক বৃষ্টি হইলে প্রায় পচিয়া যায়, এবং তাহাতে চারা বাহির হয় না। খন্দের মধ্যে কেবল গোম একটু নরম বতরে বুনানী করা যাইতে পারে, তদ্ভিন্ন সমস্ত খন্দ পূর্ণ যোয়ের মাটিতে বুনানী করিতে হয়। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও বৃষ্টি হওয়ার সম্ভব থাকিলে, খন্দের বীজ বপন করিতে নাই।

ধান্যের চারা বাহির হওয়ার পর যে পর্য্যন্ত তাহার গর্ভ হইতে মঞ্জরী বহির্গত না হয়, সে পর্য্যন্ত কেহ বা সরস মৃত্তিকায় কেহ বা অৰ্দ্ধ হস্ত জলের উপর থাকিয়া অনবরত, জলং দেহি জলং দেহি, এই রূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া থাকে। আবার কোন জাতির বা, বার হাত জলের উপর না ভাসিলে, গায়ের আলস্য দূর হয় না। কিন্তু খন্দের প্রকৃতি সেরূপ নহে।

খন্দের চারা বাহির হওয়ার কিছু দিন পরে এক পশালা ও ফুলা মুখে আর এক পশালা বৃষ্টি হইলেই, প্রচুর পরিমাণে শস্য প্রসব করিয়া থাকে। বরং অধিক বৃষ্টি হইলে খন্দের যথেষ্ট অনিষ্ট হইতে দেখা যায়। শিশিরের জলই খন্দের বিশেষ উপকারী।

তৈল খন্দ।

যে সকল উদ্ভিদ্-বীজের নির্য্যাস হইতে তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে, তৎসমুদয়কে তৈল খন্দ বলা যাইতে পারে। তন্মধ্যে তিল, মসিনা, শরিষা, ও রাই প্রধান।

তিল।

প্রকৃতি ও বর্ণভেদে তিল প্রধান চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা, কৃষ্ণ তিল, সাহেব তিল, কার্ত্তিকে তিল, ও কাট তিল। চারি জাতি তিলেরই গাছ, পত্র, পুষ্প, এবং ফলের গঠন ঠিক একরূপ। তিলের গাছ ঊর্দ্ধে দুই তিন হাত উচ্চ হইতে দেখা যায়। ইহা ক্ষুদ্র বৃক্ষবৎ শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট, কিন্তু কাঠিন্যরহিত ও নিতান্ত অসার। তিল গাছের জন্ম মৃত্যু ছয় মাসের মধ্যে সমাধা হইয়া থাকে।

কৃষ্ণ তিল।

গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ তিলের নাম কৃষ্ণ তিল। দশই শ্রাবণ হইতে পঁচিশে শ্রাবণ পর্য্যন্ত কৃষ্ণ তিল বুনানির সের বাত। তদনন্তর দশই ভাদ্র পর্য্যন্ত নামলা বাতে বুনানি হইয়া থাকে।

তিল বুনানির প্রকৃত সময়ে হাঁশীল জমিতে প্রায় ধান্য বুনানি করা থাকে। তজ্জন্য তৃণপূর্ণ পতিত ক্ষেত্রে পচান চাষ দিয়া, তাহাতেই তিল বুনানি করা হয়। প্রকৃতির নিয়মানুসারে তিলও পচান ক্ষেত্রেই অতি উৎকৃষ্ট জন্মে। ইহা অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে পাকিয়া উঠে।

যে সকল ক্ষেত্রের আশু ধান্য শ্রাবণ মাসের শেষে অথবা তেসরা চৌঠা ভাদ্রের মধ্যে কর্ত্তন হয়, তত্তৎ ক্ষেত্রে চাষ দিয়া নাগাইদ্ পোনেরই ভাদ্র

পর্য্যন্ত কৃষ্ণ তিল বুনানি করা যাইতে পারে। কিন্তু লাল ভূমির তিলের অনেক দোষ ঘটে। অনেক সময় উলে লাগিয়া লাল ভূমির তিল মরিয়া যাইতে দেখা যায়। কিন্তু হাশীল পতিত অথবা লাল চিটে মারা ইত্যাদি যে অবস্থার জমিই হউক, উত্তমরূপে পচান চাষ দিয়া, সের বাতে তিল বুনানি করিলে, তাহাতে কোন দোষ সংঘটন হয় না।

তিলের আর একটি আশ্চর্য্য প্রকৃতি এই যে, তিলের ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ পরিমাণে জল বদ্ধ হইলে, তৎক্ষণাৎ সমস্ত গাছ মরিয়া যায়, বিশেষতঃ বন্যার জলের গন্ধ সহ্য করিতে পারে না। সুতরাং শীষেটান সমতল ও ক্রমনিম্ন প্রভৃতি উচ্চ ক্ষেত্র ভিন্ন, বিলান কুড়ো ও দোপ প্রভৃতি নিম্নক্ষেত্রে ইহা জন্মে না। লোণাফোটা ও চুণে মেটেল ব্যতীত সমস্ত মৃত্তিকায় কৃষ্ণ তিল জন্মিয়া থাকে।

তিলের জমিতে অধিক সার দেওয়ার আবশ্যক হয় না। বরং অধিক জোরের মাটিতে তিলের গাছ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে ও তাহাতে ফল না ধরিয়া প্রায়ই ভুল্‌সে পড়িয়া যায়। তিলের বীজ এক বিঘার দশ ছটাক হিসাবে পতিত হয়। চাষ সমাপ্তির পরে জুইবান বীজ বপন করিয়া দুইপালা মৈ দেওয়া আবশ্যক করে। প্রথম চাষ মৈ দিয়া দ্বিতীয় পালায় ঝাপান মৈ দিতে হয়। তিল বুনানির পরে ক্ষেত্রে আর চাষ দিতে নাই। তিলের ক্ষেত্রে থড় বাহির হইলে তাহা নিড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু এদেশে তিলের জমি নিড়ানী করা হয় না, কোন আগাছা থাকিলে তাহা কেবল কাটিয়া দেওয়া হয়।

দশ ছটাক তিলের বীজ এক বিঘা জমিতে বপন করা অল্প পারদর্শিতার কার্য্য নহে! ধান্য বুনানির সময় পূর্ণ মুষ্টি বীজ লইয়া দুই কচে নিঃশেষিত করা যায়। কিন্তু তিলের বীজ এক মুষ্টিতে ধান্যের শিকি পরিমাণ লইয়া তাহা ষোল কচে বুনিতে হয়। তিলের চারা গুলি রোয়া আমনের মত গোট গোট হইয়া না থাকিলে, বহু অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। তিলের চারা অধিক ঘন হইলে, তাহার কথকাংশ উপড়াইয়া ফেলা কর্ত্তব্য।

কিঞ্চিৎ বেগে বায়ু প্রবাহিত হইলে সে সময় তিল বুনানি করা কর্ত্তব্য নহে। তিল অতি পাতলা জিনিষ তাহা অল্প মাত্র বায়ু প্রবাহে একত্রিত

হইয়া একদিকে চাপিয়া পড়ে। সুতরাং চারা সকল চৌরস হয় না। অতএব নির্ব্বাত সময়েই তিলের বীজ বপন করা প্রশস্ত।

দুই এক দিবসের মধ্যে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভব থাকিলে, তিলের বীজ বপন করা উচিত নহে। পূর্ণ যোয়ের মাটীতে তিল বীজ বপন করার পরে, যদি দুই চারি দিন রৌদ্র হইয়া ক্ষেত্রের মাটি উত্তম রূপ পরিশুষ্ক হয়, এবং ঐ পরিশুষ্কাবস্থায় চারা বাহির হইয়া তাহার পর যদি অল্প অল্প বৃষ্টি পায়, তবেই তিলের চারা উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাকেই কৃষকেরা "রীত পাওয়া" বা "বাত পাওয়া" বলে। তিল বুনানি সম্বন্ধে কৃষকেরা বাতের উপর কতদূর নির্ভর করে, তাহা নিম্নলিখিত বচনে প্রকাশ পায়। কৃষকেরা বলে, "চাষ চায় না, বাত চায়, তিলে আধা বর্ষা খায়।" দেখা গিয়াছে, তিলের বীজ বপন মাত্র যদি অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হয়, তবে তিলের চারা প্রায় বহির্গত হয় না। যদি দুই চারিটী গাছ বাহির হয়, তাহারা তেজস্বী না হইয়া নিতান্ত করকটে হইয়া থাকে। এই জন্য কৃষকেরা জল হওয়া সম্ভব কি না, তদ্বিষয়ে আকাশের লক্ষণ সকল পরীক্ষা করিয়া তবে তিল বীজ বপন করে।

তিলের চারা চার পাঁচ পাতা হইলে যদি অধিক বৃষ্টি হইয়া ক্ষেত্রের মাটী অত্যন্ত আঁটীয়া যায়, তবে মাটি আলগা করার জন্য তিলের ক্ষেত্রে দুই এক পালা বিদে দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু অতি সাবধানতা পূর্ব্বক তিলের জমিতে বিদে দিতে হয়। বিদে পরিচালনার সময় বিদে খুব টানিয়া রাখা আবশ্যক। তিলের জমিতে এক পালা বা দুই পালার অধিক বিদে দিতে নাই।

জাগের বিবরণ।

সুপক্ক কৃষ্ণ তিল কাটাই করিয়াই মলাই করা হয় না। তিল কাটার পর খামারে পালা দিয়া, পালার উপর খড় বা পোয়াল বিছাইয়া দিতে হয়। তাহাকে "জাগ দেওয়া" বলে। ক্রমে ভাব ধরিয়া পোনের ষোল দিনের মধ্যে তিলের পাতা সকল পচা পচা মত হইয়া উঠে। তাহাকে "জাগ আসা" বলে। জাগ আসার পরে তিলের পালা ভাঙ্গিয়া, গাছ সকল খামারে

বিছাইয়া রৌদ্রে শুখাইতে হয়। যখন দেখা যায়, গাছ সকল উত্তমরূপে পরিশুষ্ক হইয়াছে, তখন কাঁদালের দ্বারা গাছ সকল ঝাড়িয়া লইলেই তিল বাহির হইতে থাকে। এইরূপ পাঁচ ছয় দিন ঝাড়িয়া লওয়ার পরে অবশিষ্ট ফলের কুঠরীতে যে দুই একটী তিল থাকে, তাহা আর সহজে বাহির হয় না। সেই সময় গোরু জুড়িয়া তিলের ফল-সকল মাড়িয়া লইতে হয়। ঝাড়াই এবং মলাই তিল কুলায় উড়াইয়া তাহার পর চালনে চালিলেই পরিষ্কার হইয়া যায়।

সাহেব তিল।

সাহেব তিল দুগ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ। ইহার সমুদয় প্রকৃতি কৃষ্ণ তিলের তুল্য। উভয় তিলের মধ্যে আবাদেরও কোন ইতর বিশেষ নাই। তবে এইমাত্র বিশেষ যে, ইহা কার্ত্তিক মাসের শেষে বা অগ্রহায়ণ মাসে পাকিয়া উঠে, এবং পাকিবা মাত্রই অগৌণে কাটিয়া লইতে হয়, নতুবা বীজপুর ফাটিয়া সমুদয় তিল বাহির হইয়া পড়ে। সাহেব তিল ভাদ্র মাসে বুনানি করিলে হয় না। ইহা আষাঢ়ের পোনেরই হইতে শ্রাবণের পোনেরই পর্য্যন্ত বুনানি করা যাইতে পারে।

সাহেব তিলে জাগ দিবার আবশ্যক হয় না। ইহা রৌদ্রে শুকাইয়া ঝাড়িয়া ও মাড়িয়া লইলেই তিল প্রাপ্ত হওয়া যায়। কৃষ্ণ তিল হইতে সাহেব তিলের ফলন কিছু কম, কিন্তু গলন বেশী বলিয়া কৃষ্ণ তিল হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চ দরে বিক্রয় হইয়া থাকে।

কার্ত্তিকে তিল।

কার্ত্তিকে তিল শ্বেত কৃষ্ণ দ্বিবিধ বর্ণের দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উভয় বর্ণের তিলই এক গাছে জন্মিয়া থাকে। এমন কি, একটী বীজ কোষের মধ্যে কতক গুলি তিল কৃষ্ণ বর্ণের হইয়া থাকে ও অপর কতকগুলি শ্বেত মূর্ত্তি ধারণ করে। কার্ত্তিকে তিলের মধ্যে আকার ভেদে "পুঁইছে ছড়া" প্রভৃতি আরও কয়েকটী পৃথক পৃথক নাম আছে, কিন্তু তাহাদের প্রকৃতিগত কোন বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না। কার্ত্তিকে তিলের আবাদ

তরুক্ষুদ ইত্যাদি সমুদয় প্রক্রিয়া সাহেব তিলেরই তুল্য, কোন অংশে কিছু মাত্র প্রভেদ নাই।

কাট তিল।

কাট·তিল ঈষদকৃষ্ণ আভাসংযুক্ত পাটল বর্ণ। ইহা মাঘ মাসের শেষে ও ফাল গুণ মাসের প্রথমে বুনানি করিতে হয়। কাট তিল বুনানি করিবার সময় কৃষি ক্ষেত্র সকল প্রায়ই নীরস অবস্থায় থাকে। মাঘ মাসের শেষে যদি বৃষ্টি না হয়, তবে জল সেচনের দ্বারা মাটি ভিজাইয়া কাট তিল বুনানি করা হয়। ইহা জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকিয়া উঠে।

গভীর বিলের রই ভিন্ন এই তিল অন্য সমস্ত ক্ষেতে জন্মাইতে পারে। কিন্তু রোপিত রাঢ়ি আমনের ক্ষেত্রেই ইহা অধিক পরিমাণে বুনানি করিতে দেখা যায়। পার্ব্বত্য প্রদেশে ও পশ্চিম রাঢ়ের চুণে মোটেলে কাট তিল যথেষ্ট জন্মিয়া থাকে। ইহার মৃত্তিকা-ভেদ নাই বলিলেই হয়, কেবল লোণা-ফোটা ও লোণা সেঘাবা মাটিতে ইহা জন্মে না। ইহার অন্যান্য সমুদয় প্রকৃতি কৃষ্ণ তিলের তুল্য। কাট তিলের ক্ষেত্রে দুই বার জল সেচন করিয়া দিতে হয়।

পরিশিষ্ট বিবরণ।

পূর্ব্বোক্ত তিল সমূহের পরম শত্রু আঁচা নামে এক জাতীয় কীট আছে। তাহাকে "শুঞা পোকাও" বলা যায়। তিলের গাছ কিঞ্চিৎ বড় হইলে, আঁচা জন্মিয়া সমুদয় পত্র ও কলিকা ভক্ষণ করিয়া ফেলে। যে তিলের গাছে আঁচা লাগে, তাহাতে পুষ্প ফল কিছুমাত্র সম্ভব হয় না।

আঁচা নিবারণের জন্য কৃষকেরা নানাবিধ তুক করিয়া থাকে। প্রথমে বুনানির সময় একটি নূতন হাড়ীতে বীজ লইয়া তিল বুনানি করে। কৃষকেরা ঐ হাড়ীটি অতি যত্ন সহকারে শূন্যে শূন্যে বাটী আনিয়া, সর্ব্বদা স্পর্শ না হয়, এরূপ কোন শূন্য স্থানে তুলিয়া রাখে। তিলের ক্ষেত্রে আঁচা জন্মিলে, শনি মঙ্গল বারে ঐ পোকা কতকগুলি ধৃত করিয়া আনে এবং সেই হাঁড়ীর মধ্যে পুরিয়া আলে চড়াইয়া দেয়। আঁচা ভাজা হইলে, বাটীর বাহিরে যথা

তথা নিক্ষেপ করিয়া আইসে। কেহ বা আটাশের ঘর পূরণ করিয়া বটপত্রে আলতার দ্বারা লিখিয়া ক্ষেত্রের তিন কোণে ও মধ্যস্থলে পুতিয়া রাখে। কেহ বা মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক শ্বেত শর্ষপ ছড়াইয়া রক্ষা বন্ধন করিয়া দেয়।

যাহা হউক, আঁচা নিবারণের উপায় অতি সহজ। সেদজ আঁচা পোকার ডিম্ব সকল প্রথমে তিল পত্রে অদৃশ্য ভাবে সংলগ্ন হইয়া থাকে। কয়েক দিবস পরে ঐ ডিম্ব সকল ফুটিয়া কীটের উৎপত্তি হয়। তখন অসংখ্য কীট আপনাদের জন্মপত্রোপরি বিজ বিজ করিয়া বেড়ায়। তাহাকে "চাক্" বলে। এক একটী চাকে যত অসংখ্য পরিমাণে কীট থাকে, কিন্তু মোটের উপর চাকের সংখ্যা তত বেশী হয় না। সেই সময় একটি আগুণের হাঁড়ি হস্তে লইয়া, সপত্র চাক সকল ভাঙ্গিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে হয়। এই রূপে অল্প সময়ের মধ্যেই সমুদয় আঁচা ধ্বংশ করিতে পারা যায়। চাকের সংখ্যা অল্প হইলে, এক বিঘা জমীতে তিন চারিটির অধিক মজুর লাগে না। অধিক হইলে, আট দশটি মজুর লাগিয়া থাকে। চাকের সংখ্যানুসারে এক বিঘা জমির আঁচা ভাঙ্গিতে ৷৹ আট আনা হইতে ১৷৹ দেড় টাকা পর্য্যন্ত খরচ হওয়া সম্ভব। কিন্তু ইহার জন্য কৃষকদিগকে নগদ টাকা ব্যয় করিতে হয় না। লাঙ্গলা কৃষাণেরা প্রাতে প্রাতে এই কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

কীটের ক্ষুদ্রাবস্থায় চাক ভাঙ্গা যত সহজ হয়, পরে কিন্তু সেরূপ থাকে না। কীট সকল কিঞ্চিৎ বড় হইলে, আপন জন্মপত্র পরিত্যাগ করিয়া, ক্ষেত্রের অন্যান্য গাছে ব্যাপ্ত হয়। তখন আর তাহাদের কিছুতেই নিবারণ করা যায় না। মাঠের মধ্যে একখানি ক্ষেত্রে কীট জন্মাইলে, মাঠকে মাঠ উচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। এই জন্য মাঠের মধ্যে এক জন কৃষক কেবল আপন ক্ষেত্রের চাক ভাঙ্গিয়া দিলে, ক্ষেত্র নিরাপদ হয় না। পরস্পর সকল কৃষকেই আপন আপন ক্ষেত্রের চাক নির্ম্মূল করিয়া দিলে তবে ক্ষেত্র সকল রক্ষা পায়।

এক বিঘা তিলের জমির আবাদ-খরচ ও উৎপন্ন।—

খরচ।

আট খানি লাঙ্গলে এক বিঘা পতিত জমি তিল বোণার উপযুক্ত পাইট হইতে পারে, তাহার মূল্য	১৷০
বীজ ৷৵০ দশ ছটাক, তাহার মূল্য	৴০
এক বিঘা তিল কাটিতে ৪ জন মজুর লাগে, তাহার মজুরি	৷৶০
বহুনি খরচ	৶১০
ঝাড়াই, মলাই, পরিষ্কার, ইত্যাদি ৪ জন মজুর, তাহার খরচ	৷৶০
লাঙ্গলের জোতালে মজুর ২ জন, তাহার মজুরি	।৴০
খাজানা	৷০
	৩৸১০

উৎপন্ন।

এক বিঘা তিলের তিন শ্রেণীর উৎপন্ন।—

মণ ...	১৲ ...	২৲ ...	৩৲
মূল্য ...	৩৲ ...	৬৲ ...	৯৲
বাদ খরচ ...	৩৸১০ ...	৩৸১০ ...	৩৸১০
	ক্ষতি ৸১০	লাভ ২৶১০	লাভ ৫৶১০

তিল কাটা জমিতে ছয় ঘা চাষ দিলেই জমি লাল হইয়া উঠে, এবং তাহা অল্প ব্যয়ে তিন চারি সন পর্য্যন্ত আবাদ করিতে পারা যায়। এ জন্য প্রথম লোকসান গায়ে লাগে না।

শুকর গুজরী।

এক জাতীয় তৈল খন্দের নাম শুকরগুজরি। ইহা সহসা দেখিলে সোমরাজী বলিয়া ভ্রম জন্মে। ইহার তৈল জলবৎ পাতলা, একটু দুর্গন্ধ, ও আটা বিশিষ্ট, সুতরাং জ্বালানি ভিন্ন অন্য কোন ব্যবহারোপযোগী নহে। এজন্য রাই শর্ষপের সহিত মিশ্রিত করিয়া শুকরগুজরির তৈল ব্যবহার করা যায়। কিন্তু ইহার আটা কিছুতেই বিদূরিত হয় না। ভ্রক্ষণ করিলে; শরীর আটাবিশিষ্ট ও মলিন হইয়া উঠে।

তিলের সহিত ইহার আবাদের কোন পার্থক্য নাই। যে যে জমিতে তিল জন্মে, ইহাও সেই সেই জমিতে জন্মিয়া থাকে। কিন্তু সচরাচর সাল-চিটে জমিতেই ইহা অধিকাংশ স্থলে বুনানি করা হয়।

পঁচিশে শ্রাবণ হইতে ত্রিশে ভাদ্র পর্য্যন্ত শুকরগুজরি বুনানি করা হইয়া থাকে এবং অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে পাকিয়া উঠে। ইহার বীজ প্রতি বিঘায় এক সের হারে পতিত হয়। বীজ বুনানির পরে ক্ষেত্রে চাষ দিতে হয় না, দুই পালা মৈ দিয়া বীজ ঢাকিয়া দিতে হয়। ইহা বুনানির পর আর কোন রূপ আবাদ করিতে হয় না।

গবাদি পশুতে ইহার গাছ ভক্ষণ করে না, এবং ইহার গাছে কোন কীটাদি লাগিতে পারে না, ও ইহা জল স্পর্শেও শীঘ্র মরিয়া যায় না। গাছের গোড়ায় পাঁচ দিন পর্য্যন্ত জল বদ্ধ হইয়া থাকিলেও, বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না, যেমন তাজা গাছ তেমনই থাকে। কিন্তু তদধিক কাল জল বদ্ধ হইয়া থাকিলে, গাছ সকল নিস্তেজ হইয়া ক্রমশঃ শুখাইয়া যায়।

সুপক্ব শুকরগুজরি কাটাই ও মলাই করিয়া উড়াইয়া লইলে পরিষ্কার হইয়া যায়। ইহাতে জাগ দিবার প্রয়োজন হয় না।

এক বিঘা জমির আয় ব্যয়।—

ব্যয়।

লাঙ্গল ছয় খান	...	...	...	১৶০
বীজ ⁄১ এক সের	...	...	...	⁄১০
			নীত	১৶১০

		আনীত ১৶১০
কাটাই খরচ, চারি জন কুলীর কাত	...	।৶০
বহুনি খরচ	...	৶১০
মলাই খরচ ইত্যাদি, দুই জন কুলীর কাত	...	।/০
লাঙ্গলের জোতালে মজুর দুই জনার কাত	...	।/০
		২॥৶০

উৎপন্ন।

এক বিঘার ত্রিবিধ শ্রেণী —

মণ	...	১/	...	২/	...	৩/
মূল্য	...	২॥০	..	৫\	...	৭॥০
বাদ খরচ	...	২॥৶০	...	২॥৶০	...	২॥৶০
	ক্ষতি	৶০	লাভ	২৶০	লাভ	৪৸৶০
পেচান জমি হইলে আর দুই খানি লাঙ্গল লাগিত, তাহার মূল্য		।৶০		।৶০		।৶০
	ক্ষতি	॥০	লাভ	২\	লাভ	৪॥০

মসীনা বা তিসি।

সর্ব্বত্রই মসীনা এক বর্ণের দেখিতে পাওয়া যায়। প্রভেদের মধ্যে পাটনা অঞ্চলের মসীনা কিঞ্চিৎ বৃহৎ হইয়া থাকে। তাহাকে "মোটা দানা" বলে। বঙ্গদেশ-জাত মসিনাকে "সরু-দানা" কহে।

মসীনার গাছ সচরাচর তিন পোয়া পরিমাণে উচ্চ হইয়া থাকে। কিন্তু জোরাল মাটি হইলে, কখন কখন এক হাত পাঁচ পোয়া পর্য্যন্ত গাছ সকল বাড়িয়া উঠে। মসীনা বুনানীর প্রকৃত সময় আশ্বিন মাস। কিন্তু নামলা বাতে পোনেরই কার্ত্তিক পর্য্যন্ত বুনানি হইয়া থাকে। মাঘ মাসের শেষ হইতে আরম্ভ হইয়া ফাল্‌গুণ মাসের মধ্যে ইহা পাকিয়া উঠে। মসীনার বীজ প্রতি বিঘায় পাঁচ সের ও মাটির অবস্থা বিশেষে কোথাও বা ছয় সের হিসাবে পতিত হইয়া থাকে। উৎকৃষ্ট চাষের জমিতে মসীনার বীজ বপন করিয়া কিঞ্চিৎ ছেও লাঙ্গলে এক ঘা চাষ ও দুই পালা মৈ দিতে হয়। নরম বতরে মসীনা বুনিলে গাছ ভাল তেজস্বী হয় না। এজন্য পূর্ণ যোয়ের মাটিতে মসীনার বীজ বপন করা কর্ত্তব্য। পলিপড়া জমিতে মসীনা ছিটান করা হইয়া থাকে। ছিটানে চারি সের বীজেই যথেষ্ট হইতে পারে।

গভীর কুড়ী ও বিলের রই ভিন্ন সমস্ত ক্ষেত্রে, এবং লোণাফোটা ও ভিটা ভূমি ভিন্ন অন্য সমুদয় মৃত্তিকায় মসীনা জন্মাইতে পারে। চারা কিঞ্চিৎ বড় হইলে এক ছাট্ ও গোড়-মুখে আর এক ছাট্ জল ভিন্ন মসীনায় পুনঃ পুনঃ জল চাহে না। ইহা নীহারের জলেই তেজস্বী হইয়া উঠে। কিন্তু গাঢ় কুজ্ঝটিকায় ইহার ফুল প্রায় চু ইয়া যায়। এবং ফাল্‌গুণ মাসের শেষে ও চৈত্র মাসে যখন পশ্চিম দিক হইতে ঝঞ্ঝা বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন যে সকল মসীনায় ফুল ফল ধরে, তাহা প্রায়ই ধুদি পড়িয়া যায়। অধিক নামলা মসীনায় এই অবস্থা ঘটিয়া থাকে; তজ্জন্য পোনেরই কার্ত্তিকের পর আর মসীনা বুনানি করা হয় না।

মসীনা বুনানির পরে নিড়ানী প্রভৃতি অন্য কোন রূপ আবাদ করিবার আবশ্যক হয় না। কিন্তু মসীনা-ক্ষেত্রে দ্রোণ পুষ্প ও সেয়াল কাঁটার গাছ প্রভৃতি আগাছা জন্মাইলে, তাহা নিড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। আর জলের পশালে বেলে বা পলি মাটির ক্ষেত্রের মাটি অধিক আঁটিয়া গেলে, তাহাতে এক পালা বা দুই পালা বিদে দেওয়া যাইতে পারে।

মসীনার ফল খুব সুপক্ক হইলে, তবে কাটাই করিতে হয়। কাটাই মসীনা উত্তম রূপে শুখাইলে মলাই করা গিয়া থাকে। পশ্চাৎ কুলায় উড়াইয়া তাহার পর চালনে চালিয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। চালনে চালা

মসীনা পুনর্ব্বার রাঙ্গিতে না চালিলে চাঁদি হয় না। চাঁদি মসীনা যথেষ্ট উচ্চ দরে বিক্রয় হইয়া থাকে।

মসীনার গাছ কিঞ্চিৎ বড় হইলে, ডগাসকল প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় উত্তরাভিমুখে বড়শীবৎ বক্র হইয়া যায়, আবার প্রাতঃকালে সোজা হইয়া উঠে। ইহার কারণ কি বুঝা যায় না।

মসীনা বুনানির পরে জলের অত্যন্ত অভাব হইলে, কাণকোটারি ও শুঞাশূন্য আঁচা পোকা সদৃশ অপর এক জাতীয় কীট লাগিয়া মসীনার চারা কাটিয়া ফেলে। জল সেচন ভিন্ন তাহা কিছুতেই নিবারণ হয় না। অধিকাংশ লালচিটে মারা জমির মসীনা "উলে" লাগিয়া মরিয়া যায়। সেরূপ ক্ষেত্রে সার ও জল সেচন করিয়া দিলে, উলে লাগিতে পারে না। পাস্তা মাটিতে জল সেচন খাটে না। পাস্তা মাটির উলে লাগা মসীনায় সার ছিটাইয়া বিদে দিতে হয়। বিদের মাটি শুখাইলেই উলে লাগা সারিয়া যায়।

খরচ।

ধানকাটা জমিতে চারি ঘা চাষ দিয়া মসীনা বুনিতে ৪ খানি লাঙ্গল লাগে, তাহার মূল্য	৸০
বীজ ৴৬ সের	॥৴০
কাটাই খরচ, ৪ জন কুলীর মজুরী	॥৴০
মলাই ইত্যাদি, ২ জন কুলী	।৴০
বহনি খরচ	৶১০
খাজানা	॥০
	২৸৶১০
জোতালে কুলী ১ জন	৶১৲
	৩৶০

উৎপন্ন।

মণ	১/০	২/০	৩/০
মূল্য	৩.০	৬॥০	৯৸০
বাদ খরচ	৩৵০	৩৵০	৩৵০
	লাভ ৵০	লাভ ৩৵০	লাভ ৬॥৵০

পচান জমি হইলে
আর চারি খানি
লাঙ্গল বেশী লাগে
তাহার মূল্য ৸০
ও জোতালে মজুর
এক জন ৵১০

একুনে বাদ	৸৵১০	৸৵১০	৸৵১০
	ক্ষতি ৸১০	লাভ ২৷৵১০	লাভ ৫॥৵১০

শরিষা।

শ্বেত ও ধূমল বর্ণ ভেদে শর্ষপ দুই জাতি। শর্ষপের গাছ দুই হস্ত পর্য্যন্ত উচ্চ হইতে দেখা যায়। ইহার বীজ ক্ষুদ্রাকৃতি ও গোলাকার। ধূমল হইতে শ্বেত বর্ণের গাছ কিঞ্চিৎ বৃহৎ এবং বীজপুরও অপেক্ষাকৃত স্থূল হইয়া থাকে। কিন্তু উভয়বিধ শরিষার আবাদ ঠিক একরূপ, কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।

শরিষা বুনানী করিবার উত্তম সময় আশ্বিন মাস। কিন্তু কৃষকেরা কহে, "আশ্বিনের সাত, কার্ত্তিকের সাত; শরিষা বোনার সের বাত।" যাহা হউক, আশ্বিন মাসের প্রথম হইতে শরিষা বুনানি আরম্ভ করা যায়, এবং পৌষ মাঘ মাসে পাকিয়া উঠে। ইহার বীজ প্রতি বিঘায় /১ এক সের হিসাবে ফেলান হয়। চাষ সমাপ্তির পর বীজ ছড়াইয়া দুই পালা মৈ দিতে হয়, পুনর্ব্বার আর চাষ দিবার আবশ্যক করে না। ইহা সচরাচর মুসীনা

ছোলা মুগ ও ভোগা কার্পাষের সহিত এক যোগে এক ক্ষেত্রে বুনানি করা হয়। তাহাকে খেচর বুনানি বলে। সেখানেও চাষের উপর বীজ পতিত হইয়া থাকে। কিন্তু খেচর বুনানিতে ৷৹ দশ ছটাকের অধিক বীজ পড়ে না। তিলের রীত্যনুসারে শরিষার বীজ বুনানি করিতে হয়। পূর্ণ যোয়ের মাটিতে ধুলাবতর ভিন্ন শরিষা বুনানি করিতে নাই।

বিলান ও কুড়ী ভিন্ন সমুদয় ক্ষেত্রে,এবং হেড়মো মোটেল খোষকা মোটেল চুণে মোটেল ঝাঝরাপলি লোণা-সেয়ারা লোণা-কোটা বেলে ফুকর ভিন্ন, অন্যান্য মৃত্তিকায় শরিষা উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ভিটা ভূমিতে যেরূপ উৎকৃষ্ট জন্মে, অন্য কুত্রাপি সেরূপ সম্ভবে না। বিলান ক্ষেত্রের মধ্যে আড়-কান্দিতে শরিষা উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। আর লওয়া চরের মাঠে বালি পলি প্রভৃতি মৃত্তিকা-ভেদ, ও উদ্ভিজ্জাবশেষ সংযুক্ত দোআঁশ মাটি হইলে ক্ষেত্র-ভেদ বিচার করিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আশ্বিন মাস হইতে দশই কার্ত্তিকের মধ্যে যে সকল ক্ষেত্রের উত্তম রূপ "যো" না হয়, তথায় শরিষা বুনানি করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ দশই কার্ত্তিকের পর শরিষা বুনিলে তাহা অত্যন্ত নামলা হইয়া যায়।

অতিরিক্ত নামলা শরিষা প্রায় "জাব" লাগিয়া বিনষ্ট হইয়া যায়। জাব এক জাতীয় অতি ক্ষুদ্র পতঙ্গ বিশেষ। জাব কিছুতেই নিবারণ হয় না। এমন কি, শরিষা চাউলভর হইয়া উঠিয়াছে, সে সময়েও যদি জাব লাগে, তবে আর তাহাতে শস্য জন্মে না।

ফুলা মুখে কাঠ মেঘলা হইলে, শরিষার ফুল বিনষ্ট হইয়া যায়। শরিষাতে কীটাদি যত উৎপাত কাঠ মেঘলাতেই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু নীহারে ইহার যথেষ্ট উপকার হয়। যত বেশী নীহার পড়ে, শরিষার গাছ ততই তেজস্বী হইয়া উঠে এবং হিমের প্রাবল্যে কোন কীটাদি লাগিতে পারে না।

শরিষা বুনানীর পরে আর কোন আবাদ করিতে হয় না। কিন্তু ক্ষেত্রে কোন আগাছা জন্মিলে তাহা তুলিয়া দিতে হয়, এবং জলের পশালে শরিষা ক্ষেত্রের মাটি শিলাইয়া গেলে তাহা আশকা করিবার নিমিত্ত এক খাঁ দুই পালা বিদে দেওয়া যাইতে পারে। শরিষা বুনানির পর এক পশালা ও ফুলা মুখে আর এক পশালা বৃষ্টি পাইলে বিশেষ উপকার দর্শে। শরিষার গাছে

কখন কখন চাক জন্মিয়া থাকে। চাক নিবারণের উপায় তিল-প্রকরণে দ্রষ্টব্য।

সুপক্ক শরিষা কাটাই ও মলাই করিয়া কুলায় উড়াইলেই পরিষ্কার হইয়া যায়।

খরচ।

ধান্য-কাটাই এক বিঘা জমিতে শরিষা বুনানী করিতে চারি খানি লাঙ্গলের আবশ্যক, তাহার মুল্য	৸০
জোতালে কুলী এক জন	৵১০
বীজ ⁄১ এক সের	৶০
তোলাই খরচ, ৪ জন কুলীর কাজ	৷৵০
ঢোলাই খরচ	৵১০
মলাই ও পরিষ্কার ইত্যাদি ২ জন কুলী	৷৴০
খাজানা	৷০
	২৷৶০

শরিষার উৎপন্ন।

মণ	১⁄০	২⁄০	৩⁄০
মূল্য	৩৲	৬	৯৲
বাদ খরচ	২৷৵০	২৷৵০	২৷৵০
	লাভ ৷৶০	লাভ ৩৷৶০	লাভ ৬৷৵০
পচান জমি হইলে আর চারি খানি লাঙ্গল ও এক জন জোতালে বেশী লাগে, তাহার মূল্য বাদ	৸৶১০	৸৵১০	৸১৵০
	ক্ষতি ৷১০	লাভ ২৷৶১০	লাভ ৫৷৶১০

রাই।

রাই অবিকল ধূমল বর্ণ শর্ষপের তুল্য। প্রভেদের মধ্যে, শর্ষপের গাত্রে একটি নাভি চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, রাইয়ের গাত্রে কোন কলঙ্ক নিরীক্ষিত হয় না, এবং শরিষায় যে পরিমাণ তৈল প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহাতে সেরূপ পাওয়া যায় না।

ইহার গাছ পত্র পুষ্প এবং বীজপুর শরিষা অপেক্ষা কিছু চিকণ ও লম্বাকৃতি হইয়া থাকে। শর্ষপের সহিত রাইয়ের আবাদের কোন প্রভেদ নাই।

সমস্ত ক্ষেত্রে, ও লোণাসেয়ারা লোণা ফোটা ভিন্ন সমস্ত মৃত্তিকায় রাই জন্মিয়া থাকে, বিশেষতঃ বিলান ক্ষেত্রে ও লওয়া চরের মাঠে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়। মসীনা, গোম, যব, ছোলা, মটর, মশুর, কলাই, প্রভৃতি সমস্ত রবি শস্যের সহিত রাই বুনানি করিতে পারা যায়। পলি পড়া মাটিতে রাই ছিটান হইতে পারে, এবং নদীগর্ভেও ইহা ছিটান করা যায়। উচ্চ ভুমিতে আশ্বিন কার্ত্তিক এবং বিলান ক্ষেত্রে ও নদীগর্ভে দশই অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত ছিটান করা চলে। রাই ফাল্গুণ চৈত্র মাসে পাকিয়া উঠে।

শর্ষপে যে যে উৎপাত ঘটে, রাইয়েও প্রায় তৎসমুদয় ঘটিয়া থাকে। সুপক্ক রাই কাটাই মলাই ও কুলায় উড়াইয়া পরিষ্কার করা হয়। পাকা রাইয়ের গাছ একটু কাঁচা থাকিতে তুলিতে হয়। রাইয়ের গাছ শুথাইয়া ঝাঁঝিয়া গেলে, দানা নিতান্ত মন্দা হইয়া থাকে। এই জন্য কৃষকেরা বলে, "রাই পাকলে ছাই।" রাইয়ের গাছ একটু পাতলা থাকা আবশ্যক। ইহার বীজ প্রতি বিঘায় ॥৴০ দশ ছটাক হিসাবে পতিত হয়। চাষের উপর বীজ ফেলাইয়া দুই পালা মৈ দিতে হয়। রাই প্রায় পৃথক রূপে বুনানি করা হয় না, অন্যান্য শস্যের সহিত এক যোগে এক ক্ষেত্রে বুনানি হইয়া থাকে। তবে পৃথক রূপে বুনিলে যেরূপ আয় ব্যয় হওয়া সম্ভব, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ব্যয়।

লাঙ্গল চারি খানা, মূল্য	...	...	...	৸০
জোতালে মজুর ১ জন	...	...	...	৶১০
বীজ ৷৶০ ছটাক	...	...	...	⁄০
তোলাই মজুর ৪ জন		...	..	৷৶০
বহুনি খরচ	...	...	...	৶১০
মলাই খরচ, ২ জন কুলী	...	...	...	।⁄০
খাজানা	...	...	...	৷০
				২৷⁄০

উৎপন্ন।

মণ	১⁄	২⁄	৩⁄
মূল্য	২৸০	৫৷০	৮'০
বাদ খরচ	২৷⁄০	২৷⁄০	২৷⁄০
	লাভ ✓০	লাভ ২৸✓০	লাভ ৫৷✓০
ছিটান রাইয়ে লাঙ্গল চারি খানি ও মজুর বাদ যায়	৸৶১০	৸৶১০	৸৶১০
	লাভ ১⁄১০	লাভ ৩৸⁄১০	লাভ ৩৷⁄১০
পচান জমি হইলে আট খানি লাঙ্গল লাগে তাহার মূল্য, ও জোতালে কুলী দুই জন, তাহার মূল্য ।⁄০ আনা, একুনে বাদ	১৸⁄০	১৸⁄০	১৸⁄০
	ক্ষতি ৷✓১০	লাভ ২✓১০	লাভ ৪৸১০

অরহড়।

অরহড়ের গাছ ক্ষুদ্র বৃক্ষবৎ। ইহা চারি পাঁচ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হইতে দেখা যায়। ইহার কাণ্ড শাখা প্রশাখা সকল নিতান্ত অসার ও ভঙ্গপ্রবণ। অরহড়ের পুষ্প হরিদাক্ত কুব্জাকার এবং ইহার ফল শীমধর্ম্মিক। লম্বাকৃতি এক একটী বীজপুরের মধ্যে পাঁচ ছয়টি পর্য্যন্ত অরহড় থাকে। অরহড় পাটল ও কৃষ্ণবর্ণ ভেদে দুই জাতি; এবং প্রত্যেক জাতি প্রধান দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা, মাঘি ও চৈতালি। উভয় জাতির ও উভয় শ্রেণীর অরহড় এক ক্ষেত্রে ও এক মৃত্তিকায় উৎপন্ন হয় এবং আবাদেরও কোন বিভিন্নতা নাই।

বিলান ও কুড়ী ভিন্ন, সমতল শীষেটান ও ক্রমনিম্ন ক্ষেত্রে, এবং লোণা-ফোটা ভিন্ন অন্য মৃত্তিকায় অরহড় জন্মিয়া থাকে। অরহড়ের যে ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ মাত্রও জল বদ্ধ হইবার সম্ভাবনা, তথায় ইহা বুনানি করিতে নাই। অরহড় প্রায় পৃথক রূপে বুনানি করা হয় না। লালচিটে মাবা জমি যে বৎসর ধান্যের সময় পতিত ফেলাইয়া রাখা হয়, তাহারই পূর্ব্ব বৎসর ধান্য বুনানির সময় আশু ধান্যের সহিত এক যোগে এক ক্ষেত্রে অরহড় বুনানি করা হইয়া থাকে। আবার অনেক সময় চেটো জমিতে ধান্য বুনানি না করিয়া, "তেপেখে কলাই" ও অরহড় এক সঙ্গে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে বুনানি করা হয়।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের পাঁচই পর্য্যন্ত অরহড় বুনানি হইয়া থাকে এবং তাহা মাঘ ফাল্গুণ ও চৈত্র মাসে পাকিয়া উঠে। অরহড়ের বীজ প্রতি বিঘায় /১ এক সের হিসাবে পড়িয়া থাকে, এবং তাহা এক বানেই বুনানি শেষ হয়। অরহড়ের বীজ অত্যন্ত মোটা, সুতরাং /১ এক সের বীজে দুই বান কুলায় না। অরহড়ের বীজ চাষের নীচে বা উপরে ফেলাইলে কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু ধান্য-ক্ষেত্রে শেষ বিদে দিবার সময় ইহার বীজ ছিটাইয়া দুই পালা বিদে দেওয়া হয়।

কখন কখন পলি মাটি সংযুক্ত পতিত ক্ষেত্রেও দোয়ার তেয়ার চাষ দিয়া অরহড় বুনানি করা হয়।

অরহড় সুপক্ক হইলে, গাছ কাটিয়া বৃহৎ বৃহৎ পরিমাণে বোঝা বান্ধিতে হয়। সেই সকল বোঝা উদ্ধমুখ করিয়া গায়ে গায়ে সাজাইয়া রাখা হয়; তাহাকে "মাদি" দেওয়া বলে। দশ বার দিনের মধ্যে মাদির আইরি পরিশুষ্ক হইয়া উঠে। তখন মাদি ভাঙ্গিয়া দুই তিনটি গাছ একত্রে ধরিয়া মৃত্তিকায় আঘাত করিলেই গাছ হইতে ফল সকল পৃথক হইয়া পড়ে। গুলুম যাহা বাহির হয়, তাহা উলটাইয়া লইতে হয়। অবশিষ্ট ফল ঢেঙ্গাইয়া কুলায় উড়াইলে অরহড় পরিষ্কার হইয়া যায়।

আর এক জাতীয় অরহড় আছে, তাহাকে "টুমুর" বলে। টুমুর দেখিতে পূর্ব্বোক্ত পাটলবর্ণ অরহড়ের তুল্য। টুমুরের গাছ একবার জন্মিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকে এবং তাহাতে বর্ষে বর্ষে ফলোৎপন্ন হয়। ইহার বীজপুর অপেক্ষাকৃত চেপ্‌টা, এবং তাহা সীমের ন্যায় আস্ত রাখিয়া অন্যান্য তরকারীর সহিত পাক করা হইয়া থাকে। পরিশুষ্ক টুমুরে অরহড় নির্ব্বিশেষে দাইল প্রস্তুত হইতে পারে।

আর এক জাতীয় লতা অরহড় আছে। তাহা উদ্যান মধ্যেই প্রায় লাগান গিয়া থাকে। লতা অরহড় মাচা বা বাতারের গায়ে বেষ্টিত হইয়া থাকিতে দেখা যায়।

খরচ।

লাঙ্গল ২ খান	...	...	...	।৶০
বীজ /১ এক সের	...	...	...	৴১৫
কাটাই খরচ, চারি জন মজুরের মজুরি		...	...	॥৶০
মলাই খরচ, দুই জন মজুরের মূল্য		...	...	।৴০
ঢোলাই খরচ	...	...	...	৶১০
খাজানা	...	...	...	॥০
				২৫

উৎপন্ন।

মণ	১/০	২/০	৩/০
মূল্য	১॥০	৩৲	৪॥০
বাদ খরচ	২৻৫	২৻৫	২৻৫
	ক্ষতি ॥৫	লাভ ৸৶১৫	লাভ ২৷৶১৫
ধান্যের সহিত এক যোগে হইলে পৃথক রূপে লাঙ্গল লাগে না, অতএব লাঙ্গলের খরচ কম পড়িয়া থাকে, তাহা বাদ	।৶০	।৶০	।৶০
	ক্ষতি ৶৫	লাভ ১৷/১৫	লাভ ২৸/১৫

ছোলা বা বুট।

শ্বেত ও লোহিত বর্ণ ভেদে ছোলা দুই জাতি। তন্মধ্যে লোহিতবর্ণ কেবল মাত্র "ছোলা" শব্দে উক্ত হইয়া থাকে। শ্বেতবর্ণকে "কাবরি ছোলা" বলে। উভয় জাতীয় ছোলার মধ্যে বর্ণ-ভেদ ব্যতীত আবাদ প্রভৃতি অন্য কোন বিষয়ে কিছু মাত্র ইতর বিশেষ নাই।

ছোলার গাছ তিন পোয়া এক হস্ত পর্য্যন্ত উচ্চ হইতে দেখা যায়। আশ্বিন মাসের পোনেরই হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্রহায়ণের পোনে-রই পর্য্যন্ত ছোলা বুনানি করা চলে। ছোলার বীজ বিঘা প্রতি /৭॥০ সাড়ে সাত হারে পড়িয়া থাকে। চাষের মাটিতে বীজ বুনানির পর এক ঘা চাস ও দুই পালা মৈ দেওয়া আবশ্যক করে। অল্প চাষের মাটি হইলে, বীজ ফেলার পর দোয়ার চাসও দেওয়া যাইতে পারে। ফাল্গুণ মাসের শেষ হইতে চৈত্র মাসের প্রথমেই ইহা পাকিয়া উঠে।

ছোলার ক্ষেত্র ভেদ নাই। উপযুক্ত সময়ে যে কোন ক্ষেত্রে ছোলা বুনানি করা যায়, তাহাতেই ছোলা জন্মিয়া থাকে। অনুমানে বোধ হয়, মেটেল মাটিই ছোলার আদি জন্মভূমি হইবে। যদিও তথা হইতে এক্ষণে সকল মাটিতে ইহা ব্যাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু বালি পলি লোণা-সেয়ারা লোণা-ফোটা ভিটা ভূমি ইত্যাদি কয়েক জাতীয় মৃত্তিকায় ছোলা খুব উৎকৃষ্ট হয় না। পূর্ব্বোক্ত মৃত্তিকা সকলের মধ্যে লোণা-সেয়ারা লোণা-ফোটা ভিন্ন অপরাপর মৃত্তিকায় যদি কিয়দংশ মাত্র মেটেলের যোগ থাকে, তাহা হইলেই ছোলা জন্মাইতে পারে। যাহা হউক, মেটেল মাটিতেই ছোলা উৎকৃষ্ট জন্মে, এবং বানচড়া ক্ষেত্র হইলে আরও ভাল হয়।

ছোলার চারা পাঁচ ছয় অঙ্গুলি উচ্চ হইয়া উঠিলে, এ দেশের লোকেরা শাক খাইবার জন্য তাহার ডগা ভাঙ্গিয়া লয়। কিন্তু ডগা ভাঙ্গায় ছোলার অনিষ্ট না হইয়া বরং একটু ইষ্টই হইয়া থাকে। ডগা ভাঙ্গিয়া দিলে ছোলার গাছ উত্তম ঝাড়াইয়া উঠে। কিন্তু পোনেরই পৌষের পর আর ডগা ভাঙ্গা কর্ত্তব্য নহে।

ছোলার ক্ষেত্রে যে কয়েকটি বিঘ্ন আছে, তন্মধ্যে কড়া পোকা ও নাট প্রধান। কড়া পোকায় ছোলার মূল ভক্ষণ করিয়া থাকে। মূলে আঘাৎ লাগিলেই গাছ সকল মরিতে আরম্ভ করে। জল সেচন ব্যতীত কড়া পোকা অন্য কোন উপায়ে নিবারণ করা যায় না।

নাট। দক্ষিণ বায়ুর সহিত ছোলার অত্যন্ত অপ্রিয় সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। ছোলার ফল চাউলভর হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময়েও যদি উপর্য্যুপরি চারি পাঁচ দিন ক্রমান্বয়ে দক্ষিণ বায়ু প্রবাহিত হয়, তবে ছোলার গাছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লম্বাকৃতি এক জাতীয় কীট জন্মিয়া সমুদয় ফল ভক্ষণ করিয়া ফেলে। ইহাকে 'নাট লাগা' বলে। ছোলার ক্ষেত্রে নাট লাগিলে, কৃষককে হাভাত করিয়া রাখিয়া যায়। এমন সর্ব্বনেশে রোগ আর নাই। ঐ সময় আবার পশ্চিম বায়ু প্রবাহিত হইলে নাট কিছু কম পড়ে; কিন্তু একেবারে তাহা নিঃশেষিতরূপে নিবারিত হয় না।

পশ্চিম বায়ুর সহিত ছোলার সৌহার্দ্য দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ফুলা মুখে কিছু দিন ধরিয়া পশ্চিম বায়ু প্রবাহিত হইলে ছোলার

গাছের প্রত্যেক পত্রের সন্ধিস্থলে ফুল ফল ধরিয়া থাকে এবং দানা বিলক্ষণ পুষ্ট হইয়া উঠে।

কোন কোন বৎসরে কিছু ব্যতিক্রম ঘটিলেও অধিকাংশ বৎসরেই দেখা যায়, এদেশে মাঘ মাসের শেষ হইতে আরম্ভ করিয়া ফাল্গুণের কথক দিন পর্য্যন্ত পশ্চিম বায়ু প্রবাহিত হইয়া তাহার পরেই দক্ষিণ দিক হইতে বায়ু বহিতে থাকে। আশ্বিনের পোনেরই হইতে কার্ত্তিক মাসের পোনেরই পর্য্যন্ত যে সকল ছোলা বুনানি হয়, মাঘ মাসের মধ্যেই তাহাদের ফুল ফল ধরিয়া থাকে। সুতরাং ফুলা মুখে প্রায়ই তাহাদের পশ্চিমে বায়ুর সহিত সাক্ষাৎ হয়। আর কার্ত্তিকের পোনেরই হইতে অগ্রহায়ণের পোনেরই পর্য্যন্ত যাহা বুনানি হইয়া থাকে, মাঘ মাসের শেষ হইতে ফাল্গুণ মাসের আধাআধি ভিন্ন তাহাদের ফুল ফল ধরে না। কিন্তু অধিকাংশ বৎসরেই ঐ সময়ে দক্ষিণ বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে। এই জন্য অতিরিক্ত নামি ছোলায় প্রায় নাট লাগিয়া যায়। অতএব ছোলা যত অগ্রিম বুনানি হয়, ততই ভাল হয়।

সুপক্ক ছোলা কাটাই করিয়া খামারে উত্তম রূপে শুখাইতে হয়। তাহার পর মাড়িয়া কুলায় করিয়া উড়াইলেই ছোলা পরিষ্কার হইয়া যায়। ছোলার মাড়ন অতি প্রত্যুষে হয় না, কারণ ছোলার গাছ তখন নরম হইয়া থাকে। এক প্রহর বেলার পরে ছোলায় মাড়ন জুড়িতে হয়।

ছোলার আয় ব্যয়ের হিসাব।—

খরচ।

এক বিঘা লাল জমিতে ছোলা বুনিতে চারি খান লাঙ্গল লাগে, তাহার মূল্য		...	৸৹
জোতালে মজুর এক জন	...	...	৴১০
বীজ ৴৭॥ সাড়ে সাত সের	...	...	।৴১০
কাটাই খরচ, চারি জন মজুর	...	...	৷৵৹
		মোট	১৸৴৹

				আনীত ১৸৶০
বহনি খরচ	...	...	...	৶১০
মলাই খরচ, তিন জন মজুর	...	...	...	।৶১০
খাজানা	...	...	...	৷০
				৩৲

উৎপন্ন।

মণ	২/০	৪/০	৮/০
মূল্য	৩৲	৬৲	১২৲
বাদ খরচ	৩৲	৩৲	৩৲
	লাভ ০	লাভ ৩৲	লাভ ৯৲
পচান জমি হইলে আর চারি খানি লাঙ্গলের আবশ্যক হয়, তাহার মূল্য ৸০ ও জোতালে মজুর ১ জন ৶১০, একুনে বাদ	৸৶১০	৸৶১০	৸৶১০
	ক্ষতি ৸/১০	লাভ ২/১০	লাভ ৮/১০

কলাই।

কলাইয়ের গাছ এক প্রকার ক্ষুদ্র লতা বিশেষ। ইহার পত্র প্রশস্ত, পুষ্প পীত বর্ণ ও কুব্জাকার। ফল সীম-ধর্ম্মিক, লম্বাকৃতি, চিকণ, ও গোলাকার। অবান্তর-ভেদে কলাই নানা জাতিতে বিভক্ত; যথা, আশু কলাই, তেপেখে কলাই, মাস কলাই, কালী কলাই, ভূঙ্গি কলাই, কুরুৎ কলাই, ইত্যাদি।

কলাইয়ের জমিতে অধিক চাষ লাগে না। পতিত ভূমিতে কিঞ্চিৎ নরম বত্তরে বীজ ছড়াইয়া ক্ষেত্র-বিশেষে এক চাষ বা দোয়ার চাষ দিয়া, দুই পালা মৈ দিয়া রাখিতে হয়। লাল জমি হইলে পূর্ণ যোয়ের মাটিতে বীজ ফেলাইয়া, এক চাষ দিলেই হইতে পারে। কলাই বুনানির পর আর কোন রূপ আবাদ করিতে হয় না। সুপক্ক কলাই উত্তোলন করিয়া শুখাইলে মলাই করিতে হয়। তাহা কুলায় করিয়া উড়াইলেই পরিষ্কার হইয়া যায়।

কেশে, কুশ, ও উলার পাড়ন থাকা জমিতে কলাই তত ভাল হয় না। দূর্ব্বা-সংযুক্ত জমিতেই কলাই উত্তম রূপ জন্মে।

আশু কলাই।

অন্যান্য কলাই অপেক্ষা আশু কলাইয়ের গাছ কিছু লম্বাকৃতি হয়। ইহা জ্যৈষ্ঠ মাসে বুনানি হইয়া থাকে ও ভাদ্র মাসের মধ্যেই পাকিয়া উঠে। কুড়ী, কোল কুড়ী, ও বিলান ক্ষেত্র ভিন্ন ইহা অন্যান্য সমুদয় ক্ষেত্রে জন্মাইতে পারে। ইহার মৃত্তিকা-ভেদ নাই। কেবল লোণা-ফোটা ও লোণা-সেয়ারা মাটিতে ইহা জন্মে না। তবে মোটেল অপেক্ষা পলিতে কিছু ভাল হয়, বিশেষতঃ ভিটা ভূমিতে অতি উত্তম রূপ জন্মিয়া থাকে। আশু কলাইয়ের বীজ প্রতি বিঘায় ॥৵৹ দশ ছটাক হিসাবে পতিত হয়। যে ক্ষেত্রে বন্যার জল উঠে, তথায় আশু কলাই হয় না।

তেপেখে কলাই।

তেপেখে কলাইয়ের গাছ আশু কলাই হইতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, কিন্তু মাস কলাই হইতে অনেক বড়। ইহা জ্যৈষ্ঠ মাসের বিশে হইতে আষাঢ় মাসের বিশে পর্য্যন্ত বুনানি করা গিয়া থাকে, এবং আশ্বিন মাসের শেষ হইতে কার্ত্তিক মাসের মধ্যে সুপক্ক হইয়া উঠে। ইহার বীজ প্রতি বিঘায় ৴১। পাঁচ পোয়া হিসাবে ফেলাইতে হয়।

বিলান কুড়ী ও কোল কুড়ী এবং যে সকল ক্ষেত্রে বন্যার জল হয়, সেই সকল ক্ষেত্র ভিন্ন অন্যান্য ক্ষেত্রে, এবং চুণে মোটেল খোষকা

মেটেল হেড়মা মেটেল ও লোণা-ফোটা ব্যতীত অন্য সমস্ত মৃত্তিকায় ইহা জন্মিয়া থাকে। ভোগা কার্পাসের জমিতে, এবং যে সকল লালচিটা জমিতে আশু ধান্য বুনানি করা হয় না, সেই সকল জমিতে অরহড় ও তেপেখে কলাই এক সঙ্গে বুনানি করা হয়। কিন্তু লালচিটা জমিতে ⁄৩ তিন পোয়া বীজ হইলেই যথেষ্ট হয়। কেবল শস্ক-পতিত জমিতেই পাঁচ পোয়া বীজ লাগিয়া থাকে। পলি ও দো-আঁশ ভিন্ন বিশুদ্ধ মেটেল মাটির পতিত ক্ষেত্রে তেপেখে বুনানি করা কর্ত্তব্য নহে।

মাস বা ব্রীহি কলাই।

মাস কলাইয়ের দানা অপেক্ষাকৃত পুষ্ট ও ঈষৎ হরিদ্বর্ণ। ইহার গাছ পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ কলাই হইতেই কিঞ্চিৎ ছোট হইয়া থাকে। অন্যান্য সমুদয় কলাই হইতে ইহাই উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ। মাস কলাই বুনানি করিবার প্রকৃত সময় আশ্বিন মাস। কার্ত্তিক মাসে ইহা বুনানি করিলে প্রায় ফুল চুঁয়ে যায়। ইহার ক্ষেত্র-ভেদ বিচার করিবার তত আবশ্যক হয় না, কারণ আশ্বিন মাসে যে কোন ক্ষেত্রে জল না থাকে, তথায় ইহা বুনানি করা চলে।

নদী-গর্ভে ও চরের মাঠে ইহা উৎকৃষ্ট রূপ জন্মে। দেয়ার ভূমিই ইহার জন্মস্থান বলিয়া বোধ হয়। বন্যা-প্লাবিত পললময় ক্ষেত্রে ইহা ছিটান করা হইয়া থাকে। কিন্তু উচ্চ ভূমিতে চাষ বুনানি করিতে হয়। মাস কলাই পললময় ক্ষেত্রে ছিটানে যেরূপ হয়, অন্যত্র চাষ বুনানিতেও সেরূপ হয় না। কি উচ্চ ভূমিতে, কি পললময় ক্ষেত্রে, অন্যান্য তৃণ-বহুল ক্ষেত্র অপেক্ষা দুর্ব্বা-সমাকীর্ণ ক্ষেত্রেই কিছু ভাল হয়।

সকল প্রকার মেটেল, লোণা-ফোটা, লোণা-সেয়ারা, ও বেলে ফুকর ভিন্ন অন্য সমুদয় মৃত্তিকায় ইহা জন্মিয়া থাকে। ইহার বীজ প্রতি বিঘায় ⁄৫ পাঁচ সের হিসাবে পতিত হয়। ব্রীহি পৌষ মাঘ মাসে পাকিয়া উঠে।

কালী কলাই।

সকল প্রদেশেই প্রায় তেপেখে কলাইকে লোকে কালী কলাই বলিয়া থাকে, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। হরিদ্বর্ণ মাস কলাইয়ের সহিত কৃষ্ণবর্ণ

ক্ষুদ্র দানা বিশিষ্ট এক প্রকার কলাই থাকে, তাহাকে লোকে "মুগো কলাই" বলে। কিন্তু ঐ মুগো কলাইকেই কোন কোন প্রদেশের কৃষকেরা কালী কলাই বলিয়া থাকে। যাহা হউক, মাস কলাইয়ের সহিত কালী কলাইয়ের চাষ আবাদের কোন প্রভেদ নাই। উভয় কলাই এক যোগে এক ক্ষেত্রে উৎপন্ন হয়।

আয় ব্যয়।

খরচ।

লাঙ্গল ২ খানার মূল্য	।৶০
বীজ	/০
কাটাই খরচ	॥৶০
ঢোলাই খরচ	৶১০
মলাই খরচ	।/০
খাজানা	॥০
	২৲১০

উৎপন্ন।

মণ	১।০	২॥০	৫/০
মূল্য	২৲	৩৸০	৭॥০
বাদ খরচ	২৲১০	২৲১০	২৲১০
	ক্ষতি ৲১০	লাভ ১।৶১০	লাভ ৫।৶১০

মাস কলাই বীজ /৫ সের,
তাহার মূল্য ।/০,
তন্মধ্যে এক আনা

বাদে বাকি বাদ	।০	।০	।৫
	ক্ষতি ।১০	লাভ ১।৶১০	লাভ ৫৶১০

চরের মাঠে লাঙ্গল লাগে না, ছিটান করা হয়, কিন্তু খাজানা স্থান-বিশেষে কোথাও ১।০ পাঁচ শিকা কোথাও বা ২ দুই টাকা লাগিয়া থাকে।

ভারঙ্গি বা ভূঙ্গি কলাই।

ভূঙ্গি কলাই দেখিতে প্রায় কালী কলাইয়ের তুল্য। কিন্তু তাঁহা অপেক্ষা ইহা অনেক ক্ষুদ্র, এবং ইহার দানা পুষ্টল নহে। ইহা মনুষ্যের এক প্রকার অখাদ্য বলিলেও হয়। তবে নিঃস্ব কৃষকেরা ইহার দাইল প্রস্তুত করিয়া খাইয়া থাকে। ভূঙ্গি জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে বুনানি করা হয়, কার্ত্তিক মাসে পাকিয়া উঠে। আচট জমিতে বীজ ফেলাইয়া এক ঘা চাষ ও এক পালা মৈ দিয়া রাখা হয়। ইহা গবাদি পশুগণের আহারের নিমিত্ত বুনানি করা হইয়া থাকে। কুড়ী ও বিলান ভিন্ন অন্যান্য সমুদয় ক্ষেত্রে ইহা জন্মাইতে পারে। ইহার মৃত্তিকা-ভেদ নাই। এক বিঘা জমি বুনানি করিতে, লাঙ্গল ও বীজে ।০ চারি আনা, খাজানা ॥০ আট আনা, একুনে ৸০ বার আনা খরচ হয়। ঘাষকর দুই টাকা আড়াই টাকায় বিক্রয় হইয়া থাকে। পাকাইয়া তুলিলে বিশেষ লাভ নাই। ভূষিতে গোরুর খোরাকের সংস্থান হয় মাত্র।

মুগ।

মুগের গাছ পত্র পুষ্প ও বীজপুর প্রায় কলাইয়ের তুল্য। কিন্তু কলাই হইতে দানা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, এবং বর্ণ আঘ্রাণ আস্বাদন ও গুণের অনেক বিভিন্নতা আছে। যে সকল ক্ষেত্রে ও মৃত্তিকায় মাস কলাই জন্মে সেই সকল ক্ষেত্রে ও মৃত্তিকায় মুগ জন্মিয়া থাকে। অধিকন্তু মুগ ভিটা ভূমিতে জন্মে। মুগের জমি নিতান্ত আচট না হইয়া একটু লালছিটা হইলেই ভাল হয়। কলাইয়ের ন্যায় মুগ অধিক জঙ্গলে হয় না। মুগ সমস্ত আশ্বিন মাস হইতে দশই কার্ত্তিক পর্য্যন্ত বুনানি করা যায়। মুগের বীজ বিঘায় /২॥০ আড়াই সের হারে পড়িয়া থাকে। লাল ভূমিতে রাই শরিষার সহিত মুগ এক যোগে বুনিতে পারা যায়। মুগের চাষ আবাদ মাস কলাইয়ের সহিত নির্ব্বিশেষ,

রূপে হইয়া থাকে। সুতরাং আর কোন কথা পৃথক করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই। মুগ আকৃতি-ভেদে প্রধান চারি জাতিতে বিভক্ত; যথা, সোণা মুগ, হাড়ি মুগ, ঘোড়ামুগ, ও কাল মুগ।

খরচ।

লাঙ্গল ২ খান	...	...	...	...	।৵০
বীজ /২॥ সের	...	...	...	...	৶০
কাটাই খরচ, ৪ জন কুলী		...	...	...	॥৵০
ঢোলাই খরচ	...	...	...	...	৵১০
মলাই খরচ	...	...	...	...	।/০
খাজানা	...	...	...	...	॥০
					২৵১০

উৎপন্ন।

সোণা মুগ প্রভৃতি।

মণ	॥০	১/০	২/০
মূল্য	১॥০	৩৲	৬৲
খরচ	২৵১০	২৵১০	২৵১০
	ক্ষতি ॥৵১০	লাভ ৸/১০	লাভ ৩৸/১০

উৎপন্ন।

কাল মুগ।

মণ	॥০	১/০	২/০
মূল্য	১৲	২৲	৪৲
খরচ	২৵১০	২৵১০	২৵১০
	ক্ষতি ১৵১০	ক্ষতি ৵১০	লাভ ১৸/৵০

মটর

শ্বেত ও হরিৎ বর্ণ ভেদে মটর দুই জাতি। শ্বেতবর্ণ মটর দেখিতে অতি সুন্দর, তাহাকে শ্বেতী বা কাবরি মটর বলা যায়। হরিদ্বর্ণ মটরের গাত্রে বিন্দু বিন্দু কৃষ্ণবর্ণ কলঙ্ক দৃষ্ট হয়, তজ্জন্য তাহাকে কাল মটর বলে। উভয় জাতীয় মটরই গোলাকার ও মসৃণ। মটরের বীজপুর লম্বাকৃতি; তাহাকে "সুটি" বলে। মটর-সুটির তরকারি খাইতে অতি উপাদেয়।

আশ্বিন ও কার্ত্তিক ক্রমান্বয়ে এই দুই মাস ইহা বুনানি করা যাইতে পারে। বিলান ক্ষেত্র সকলে কখন কখন পৌষেরই অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত বুনানি হইয়া থাকে। মটরের বীজ প্রতি বিঘায় ৴৭॥• সাড়ে সাত সের হিসাবে পতিত হয়। বীজ বুনানির পর এক ঘা চাষ ও এক পালা মৈ দিয়া রাখিতে হয়।

বিলের রস ভিন্ন অন্য সমস্ত ক্ষেত্রে, এবং লোণাফোটা লোণা-সেয়ারা ভিন্ন অন্য সমুদয় মৃত্তিকায় মটর জন্মাইতে পারে। মটর উচ্চ ভূমিতে বুনিতে হইলে লাল জমিতে তিন চারি ঘা চাষ দিয়া উত্তমরূপে পাইট করিয়া বুনিতে হয়; তথাপি জল সেচন ভিন্ন মটর ভাল হয় না। কিন্তু বন্যা-প্লাবিত পললময় বিলান ক্ষেত্রে উভয় মটর ছিটান করিলেই যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। জল সেচনের সুবিধা নাই বলিয়া এ দেশের কৃষকদিগকে একমাত্র বিলান ক্ষেত্র ভিন্ন অন্য ক্ষেত্র চতুষ্টয়ে মটরের আবাদ করিতে প্রায় দেখা যায় না। শ্বেতী মটরের সুটি বিক্রয়ে লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু পল্লীগ্রামে মটর-সুটী বিক্রয় হয় না।

বিলান ক্ষেত্রে ধান্য বর্ত্তমান থাকিতে থাকিতেই রাই ও মটর একত্রে ছিটান করা হইয়া থাকে। পরে ধান্য কাটিয়া লইলে মাটি যত শুকাইতে থাকে, রাই ও মটরের গাছ তত তেজস্বী হইয়া উঠে।

সুটি তৈয়ারীর জন্য উদ্যান মধ্যে শ্বেতী মটর লাগান গি া থাকে। উদ্যান মধ্যে যে স্থানে কোন আওতা থাকে না, সেই স্থানের মৃত্তিকা প্রথমতঃ উত্তমরূপে কোদলাইতে হয়। তাহার পর সার দিয়া ঢেলাসকল উত্তমরূপে গুড়া করতঃ তিন পোয়া অন্তরে শ্রেণীবদ্ধ রূপে মটরের খুপী দিতে হয়। খুপীর

নিকটে বাঁশের চটার আবরি বুনাইয়া দিলেই মটরের গাছ তাহার গায়ে ক্রমে লতাইয়া উঠিতে থাকে। এই মটরের গোড়ায়, প্রত্যহ না হউক, মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিয়া দিতে হয়।

এ দেশের অনেক মটরের ক্ষেত্র গোরুকে খাওয়ানর জন্য ঘাবকর বিক্রয় হইয়া থাকে। মটর পাকাইয়া তোলা অপেক্ষা ঘাবকর বিক্রয়ে যথেষ্ট লাভ আছে। এক বিঘা মটর ঘাবকর তিন টাকা হইতে পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া থাকে।

মটর ফাল্গুণ মাসে পাকিয়া উঠে। মটর হাতে টানিয়া উপড়াইয়া লইলেও হইতে পারে। পরে তাহা শুখাইয়া মলাই করতঃ কুলায় করিয়া উড়াইলেই পরিষ্কার হইয়া যায়।

মটরের ভূষি গোরুর পুষ্টিকর খাদ্য।

এক বিঘা মটর ছিটাইতে এক জন কুলীর দরকার হয় না, এক জন কুলীতে এক দিনমানে এক খাদা মটর ছিটাইতে পারে।

খরচ।

বীজ /৭॥ সাড়ে সাত সের	...	।১০
খাজানা	... ...	॥০
ছিটান খরচ	... ...	৴১০
		৸৴০
বুনানী লাঙ্গল ২ খানা মূল্য	...	।৶০
তোলাই খরচা ৪ জন কুলী	... ...	॥৶০
ঢোলাই খরচ	... ...	৶১০
মলাই খরচ	.. ..	।৴০
		১৷৶১০
		২।১০

উৎপন্ন।

যবকর বিক্রয়	২৲	৩৲	৪৲
বাদ খরচ	৸৵০	৸৵০	৸৵০
	লাভ ১৶০	লাভ ২৶০	লাভ ৩৶০
বুনানি মটর হইলে লাঙ্গলের দাম বাদ	।৵০	।৵০	।৵০
	লাভ ৸৵০	লাভ ১৸৵০	লাভ ২৸৵০

মটর উৎপন্ন।

মণ	১৷০	২৷০	৩৷০
মূল্য	১।০	২॥০	৩৸০
ভুঁষির মূল্য	।০	৸০	১৲
	১৸০	৩।০	৪৸০
বাদ খরচ	২।১০	২।১০	২।১০
	ক্ষতি ।১০	লাভ ৸৶১০	লাভ ২।৶১০

মশুরী।

মশুরি প্রায় সর্ব্বত্রই এক জাতীয় দেখিতে পাওয়া যায়। প্রভেদের মধ্যে পাটনা অঞ্চলের মশুরি কিছু বৃহদ্দানা হইয়া থাকে। মশুরির গাছ প্রায় ছোলারই তুল্য, কিন্তু তদপেক্ষা ক্ষুদ্র। ইহার বীজ চেপ্টা ও গোলাকার।

কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ এই দুই মাস ইহা বুনানি করা চলে, এবং ফাল্গুণ মাসের মধ্যে পাকিয়া উঠে। মশুরির বীজ প্রতি বিঘায় সাড়ে সাত সের হিসাবে

পতিত হইয়া থাকে। বীজ বুনানির পরে এক চাষ ও দুই পালা মৈ দিতে হয়। মশুরির জমিতে অধিক চাষ দিবার আবশ্যক হয় না। লাল জমিতে দোয়ার ও পতিত জমিতে তেয়ার চাষেই ইহা বুনানি হইতে পারে। পলল-ময় ক্ষেত্রে মশুরি ছিটান করা গিয়া থাকে।

মশুরি বিলান ক্ষেত্রেই উত্তম জন্মে। তথায় লোণা-সেয়ারা ও লোণা-ফোটা ভিন্ন সকল মাটিতেই মশুরি উৎপন্ন হইয়া থাকে। উচ্চ ক্ষেত্রেও মশুরি বুনানি করিতে দেখা যায়, কিন্তু উচ্চ ক্ষেত্রে রসপলি মাটি ভিন্ন অন্য মৃত্তিকায় জন্মে না। তবে জল সেচন করিয়া দিলে সকল মাটিতেই হইতে পারে।

মশুরি কুজ্ঝটিকার জলে বিলক্ষণ তেজস্বী হইয়া উঠে। এমন কি, যে বৎসর ভাল কুজ্ঝটিকা না হয়, সে বৎসর মশুরি ভাল হয় না।

সুপক্ক মশুরি উপড়াইয়া খামারে শুখাইতে হয়। তাহার পর মাড়িয়া কুলায় করিয়া উড়াইলে পরিষ্কার হইয়া যায়।

মশুরির আয় ব্যয়।

খরচ।

এক বিঘা পতিত জমিতে মশুরি বুনিতে দুই খানি কি তিন খানি লাঙ্গল লাগে, তাহার মূল্য	॥/০
বীজ /৭॥ সাড়ে সাত সের	I১০
তোলাই খরচ, চারি জন কুলী	॥৶০
বহনী খরচ	৶১০
মলাই খরচ, ২ জন কুলী	I/০
খাজানা	॥০
	২।৶০

উৎপন্ন।

মণ	১॥০	২॥০	৫৴০
মূল্য	১৸৵০	৩৵০	৬।০
ভুসি	॥০	৸০	১৲
	২।৵০	৩৸৵০	৭।০
বাদ খরচ	২।৶০	২।৶০	২।৶০
	ক্ষতি ৴০	লাভ ১।৶০	লাভ ৪৸৴০

খেসারি বা তেওড়া।

খেসারির গাছ সচরাচর দেড় হাত হইতে দুই হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হইতে দেখা যায়। কাল মটরের সহিত খেসারির পুষ্প ও ফলের অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে। আশ্বিন মাসের বিশে হইতে সমস্ত কার্ত্তিক মাস ও অগ্রহায়ণের দশই পর্য্যন্ত ইহা বুনানি করা হইয়া থাকে, এবং ফাল্‌গুণ মাসের শেষ ও চৈত্র মাসের প্রথমেই পাকিয়া উঠে। খেসারির বীজ প্রতি বিঘায় ৴৫ পাঁচ সের হিসাবে পতিত হয়। ইহা সচরাচর ছিটানই হইয়া থাকে। চাষ বুনানি করিতে তত দেখা যায় না। কিন্তু চাষ বুনানি করিতে এক ঘা চাষের পর বীজ ফেলাইয়া আর এক ঘা চাষ ও দুই পালা মৈ দিতে হয়।

হৈমন্তিক ধান্য পাকা পর্য্যন্ত যে সকল কুড়ী ও বিলান ক্ষেত্রের যো থাকা অসম্ভব, সেই সকল ক্ষেত্রে খেসারি ছিটান করা গিয়া থাকে। ইহা পতিত ভূমিতে কখন কখন চাস বুনানিও করা হয়। ইহা উচ্চ ক্ষেত্রে প্রায় জন্মে না। তবে রসপলি মাটি হইলে উচ্চ ক্ষেত্রেও উৎপন্ন হইতে পারে। কুড়ি ও বিলান ক্ষেত্রে ইহার মৃত্তিকা-ভেদ নাই। ঐ সকল ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ কাদা থাকিতে থাকিতে খেসারি ছিটান করিতে হয়। জল মরিয়া গেলে এরূপ কাদায় খেসারি ছিটাইতে হয় যেন খেসারির বীজ পতিত মাত্র কাদায় ডুবিয়া যায়।

খরচ

এক বিঘা খেসারির ছিটান খরচ ...	৫১০	
বীজ ⁄৫ পাঁচ সের	৶০	
খাজানা	৷০	
		৷৶১০
তোলাই খরচ ৪ জন কুলী ...	৷৵০	
বহনি খরচ	৵১০	
মলাই খরচ	।⁄০	
		১⁄১০
		১৸⁄০

১⁄ বিঘার হ্বাব কর বিক্রয়।

টাকা	২৲	৩৲	৪৲
বাদ খরচ	৷৶১০	৷৶১০	৷৶১০
	লাভ ১।১০	লাভ ২।১০	লাভ ৩।১০

উৎপন্ন।

মণ	১⁄	২⁄	৩⁄
মূল্য	১৲	২৲	৩৲
ভুষির মূল্য	৷০	৸০	১৲
	১৷০	২৸০	৪৲
বাদ খরচ	১৸⁄০	১৸⁄০	১৸⁄০
	ক্ষতি ।⁄০	লাভ ৸৶০	লাভ ২৶০

গোধূম বা গোম।

রবিখন্দের সহিত এক সময়ে হয় বলিয়া, গোম খন্দ-শ্রেণীতে পরিগণিত। কিন্তু খন্দের গাছের সহিত গোধূমের গাছের কোন সৌসাদৃশ্য নাই। গোমের গাছ অনেকাংশে ধান্যের তুল্য।

আশ্বিন মাসে বুনানি করিলে গোম ভাল হয় না। কার্ত্তিক মাসের সাত দিন বাদ দেওয়া হয়। তাহার পর আটই কার্ত্তিক হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত অগ্রহায়ণ মাস ও বিলান ক্ষেত্রে সকলে পৌষের দশই পর্য্যন্ত গোম বুনানি করা হয়। কিন্তু পৌষ মাসে বুনানি করা গোমের দানা হৃষ্টপুষ্ট না হইয়া নিতান্ত মরা হইয়া থাকে। তাহাকে "ঝিম দানা" বলে। ঝিমদানা গোমে ময়দা কম হয়।

গোম চৈত্র মাসের মধ্যে পাকিয়া উঠে। ফাল্গুণ মাসে শিলা-বৃষ্টি হইলে গোম নষ্ট হইয়া যায়। গোমের বীজ প্রতি বিঘায় ।২॥ সাড়ে বার সের হিসাবে পড়িয়া থাকে। কোন কোন কৃষককে ।৫ পোনের সের পর্য্যন্ত বপন করিতে দেখা যায়। গোমের বীজ ছড়াইয়া এক চাষ অথবা দোয়ার চাষ দিলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু মৈ দুই পালা দিতে হয়। গোম একটু নরম যোয়ে বুনানি করা উচিত।

অল্প চাষের জমিতে গোম ভাল হয় না। কৃষকেরা কহে, "গোমের জমিতে বার মাসে বার ঘা, একা ভাদরে বার ঘা চাষ দিলে তবে গোম ভাল হয়।" বার মেসে চাষের জমিতে অনেক চাষ দেওয়া হয় বটে, কিন্তু উচ্চ ভূমির ধান্য কাটাই করা লাল ভূমিতে পাঁচ ছয় ঘা চাষেই গোম বুনানি করা হইয়া থাকে। আর বিলান ক্ষেত্রে তিন চারি ঘা চাষেই গোম বুনানি করা চলে।

গোমের গাছের শিকড় খুব অল্প হয়, এ জন্য উপরের বীজের গাছ বড় হইলে বাতাসে প্রায় উপড়াইয়া পড়ে। আরও দেখা যায়, গোমের বীজ আলগা থাকিলে অঙ্কুরিত হইবার সময় বীজ ঊর্দ্ধভাবে একটু চাগিয়া উঠে। অতএব গোমের বীজ তিন চারি অঙ্গুলি মাটির ভিতরে থাকিলেই উত্তম হয়।

গোমের ক্ষেত্র-ভেদ নাই। কূর্ম্মপৃষ্ঠ হইতে বিলান পর্য্যন্ত সমুদয় ক্ষেত্র, এবং লোণা-ফোটা লোণা-সেয়ারা ঝাঁঝড়া-পলি বেলে-ফুকর কাকবেলে ব্যতীত অন্য সমস্ত মৃত্তিকায় গোম জন্মিয়া থাকে। কিন্তু উচ্চ ক্ষেত্রে গোম বুনিতে হইলে দুই বার সেচন দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক করে। জল-সেচন ভিন্ন উচ্চ ভূমিতে গোম জন্মে না বলিলেই হয়। কিন্তু রসপলিতে সেচন দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। বিলান ক্ষেত্রের গোমেও সেচন চায়, তবে তাহা না দিলেও গোম অল্প পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। গোমের জমিতে চারা সকল অর্দ্ধহস্ত পরিমাণ বাড়িয়া উঠিলে একবার ও ফুলা মুখে আর এক বার সেচন দেওয়া আবশ্যক করে।

গোম প্রায় লাল ভূমিতেই বুনানি করা হইয়া থাকে। আবশ্যক মত পচান জমিতেও বুনানি করিতে পারা যায়। প্রথমে পতিত ভূমিতে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে চাষ আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ চসিয়া ক্ষেত্র তৃণ-শূন্য করিতে হয়। তাহার পর ভাদ্র মাসে ঐ ক্ষেত্রে চারি পাঁচ ঘা চাষ দেওয়া আবশ্যক। পুনর্ব্বার আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে আর চারি ঘা চাষ দিয়া তাহার পর বুনানির সময় দোয়ার চাষ দিয়া গোম বুনানি করিতে হয়। পচান জমিতে অন্যূন বার ঘা চাষ দিয়া গোম বুনানি করা কর্ত্তব্য।

উচ্চ ভূমিতে লাল কিম্বা পচান যে কোন ক্ষেত্রে গোম বুনানি করা হউক, তাহাতে ভাদ্র মাসে চাষ না দিলে গোমের গাছ ভাল তেজস্বী হয় না। কিন্তু কুড়ী ও বিলান ক্ষেত্রে ভাদ্র মাসে চাষ দিতে পারা যায় না। এক-মাত্র জল প্লাবন হেতু ঐ অকর্ষিত দোষ খণ্ডন হইয়া যায়।

গোমে দুই বার ভিন্ন পুনঃ পুনঃ জল চাহে না। পুনঃ পুনঃ জল হইয়া গোমের জমির মাটি সর্ব্বদা আর্দ্র থাকিলে, গোমে হলদে ধরিয়া যায়। বিশেষতঃ ফুলাইবার পূর্ব্বে গোমের চোঙ্গের ভিতর জল প্রবেশ করিলে শীষে প্রায় দানা হয় না।

অনাবৃষ্টিতেও গোমে হলদে ধরিয়া থাকে। গোমের পক্ষে হলদে বড় ভয়ঙ্কর রোগ। উহা এক প্রকার ক্ষুদ্র কীট-বিশেষ। ঐ কীটে গোমের গাছের সমস্ত রস চোষণ করিয়া খায়। তজ্জন্য গাছ নিস্তেজ হইয়া পড়ে। হলদে ধরা গাছে গোম ভাল হয় না। গোমে আর এক

রোগ জন্মে, তাহা হল্‌দে ধরা অপেক্ষাও অনিষ্টকারক। গোমের শীষ বাহির হইবার সময় শীষটি কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়। তাহাকে "কালিয়ে যাওয়া" বলে। কালান শীষে গোমের চিহ্ন মাত্র থাকে না, কেবল কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ গুড়া গুড়া পদার্থে শীষটী মণ্ডিত হইয়া থাকে, আঙ্গুলের টোকা দিলে তাহা উড়িয়া যায়। কিন্তু এ রোগের সংখ্যা খুব কম।

বর্ণভেদে গোম চারি জাতিতে বিভক্ত; যথা, দুধে, গঙ্গাজলি, জামালি, ও খেড়ী।

দুধে। দুধে গোম শ্বেতবর্ণ ও পুষ্টদানা-বিশিষ্ট। চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট গোম। ইহার ময়দা খুব সাদা ধপ্‌ধপে ও সুকোমল হয়। দুধে গোমের ময়দা যেমন সুন্দর, খাইতেও তেমনই সুখাদ্য। ইহার রুটী অতি পরিষ্কার ও কোমল হইয়া থাকে। দোষের মধ্যে গোমের গায়ের খোসা অপেক্ষাকৃত পুরু, এই জন্য চোকল বেশী ও ময়দা কম হয়। সুতরাং গরীব কৃষকের পক্ষে এই গোম ঘরে খাওয়ায় যথেষ্ট ক্ষতি হয়। কিন্তু ইহা বিক্রয়ে বিলক্ষণ সুবিধা দৃষ্ট হয়। জামালি ও খেড়ি গোম হইতে ইহা ৵০ দুই আনা অধিক মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। দুধে গোম বিনা জল-সেচনে সকল ক্ষেত্রে ও সকল মৃত্তিকায় জন্মে না। বিলান ক্ষেত্রের চাতালেই ইহার আবাদ করা প্রশস্ত। তথায় ইহা অতি সুচারুরূপে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। ইহার শীষ মোটা, শুঙ্গো কৃষ্ণবর্ণ।

গঙ্গাজলি। গঙ্গাজলি গোম প্রায় দুধে গোমেরই তুল্য। সহসা উভয় জাতীয় গোম পৃথক্ রূপে অনেকে চিনিয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু যাহাদের বিশেষ জানা আছে, তাহারা দেখিবা মাত্র বলিতে পারে, কে দুধে, কে গঙ্গাজলি। কারণ দুধে গোম ধপ্‌ধপে সাদা; গঙ্গাজলিতে ঈষৎ লাল আভা আছে। তজ্জন্য ইহাকে আলতাপাটি গোমও বলে। একমাত্র লাল আভা ভিন্ন উভয় জাতীয় গোমের ফলন, ময়দার ফলন, আকৃতি, এবং আস্বাদনে কোন প্রভেদ নাই। গঙ্গাজলি গোমের গাছ ধূসর বর্ণ, শুঙ্গো প্রায় কৃষ্ণবর্ণই বটে, কিন্তু তাহাতেও ঈষৎ লালের আভা দৃষ্ট হয়। গঙ্গাজলি দুধের সমমূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে।

জামালি। ইহার দানা দুধে গঙ্গাজলি হইতে অনেক ছোট ও কঠিন এবং সুমলিন পাটল বর্ণ। ইহার গাছ অপেক্ষাকৃত কষ্টসহ, শীষ ও শুঙ্গো সাদা হয়। জামালি গোমের খোষা পাতলা, এজন্য চোকল কম ও ময়দার ফলন খুব বেশী হইয়া থাকে। ময়দার রং সাদা বটে, কিন্তু রুটির রং একটু আঙ্গারে হয়। তাহা খাইতে কিঞ্চিৎ কড়া বোধ হয়, অথচ বিস্বাদ নহে। দুধে গোমের রুটির ন্যায় ইহাতেও বেশ মিষ্ট রস আছে। যে সে ক্ষেত্রে ও মৃত্তিকায় ইহা জন্মিয়া থাকে এবং ময়দার ফলন অধিক হয় বলিয়া কৃষকেরা এই গোমই বেশী বুনানি করে। দুধে হইতে ইহার মূল্য দুই আনা কম হয়।

খেড়ি। দুধে গোমের সহিত গঙ্গাজলির যেমন অধিক ইতর বিশেষ নাই, জামালির সহিত খেড়িরও সেই রূপ অধিক প্রভেদ লক্ষিত হয় না। খেড়ি। উৎপন্ন, কষ্ট-সহিষ্ণুতা, গোমের ফলন, ময়দার ফলন, বর্ণ, আস্বাদন, সমস্তই প্রায় জামালির তুল্য। প্রভেদের মধ্যে, জামালির দানা বেটে ও গোল, খেড়ির দানা একটু লম্বা ও চিকণ। জামালি ও খেড়ি এক দরে বিক্রয় হয়।

সুপক্ক গোম কাটাই করিয়া আটি বান্ধিতে হয়। তাহা শুখাইবার জন্য খামারে উর্দ্ধ মুখ করিয়া মাদি দেওয়া হইয়া থাকে। গোম উত্তম রূপে শুখাইলে তবে মলাই করা হয়। মলাই করা গোম কুলায় করিয়া উড়াইলে পরিষ্কার হইয়া যায়।

প্রাতে বা সায়াহ্নে অর্থাৎ নরম সময়ে গোম মলাই করিবার সুবিধা হয় না। মধ্যাহ্ন সময়ে প্রখর রৌদ্রোত্তাপে গোমের মাড়ন যুড়িতে হয়। নরম সময়ে মলাই করিলে গোমের গাছ ও শীষ ভাঙ্গে না, দোমারি হইয়া যায়।

এক বিঘা গোমের আয় ব্যয়।

খরচ।

বিলান জমিতে চারি খানা লাঙ্গল লাগে, তাহার মূল্য	৮৵৹
জোতালে মজুর এক জন	৶১০
নীত	৮৶১০

আনীত	৸৶১০
বীজ ।২॥ সাড়ে বার সের	৸৶০
কাটাই খরচ, ৪ জন কুলী	॥৵০
বহনি খরচ, এক জন কুলী না হয় গাড়ী ...	৶১০
মলাই খরচ, ৪ জন কুলী	॥৵০
খাজানা (১)	॥০
	৩৸০

উৎপন্ন।

মণ	২॥০	৫/০	১০/০
মূল্য	৫/	১০৲	২০৲
ভুষির মূল্য	।০	॥০	১৲
	৫।০	১০॥০	২১৲
বাদ খরচ	৩৸০	৩৸০	৩৸০
	লাভ ১॥০	লাভ ৬৸০	লাভ ১৭।০
বাদ সেচন খরচ দুই বারে(২)	০	০	৪৲
	লাভ ১॥০	লাভ ৬৸০	লাভ ১৩।০

উচ্চ ভূমিতে চারি খানি
লাঙ্গল ও এক জন

(১) নদীয়া জেলায় ধানের জমিতে গোম উৎপন্ন হয়, এই জন্য খাজানা অধিক লাগে না। কিন্তু অপরাপর স্থানে ও পশ্চিম অঞ্চলে গোমের জমির খাজানা অনেক বেশী লাগিয়া থাকে।

(২) গোমে জল সেচন করিয়া দিলে আড়াই মণ বা পাঁচ মণ গোম না হইয়া বিঘায় সাত মণ হইতে দশ মণ পর্য্যন্ত গোম হইয়া থাকে। তজ্জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ফসলে সেচন খরচ বাদ দেওয়া হয় নাই।

জোতালে মজুর লাগে			
তাহার খরচ বাদ	৸৶১০	৸৶১০	৸৶১০
	লাভ ॥/১০	লাভ৫৸/১০	লাভ ১২।/১০
পচান জমি হইলে আরও চারি খানি বেশী লাঙ্গল ও এক জন জোতালে লাগিয়া থাকে, তাহার মূল্য বাদ	৸৶১০	৸৶১০	৸৶১০
	ক্ষতি ।/০	লাভ ৪৸৵০	লাভ ১১।৵০

যব।

যবের গাছের আকৃতি প্রকৃতি ও উৎপত্তি সম্বন্ধে গোমের সহিত কিছু মাত্র ইতর বিশেষ নাই। প্রভেদের মধ্যে, মলাইয়ের সময় গোমের গাত্রাবরণ স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে, যবের আকার সেরূপ হয় না। ধান্যের ন্যায় যব পড়োর মধ্যে থাকিয়া যায়। যবের গায়ে যে বাকলা থাকে, তাহা সহজে ছাড়ান যায় না।

কার্ত্তিক মাসের দশই হইতে সমস্ত অগ্রহায়ণ মাস যব বুনানি করিতে পারা যায়। যব ফাল্‌গুণ মাসে পাকিয়া উঠে। ইহার বীজ বিঘায় ।২ বার সের হারে পড়িয়া থাকে। বীজ বুনানির পর এক ঘা চাষ দিয়া দুই পালা মৈ দিতে হয়।

বিলঘাটে ছোলা ও মশুরীর জমিতে দুই চারি সের যবের বীজ ছিটাইয়া দিলে তাহাতে ছোলা মশুরীর কোন হানি হয় না, অথচ কিয়ৎ পরিমাণে যব প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যবের আয় ব্যয়।

খরচ।

এক বিঘা জমিতে লাঙ্গল ৪ খান	...	...	...	৸৹
জোতালে	...	...	...	৶১৹
বীজ ৷২ বার সের	...	...	...	৷১৫
কাটাই খরচ	...	...	...	‖৶৹
বহুনি খরচ	...	...	...	৶১৹
মলাই খরচ	...	...	...	৷৴৹
খাজানা	...	...	...	‖৹
				২৸১৫

উৎপন্ন।

মণ	৩৴৹	৫৴৹	৮৴৹
মুল্য	৩৲	৫৲	৮৲
বাদ খরচ	২৸১৫	২৸১৫	২৸১৫
	লাভ ৶৫	লাভ ২৶৫	লাভ ৫৶৫
ভুষি	৷৹	৷৶৹	৸৹
	৷৶৫	২‖৴৫	৫৸৶৫

মকো বা ভুট্টা।

ভুট্টার গাছ চারি পাঁচ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হয়। ইহার গর্ত্ত হইতে একটি শীষ বহির্গত হয়, তাহাতে কোন শস্য থাকে না। ভুট্টার গাছের গাত্রে পত্রাভ্যন্তর হইতে এক একটি মোচা বাহির হয়; তাহাকে কান্দি বলে। কান্দির চতুষ্পার্শ্বে ভুট্টার দানা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া থাকে। শ্বেত লোহিত বর্ণভেদে ভুট্টা দুই জাতি। উভয় জাতিরই প্রকৃতি ঠিক একরূপ। পার্ব্বত্য প্রদেশের অসভ্য জাতিরা অতি আদরের সহিত ভুট্টার আবাদ করিয়া থাকে। এ দেশের কৃষকেরা ভুট্টার চাষ করে না। তবে কেহ কেহ উদ্যান মধ্যে বা

বাড়ীতে দুই চারিটা গাছ রোপণ করে মাত্র। চৈত্র বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ এই তিন মাস ইহা বুনানি করা হয় এবং শ্রাবণ ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে পাকিয়া উঠে। ইহার বীজ বিঘায় ⁄৫ পাঁচ সের হারে পতিত হয়। চাষের জমিতে বীজ ফেলাইয়া এক ঘা চাষ ও দুই পালা মৈ দিতে হয়। ভুট্টার জমিতে পার্ব্বত্য প্রদেশের কৃষকেরা দুই বার খোড় দিয়া থাকে।

গভীর কুড়ী ও বিলান ভিন্ন অন্য সমুদয় ক্ষেত্রে এবং লোণা-কোটা ও লোণা-সেয়ারা ভিন্ন অন্য সমস্ত মৃত্তিকায় ভুট্টা জন্মাইতে পারে। ভুট্টায় ছাতু, ময়দা ও খৈ প্রস্তুত হয়। কাঁচা ভুট্টা দগ্ধ করিয়া ঘৃত লবণ সংযোগে খাইতে অতি সুস্বাদু বোধ হয়। ভুট্টা ঘোড়ার পক্ষে অতি পুষ্টিকর খাদ্য; ছোলার পরিবর্ত্তে ভুট্টার দানা দেওয়া যাইতে পারে। সুপক্ক ভুট্টার মোচা ভাঙ্গিয়া হাতে ছাড়াইতে হয়।

ভুট্টা অতি অগ্রাহ্য জিনিষ, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু পার্ব্বত্য প্রদেশে ভুট্টার চাষে বিলক্ষণ লাভ হইয়া থাকে। এক বিঘা ভুট্টার আবাদ করিতে প্রায় পাঁচ টাকা খরচ হয়। অথচ জন্মাইলে সাত আট মণ ভুট্টা হইয়া থাকে। তাহার মূল্য ২৲ টাকা হিসাবে ১৪৲ বা ১৬৲ টাকা লভ্য হয়।

গেমা বা দেধান।

গেমার গাছ প্রায় ভুট্টারই তুল্য কিন্তু তাহা অপেক্ষা অনেক উচ্চ হইয়া থাকে। ইহা ভাদুই ও এই হৈমন্তিক দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। উভয় শ্রেণীর গেমাই আবার শ্বেত কৃষ্ণ বর্ণ ভেদে দুই জাতি। ইহার বীজ হইতে যে গাছটি বাহির হয়, সেইটিই থাকে, তাহার আর ডাল পালা বাহির হয় না। গাছের গণ্ড হইতে শস্য-পরিপূর্ণ একটি মুঞ্জরী বহির্গত হয়।

ইহা বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বুনানি করা যায় এবং শ্রেণী-ভেদে ভাদ্র আশ্বিন ও অগ্রহায়ণ মাসে পাকিয়া উঠে। ইহার বীজ প্রতি বিঘায় ⁄২ দুই সের হারে পতিত হয়। চাষ সমাপ্তির পর বীজ ছড়াইয়া মৈ দিতে হয়। কিন্তু বুনানির পূর্ব্বে আশু ধান্যের রীত্যনুসারে জমিতে ভাল করিয়া চাষ দিতে হয়। যে যে জমিতে আশু ধান্য জন্মে, সেই সকল জমিতে এবং

ভিটা ভূমিতে গেমা জন্মিয়া থাকে। ইহার মৃত্তিকা-ভেদ নাই। ইহার শীষ কাটিয়া মলাই করতঃ উড়াইয়া লইতে হয়। গেমায় অতি উৎকৃষ্ট খৈ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

দুই চারি বিঘা গেমা বুনানি করা সকল কৃষকেরই কর্ত্তব্য। গেমার গাছ গোরুর বড় পুষ্টিকর খাদ্য। ফুলানর পূর্ব্বে গেমার গাছ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে কাটিয়া দিলে গোরুতে তাহা আগ্রহের সহিত খাইয়া থাকে। গেমা কুচলান এক প্রকার অস্ত্র আছে, তাহার আকৃতি এইরূপ এক কাষ্ঠদণ্ডে অত্যন্ত ধারাল লোহার পাত এক খান সংযোগ করিয়া উক্ত যন্ত্রের গঠন হইয়াছে। কোচলান গেমা শুকাইয়া গোলাজাত করিয়া রাখিলে যখন ইচ্ছা গোরুকে খাইতে দিতে পারা যায়। শুষ্ক গেমা খৈলের জল সংযোগে ভিজাইয়া দিতে হয়। এক বিঘা গেমা বুনানি করিতে মায় খাজনা ১॥০ দেড় টাকা আন্দাজ খরচ হইয়া থাকে। কিন্তু গেমা জন্মাইলে সাত আট টাকার ঘাষ হয়। পাকাইয়া শস্য বিক্রয় করিলেও ঐ পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে।

ভুরো, কোদো, মাড়ুয়া, ইত্যাদি।

ভুরো, কেদো, ইত্যাদি নামে আরও কতকগুলি শস্য আছে, তাহাদের বীজ প্রায় শ্যামা ঘাষের তুল্য। ঐ সকল শস্যে নিকৃষ্ট রুটী ও অতি কদর্য্য অন্ন প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহা ভদ্র লোকের আহারোপযোগী নহে। কিন্তু অপারিত পক্ষে পার্ব্বতীয় অসভ্য জাতিদিগের ও কোন কোন প্রদেশের নিঃস্ব কৃষকদিগের খাদ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। আশু ধান্যের ক্ষেত্র লালচিটা হইলে তাহাতে আর ধান্য জন্মে না। ঐ লালচিটা ক্ষেত্রে দোয়ার চাষ দিয়া পূর্ব্বোক্ত শস্য সকল বপন করা হয়। বপনের পর অন্য কোনরূপ আবাদ করিতে হয় না।

কৃষিতত্ত্বে ঐ সকল শস্যের উল্লেখ না করিলেও কোন ক্ষতি ছিল না। তবে ঐ সকল শস্যে গোরুর আহারীয় ঘাষ হইতে পারে। ইহাই উল্লেখের একমাত্র কারণ হইয়াছে। ঐ সকল ঘাষ কাটিয়া গোরুকে খাওয়াইতে পারা যায়। আবার পোঁতা ঘাষ প্রস্তুত করিলেও হইতে পারে।

ভুরো, কোদো, মাড়ুয়া, ইত্যাদি।

ভুরো বা কাউন।

ভুরো বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বুনানি করা যায় এবং শ্রাবণ ভাদ্র মাসে পাকিয়া উঠে। ইহার বীজ প্রতি বিঘায় এক সের পাঁচ পোয়া পতিত হইয়া থাকে। চাষের উপর বীজ ছড়াইয়া দুই পালা মৈ দিতে হয়।

কোদো।

কোদোর মুঞ্জরী বাহির হয় না, গর্ভমধ্যে থাকিয়াই তাহা পাকিয়া উঠে। ইহার বীজ /১।০ পাঁচ পোয়া হারে চাষের উপর ফেলাইয়া মৈ দিতে হয়। ইহা শ্রাবণ ভাদ্র মাসে পাকিয়া উঠে। ভিতরে বীজ না হইতে এই ঘাষ গোরুকে খাওয়ান কর্ত্তব্য। ইহার বীজ খাইলে গোরুর ঘোর লাগে। (তাহাকে ময়না-ঢুলুনি বলে।)

শেয়াল-নেজা।

ইহার শীষের আকৃতি শৃগাল-পুচ্ছের ন্যায়। তাহা আদ্যোপান্ত দানাতে পরিপূর্ণ। ইহার আবাদ ভুরোর তুল্য, কিছু মাত্র প্রভেদ নাই।

মাড়ুয়া।

ইহার শীষ কাঁচলে ঘাষের তুল্য চারি অংশে বিভক্ত ও বক্রাকৃতি। মাড়ুয়ার বীজ এক সের হিসাবে চাষের উপর পতিত হইয়া থাকে। ইহার এক জাতি বৈশাখ মাসে পাকিয়া উঠে। অপর জাতি আষাঢ় মাসে পাত দিয়া শ্রাবণ মাসে রোয়া হয় এবং কার্ত্তিক মাসে সুপক্ক হইয়া থাকে। পার্ব্বত্য প্রদেশে মাড়ুয়া রুইতে দেখা গিয়াছে। মাড়ুয়ায় মদ প্রস্তুত হয় বলিয়া পাহাড়িয়া অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে ইহা অতি আদরের সহিত গৃহীত হইয়া থাকে। ইহার মণ কখন কখন তিন টাকা পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়। পাহাড়ে মাড়ুয়ার চাষ বিলক্ষণ লাভজনক।

চিনে।

কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ও ফাল্গুণ পর্য্যন্ত চিনে বুনানি হয়। বুনানির পর ষাট দিনের মধ্যে পাকিয়া থাকে। ইহারও বীজ /১ এক সের হিসাবে চাষের উপর পতিত হয়।

সমাপ্ত।